মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৪। [১ম সংখ্যা।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

সম্রাট হুমায়ুন।

শুক্রবার ৯ই জমাদল অওয়াল ৯৩৭ হিঃ অব্দে হুমায়ুন সুলতান সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং তাঁহার নামে আগ্রার জুমা মসজিদে খতবা পাঠ করা হয়। "সমবেত প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।" এই সূত্রে খোন্দামীর বলেন—

"হৃদয়ে যে সম্পদের আশা উত্থিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পূর্ণ হইল।
জগৎ যে বাসনা পোষণ করিয়াছিল তাহা সফল হইল।"

—হুমায়ুন-নামা।

হুমায়ুন অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও রসিক ছিলেন এবং সকলের সহিত মিশিতে পারিতেন। —ফিরিস্তা।

সকল পুত্রাপেক্ষা বাবর হুমায়ুনকে অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি যখন কাবুল যাত্রা করেন তখন হিন্দুস্থান শাসনের ভার হুমায়ুনের উপর অর্পণ করিয়া যান।

ঐ সময় একদিন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সাহজাদা হুমায়ুনের ইচ্ছা হইল, আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবেন। তাঁহার সহিত তাঁহার শিক্ষক মৌলানা মসিউদ্দিন রসুল্লা ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া হুমায়ুন বলিলেন, "সাহ সাহেব আমি এই বনমধ্যে প্রথম যে তিনটি লোকের সাক্ষাৎ পাইব তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিব।" কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর তাঁহারা এক প্রৌঢ়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহারা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক বলিল—"আমার নাম মুরাদ খাজা।" তাহার পর তাঁহারা এক গর্দ্দভ চালককে দেখিতে পাইলেন। সে বলিল তাহার নাম "দৌলাৎ খাজা।" সাহজাদা ইহাতে বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"এবার যে লোকটি আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইবে তাহার নাম যদি সায়াদত খাজা হয়, তাহা হইলে জানিব আমার ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যশশী উদিত হইবে।" ঠিক সেই সময় এক রাখাল বালক আসিয়া শাহজাদার সম্মুখে পতিত হইল। তিনি মহা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক তোমার নাম কি?" বালক উত্তর করিল—"আমার নাম সায়াদত খাজা।" রাজসঙ্গিগণ অবশ্য ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলে একবাক্যে বলিলেন—"জাঁহাপনার সুখসূর্য্য শীঘ্রই ভারতের ভাগ্যাকাশ সমুজ্জ্বল করিবে *।

—হুমায়ুন নামা।

* ঠিক উপরোক্ত গল্পটী সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বলিখিত জীবনচরিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার আপনার জীবনে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীর আপনার গল্পে হুমায়ুন নামা বর্ণিত গল্পের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। আমরা জাহাঙ্গীরের গল্পটি অনুদিত করিয়া পাঠককে উপহার দিলাম, তিনি এ রহস্যের মীমাংসা স্বয়ং করিয়া লউন। জাহাঙ্গীর বলেন—

"আমি অশ্বারোহণ করিয়া আমার পিতার বিশ্রাম স্থান হইতে বিদায় লইয়া এক ক্রোশ না যাইতে যাইতে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার আকৃতি অবগত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে সে বলিল তাহার নাম মুরাদ খাজা। আমি বলিলাম "ধন্য জগদীশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সম্রাট বাবরের সমাধিস্থলের অনতিদূরে আমরা অপর একটি লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে ইন্ধন কাষ্ঠবাহী একটি গর্দ্দভ চালাইয়া লইয়া আসিতেছিল এবং তাহার নিজের পৃষ্ঠে একটি কাষ্ঠের বোঝা ছিল। আমি তাহাকেও তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল তাহার নাম দৌলত খাজা। আমি ইহাতে হর্ষান্বিত হইয়া আমার পরিচারকবৃন্দকে

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বলিখিত ইতিবৃত্তে হুমায়ুন সম্বন্ধে অপর একটি দৈব ঘটনার বর্ণনা আছে। হুমায়ুন একদিন তাঁহার পিতার সমাধি মন্দির দেখিতে যাইবার সময় একটি উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি এই পক্ষীটিকে শরবিদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে আমি পিতৃ সিংহাসন সমারূঢ় হইতে পারিব। ইহা বলিয়া যুবরাজ তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর পক্ষীর মস্তক বিদ্ধ করিল এবং পক্ষীটির মৃতদেহ হুমায়ুনের পদতলে পতিত হইল। —ওয়াকিয়াতে জাহাঙ্গীরি।

হুমায়ুন আপনার প্রধান শত্রু শের সাহের বিদ্রোহিতার সংবাদ পাইয়া যখন গৌড় জয় করিতে রওনা হয়েন তখন গরহীর গিরিবর্ত্তে একদল পাঠান সৈন্য জালাল খাঁ ও হাজীখাঁর অধীনে অপেক্ষা করিতেছিল। শেরসাহ স্বয়ং গৌড়ে বসিয়া তথাকার বিপুল ধন রত্ন সরাইয়া রোটাস্ দুর্গে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মোগল সৈন্যের বিদ্রূপ ও আক্রমণের হস্ত হইতে নিবৃত্তি পাইবার জন্য জালাল খাঁ শপথ করিলেন যে, মোগল সৈন্য না তাড়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না। সুতরাং একদিন অকস্মাৎ সদলবলে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন বিভাগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্থ করিয়া তুলিলেন। ভীত হইয়া আক্রান্ত মোগল সেনা যে যেখানে পারিল পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। মোগল শিবিরস্থ সমস্ত সম্পত্তি এবং উষ্ট্র অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পাঠানদিগের করতলগত হইল। —তারিখি খাঁ জাহান লোদী।

এই সময় শেরসাহ গৌড়ে ছিলেন। তিনি বিজয় সংবাদ পাইয়া মহা হর্ষে বলিয়াছিলেন, "যে কুক্কুট যুদ্ধে একবার পরাজিত হয় সে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে নামিয়া কেবল চিৎকার করে আর সাহস করিয়া লড়িতে পারে না।" বলা

ডাকিয়া বলিলাম যদি তৃতীয় ব্যক্তির নাম সায়াদত হয় তাহা হইলে ঘটনাটি কিরূপ আশ্চর্য্য জনক হইবে বল দেখি। আমরা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, আমাদের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র নদীতটে দেখিলাম একটি বালক গরু চরাইতেছে। আমি সাহস করিয়া তাহারও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে উত্তর দিল তাহার নাম সায়াদত খাজা।" নিজামুদ্দীন আহমদ লিখিত তবকাতে আকবরী নামক গ্রন্থেও হুমায়ুন সম্বন্ধে উক্ত গল্পটি বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য হুমায়ুন নামা ও তবকাতে আকবরী এতদুভয় গ্রন্থই ওয়াকিয়াতে জাহাঙ্গীরি অপেক্ষা প্রাচীন।

বাহুল্য, ভবিষ্যতে শেরসাহ ও হুমায়ুনের অদৃষ্টে যাহা হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ বাক্যটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

—তারিখি খাঁ জাহান লোদী।

শেরসাহ প্রায় মাসাবধি হুমায়ুনকে গৌড়ের তোরণ দ্বারের বাহিরে রাখিয়া বিজয়লব্ধ হস্ত্যশ্ব উষ্ট্রাদি দ্বারা তথাকার রত্নাদি রোটাসে পাঠাইয়া দিয়া পরে সহরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। শেরসাহ গৌড় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অপর একটি চাতুরি করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়স্থিত যাবতীয় প্রাসাদাবলী বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহতলে বহুমূল্য গালিচা বিস্তৃত করিয়া, নানাবর্ণ মণ্ডিত রেশমী ঝালোর প্রভৃতি দ্বারা কক্ষাবলী ভূষিত করিয়া তিনি গৌড়ের প্রাসাদগুলিকে অত্যন্ত সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। শেরসাহের ধারণা ছিল যে বিলাসপ্রিয় সুখলিপ্সু মোগল সম্রাট একবার এ সকল প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে কর্ত্তব্য পথ বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং তিনি স্বয়ং সেই অবসরে আপনার বল বৃদ্ধি করিয়া লইয়া শেষে মোগল কেতনের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে পাঠান ধ্বজা উড়াইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে প্রবেশ করিয়াই হুমায়ুন নিজ অনুচর দ্বারা সহরকে পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য করিয়া লইলেন। তাহার পর অকস্মাৎ তিনি হারেমে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কয়েক মাস ধরিয়া তিনি এইরূপে সুখান্বেষণ করিয়াছিলেন। শেষে যখন সংবাদ পাইলেন যে শেরসাহ চুণার এবং বেনারিস দুর্গ অধিকার করিয়াছেন তখন তিনি আবার কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

—তাজকিরাতুল ওয়াকিয়ত।

গৌড় শব্দের গোর বা সমাধির মত সমান উচ্চারণ বলিয়া তিনি গৌড়ের পরিবর্ত্তে রাজধানীর নাম করিয়াছিলেন জুনাতাবাদ বা স্বর্গ। বলা বাহুল্য, হুমায়ুন দত্ত নামটি প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। —ফিরিস্তা।

হুমায়ুন তাঁহার সৈন্যাদি লইয়া যখন চৌসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন সহসা শেরসাহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। হুমায়ুন প্রথমতঃ ব্যাপারটা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার ভগ্নোদ্যম সেনাবৃন্দ পুল পার হইয়া পলায়ন তৎপর হইতেছে তখন তিনি আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বাদসাহ সে সময় স্নান করিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইয়া তিনি অশ্বারোহণে সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পলায়নতৎপর মোগল সৈন্যের পদভারে সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া সম্রাট অশ্বসহ জলমধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া বহুকষ্টে পর পারে যাইতে সক্ষম হয়েন। খরস্রোত নদীর প্রবাহ হইতে মোহাম্মদ গাজনভি বহু কৌশলে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

বাদসাহদিগের চিরন্তন প্রথা অনুসারে সমরক্ষেত্রেও তাঁহারা আপনাদের মহিষী এবং অন্যান্য কুলললনাদিগকে লইয়া যাইতেন। সম্রাটের তাম্বুর এক পার্শ্বে বেগমদিগের শিবির নির্ম্মিত হইত *। চৌষার পাঠান আক্রমণ এত আকস্মিক হইয়াছিল যে হুমায়ুন আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য পলাইবার সময় তিনি খ্বাজা মোয়াজ্জমকে মরিয়ম মকানি বেগম ও অন্যান্য রমণীবৃন্দকে রক্ষা করিবার ভার দিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া খ্বাজা মোয়ানি যখন বাদসাহী শিবিরের বেগম মহলের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তিনি দেখিলেন দুর্বৃত্ত পাঠান সৈন্যগণ শিবিরের চতুর্দ্দিকেই মহা সমারোহে লুণ্ঠন ও হত্যা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং খ্বাজা মোয়াজ্জম দেখিলেন অবরোধ শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মরিয়ম বেগমকে শত্রু হস্তে পড়িতে দেওয়া অযথা ভাবিয়া তিনি যথাসাধ্য পাঠান প্রবাহের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সে গতিরোধ করা তখন অসাধ্য। বিজয়গর্ব্বিত পাঠানবৃন্দ তখন বেগম ও তাঁহার অবরোধের ললনাবৃন্দকে বন্দিনী করিতে কৃতসংকল্প। সুতরাং প্রভুভক্ত খ্বাজা মোয়াজ্জম রাজ আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আপনার জীবন হারাইয়া-

* এসম্বন্ধে Bernier কৃত Travels in Hindusthan নামক গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা আছে।

ছিলেন। এবং প্রায় চারি সহস্র মোগল ললনা মহিষী মরিয়মের সহিত সের সাহের হস্তে পতিত হইয়াছিল। —তারিখি খাঁজাহান লোদী।

সে যাত্রায় রক্ষা পাওয়া অসাধ্য দেখিয়া বেগম সাহিবা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দ স্বয়ং তাম্বু হইতে বহির্গত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের প্রতি শের সাহের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বিবিধ মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি আপন শিবির মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে কেহ কোনও মোগল রমণী বা ক্রীতদাসীকে এক রাত্রের নিমিত্তও আপনাদের নিকট রাখিতে পারিবে না। শেরসাহের আজ্ঞার অবমাননা করা দুরূহ ভাবিয়া সকলে আপনাপন বন্দিনিগণকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিল এবং শেরসাহ তাহাদিগকে রাজমহিষীর শিবিরে রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন তাহাদিগকে তথায় স্বচ্ছন্দে রাখিয়া তিনি বেগমকে রোটাস দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং অপরাপর স্ত্রীলোকগুলিকে অর্থাদি প্রদান করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। —তারিখি শেরসাহী।

সুবিশাল ভারতবর্ষের পিতৃলব্ধ সিংহাসনাধিরোহণ করিবার পর হুমায়ুন সাহ আপনার প্রজাবৃন্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

(১) আহেলি দৌলত।—এই শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। বাদসাহ আপনার ভ্রাতৃবর্গ এবং কুটুম্বদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত রাষ্ট্রের সচীব ওমরাহগণ, এবং সমর বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ নায়কবর্গ এই আহেলি দৌলত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। খোন্দামীর বলেন "মনুষ্য ব্যতীত আধিপত্য হইতে পারে না এবং এই শ্রেণীর সাহসী ও বীরচেতা মনুষ্য ব্যতীত কোনও প্রকারেরই ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।" এই কারণেই বোধ হয় ইহাদের শ্রেণীকে দৌলত বা সম্পদের শ্রেণী বলা হইত। প্রসিদ্ধ যোদ্ধাদিগকে কেন এশ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হইত তৎসম্বন্ধে খোন্দামীর বলেন—

ভূপতিগণ. সৈন্যের সাহায্যে
সাম্রাজ্যের সিংহাসনোপরি পদক্ষেপ করিতে পারে।
কেবল সেই (ব্যক্তিই) ধন ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়
যে সৈন্যের সাহায্য পায়।

(২) আহেলি সায়াদত :—এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন যত পুণ্যবান ব্যক্তি, যত মোসায়েখ্ বা ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক, মাননীয় সৈয়দগণ, সাহিত্যসেবী এবং বিচারকগণ, ইহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিবর্গ, কবি প্রভৃতি জ্ঞানী লোক সব আহেলি সায়াদত বা উত্তম ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গ বড়ই সুফলপ্রসূ এবং ইতিবৃত্তকার বলেন—

"পুণ্য ভগবানের দান
কেবল শারীরিক বলে মানুষ ইহা পায় না।
যদি বাস্তবিক সৌভাগ্য চাও
পুণ্যবান ব্যক্তির সঙ্গ কর।"

(৩) আহেলি মুরাদ :—যাহারা সুপুরুষ এবং আমোদপ্রিয়, যাহাদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক-বৃন্দ, চতুর বাদ্যকার প্রভৃতি আহেলি মুরাদের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ইহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে খোন্দামীর বলেন—

"প্রেমিকদিগের হৃদয়ের আশা
গোলাপগণ্ড ব্যক্তি না দেখিলে পূর্ণ হয় না।
যে গীত বা বাদ্য শুনিতে ভালবাসে
তাহার জন্য সুখের কবাট উন্মুক্ত। * —হুমায়ুন নামা।

সপ্তাহের বার হিসাবে হুমায়ুন বাদসাহ আপনার কর্ত্তব্য বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শনিবার এবং বৃহস্পতিবার তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বিদ্বান লোক-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মুসলমান জ্যোতিষীদিগের মতে শনিগ্রহ ধার্ম্মিক ও সাধুপ্রকৃতির লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং বৃহস্পতি বিদ্বজ্জন, সৈয়দ এবং প্রকৃত মুসলমানদিগের রক্ষাকর্ত্তা। এই কারণে তিনি উক্ত দিবসদ্বয়ে বিদ্বজ্জন ও সাধু পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বিরাজ করিতেন।

রবি এবং মঙ্গলবারে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে সভায় আহ্বান করিতেন এবং রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এতদুভয় দিবসে সম্পাদিত হইত। সম্রাট স্বয়ং সভায় বসিয়া সকলকে দর্শন দিতেন এবং প্রত্যেকের

* দৌলত, সায়াদত ও মুরাদের সহিত বোধ হয় উপরিউক্ত দৌলত খাজা প্রভৃতির গল্পের সংশ্রব আছে।

আবেদনাদি গ্রহণ করিতেন। প্রথমে বাদ্য দ্বারা তাঁহার রাজসভায় আগমন সমগ্র প্রজাসাধারণ মধ্যে ঘোষিত হইত। তাহার পর সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলে তোষাখানার প্রধান কর্ম্মচারী কতকগুলি বহুমূল্য পোষাক লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন এবং কোষাধ্যক্ষও অনেক মুদ্রা লইয়া আসিতেন। যে সকল যোদ্ধা বা রাজকর্ম্মচারীর উপর বাদসাহ সন্তুষ্ট হইতেন তাহাদিগকে তিনি ঐ সকল পোষাক ও মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিতেন। যাহার উপর তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহাদিগকে রাজভৃত্যেরা লইয়া গিয়া শাস্তি প্রদান করিত। সভার সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে পর তোপধ্বনি হইত এবং সম্রাট সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। সূর্য্যের হস্তে রাজা ও শাসনকর্ত্তা দিগের ভাগ্য নিহিত বলিয়া রবিবারে এইরূপ রাজকার্য্য সমাধা হইত এবং মঙ্গল গ্রহ রণাধিপতি বলিয়া ঐ দিনও রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইত।

সোমবার চন্দ্রের দিন বলিয়া ঐ দিনে সম্রাট সুন্দর ইন্দুবদন ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এবং এতদুদ্দেশে তিনি বুধবারও যাপন করিতেন। ঐ দুই দিন হুমায়ুন আমোদ আহ্লাদ, ক্রীড়া কৌতুক করিয়া কাটাইতেন এবং প্রাসাদ মধ্যে গীতি বাদ্যের লহর ছুটাইতেন।

শুক্রবার জুমা বলিয়া সেই দিনে সম্রাট যত সভাসমিতি জমা করিতেন। এইরূপে তিনি সপ্তাহের সাত দিনের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। —হুমায়ুন-নামা।

সম্রাট জ্যোতিষবিদ্যায় অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং তিনি এক একটি গৃহকে এক একটি গ্রহের নামে অভিহিত করিতেন। "চন্দ্র প্রাসাদে" চন্দ্রের প্রতিকৃতি প্রভৃতি সজ্জিত থাকিত। এইরূপে "বুধ প্রাসাদ" প্রভৃতিও ভূষিত হইত। —ফিরিস্তা।

সম্রাট তিনটি সুবর্ণ তীর নির্ম্মাণ করিয়া আহেলি দৌলত, আহেলি মুরাদ, এবং আহেলি সায়াদত—প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া এক এক-জন নেতাকে এক একটি সুবর্ণ তীর প্রদান করিতেন। এই তীরধারী ব্যক্তি আপনার শ্রেণীর মধ্যে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সে আপনার শ্রেণীর যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। যতদিন সে সম্রাটের ও আপন শ্রেণীস্থ সকলের মন রাখিয়া চলিতে পারিত ততদিন তাহার কর্ম্ম থাকিত, কিন্তু পদ

বৃদ্ধিতে; গর্ব্বোন্মত্ত হইয়া যখনই সে আত্মবিস্মৃত হইত তখনই সম্রাট তাহার নিকট হইতে সুবর্ণ শর কাড়িয়া লইয়া অপরকে প্রদান করিতেন।

—হুমায়ুন নামা।

আপনাপন পূর্ব্বপুরুষ প্রবর্ত্তিত ব্যবসায় অনুসারে নানাবর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজ দেখিয়াই বোধ হয়, বাদসাহের ওমরাহ কুটুম্ব, অনুচর প্রভৃতিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে সাধ হইয়াছিল। তিনি উহাদিগকে প্রথমতঃ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ দ্বাদশটি বিভাগের প্রত্যেকটিকে আবার উত্তম, মধ্যম, ও অধম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই শ্রেণী ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সম্রাট দ্বাদশ প্রকারের তীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত, সম্রাট স্বয়ং সেটি আপনার তূণে রক্ষা করিতেন। একাদশ শ্রেণীর বাণ প্রাপ্ত হইতেন তাঁহার কুটুম্ব এবং ভ্রাতৃবৃন্দ এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেক সুলতান এই শ্রেণীভুক্ত হইতেন। মুশায়েখ, সৈয়দ, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ লোক সকল দশম শ্রেণীর তীর পাইতেন। ওমরাহগণ নবম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। অষ্টম শ্রেণীতে সভাসদ্‌গণ এবং তাঁহার পার্শ্বচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থান পাইতেন। সপ্তম শ্রেণীর তীর পাইতেন—সম্রাটের পার্শ্বচরগণ। হারেমের ললনাকুল, এবং মহিলা পরিচারিকা-দিগের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্রা, তাহারা ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইত। যুবতী পরিচারিকাবৃন্দ পঞ্চম শ্রেণীভুক্তা। কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি চতুর্থ শ্রেণীতে এবং যোদ্ধাগণ তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইতেন। দাসবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং প্রহরী, উষ্ট্র চালক প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল। —হুমায়ুন নামা।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

(সঙ্কলিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতে গোবিন্দরাম তাঁহার বসিবার ঘরে টেবিলের সম্মুখে একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া ধূমপান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে কিছুদূরে একখানা মোড়ায় বসিয়া একটা লাঠী পরীক্ষা করিতে

ছিলাম। এই লাঠীটি এক ব্যক্তি আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়া ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সে সময়ে বাড়ীতে না থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার লাঠীটি খুব মোটা বেতের মত—বোধ হয়, চীন দেশের কিম্বা জাপানের বাঁশ হইবে; লাঠীর নীচের দিকে লোহার সাঁপি, মাথার দিকটা রৌপ্যে মণ্ডিত—তাহার উপরে লিখিত, " 'সি এম সি'র বন্ধুগণের প্রীতি-উপহার, ডাক্তার নলিনাক্ষ বসু এম বি।—১৮৭৪" কোন বহুদর্শী প্রবীণ চিকিৎসকের পক্ষেই এরূপ গুরুভার যষ্টি ব্যবহারই সম্ভব।

হঠাৎ গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি ডাক্তার, লাঠীটা দেখে কি অনুমান কর?"

তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া বসিয়াছিলেন; কথাটা বলিবার সময়েও তিনি আমার দিকে চাহিলেন না, নিবিষ্টমনে তামাক টানিতেছিলেন। তিনি যেরূপভাবে বসিয়াছিলেন, তাহাতে আমি কি করিতেছি, তাহা জানিবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাই বলিলাম, "আমি কি করিতেছি, তুমি কিসে তাহা জানিলে? তোমার মাথার পিছন দিকেও চোখ আছে, দেখিতেছি!"

এইবার গোবিন্দরাম আমার দিকে ফিরিয়া সহাস্তে বলিলেন, "অন্ততঃ আমার সম্মুখে টেবিলের উপরে একটা খুব উজ্জ্বল পালিস করা চকচকে পানের ডিবা রহিয়াছে, এটা এত পরিষ্কার যে, আর্শির কাজ করে। আমাদের এই ডাক্তারের লাঠী হইতে তুমি কি সিদ্ধান্ত করিতেছ, বল শুনি। দুঃখের বিষয়, কাল তিনি যখন আসিয়াছিলেন, তখন আমরা বাড়ীতে ছিলাম না; কাজেই তিনি কি করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না; সেইজন্য তাঁহার লাঠী আমাদের কাছে এখন অকিঞ্চিৎকর নহে। লাঠী দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তুমি কি সিদ্ধান্ত কর?"

আমার বন্ধুর প্রথার যতদূর অনুকরণ করা সম্ভব, আমি তাহাই করিয়া বলিলাম, "আমার বোধ হয়, ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু প্রবীণ চিকিৎসক, সকলের মাননীয় ও প্রিয়—তাহা না হইলে তাঁহাকে কেহ এ প্রীতি উপহার দিত না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বেশ—ভাল, তারপর?"

"আমার বোধ হয়, তিনি কোন পল্লিগ্রামে চিকিৎসা করেন, অধিকাংশ সময়েই হাঁটিয়া রোগী দেখিতে যান।"

"ইহা কিসে বুঝিলে ?"

"এই লাঠীটা যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ইহা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার গোড়ার লোহা অনেক ক্ষয়িয়া গিয়াছে—ইহাতে বোঝা যায়, তিনি এই লাঠী লইয়া অনেক হাঁটিয়াছেন।"

"ঠিক—একথা ঠিক।"

"তাহার পর 'সি এস সি'; বোধ হয় কোন সভা বা ক্লবের নাম, তাহার কোন সভ্যকে তিনি বোধ হয়, চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে এই লাঠী উপহার দিয়াছিলেন।"

"খুব ভাল, ডাক্তার—খুব ভাল।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম উঠিয়া বসিলেন ; বসিয়া বলিলেন, "তুমি এ পর্য্যন্ত আমার ক্ষমতার কথারই প্রমাণ করিয়া আসিতেছ,আর তোমার নিজের ক্ষমতার কথা কিছুই বল নাই। হতে পারে—তুমি স্বয়ং আলো নও, কিন্তু তোমার ভিতর দিয়া যে একটা আলো বিকীর্ণ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, ডাক্তার—আমি তোমার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী আছি।"

গোবিন্দরাম কখনও এই কথা বা এ সম্বন্ধে এত কথা বলেন নাই, তাহাই তাঁহার কথায় আমার প্রাণে ভারি আনন্দ হইল—তিনি কখনও কোন বিষয়ে আনন্দপ্রকাশ করিতেন না—প্রশংসা করিতেন না, আমি তাঁহার কীর্ত্তি জগতে প্রচার করিতেছি, ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ; ইহাতে আমি সময়ে সময়ে মনে বড় কষ্ট পাইতাম। আজ তাঁহার এই কথায় আমার মনে প্রকৃতই আনন্দ হইল। তাঁহার প্রথা যে কতকটা আমি আয়ত্ব করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিয়া মনে মনে যে একটু অহঙ্কার হইল না, তাহাও নহে।

তিনি আমার হাত হইতে লাঠীটা লইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালার নিকটে গিয়া একটী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লাঠী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "হাঁ, লাঠী হইতে কতকগুলি অনুমান করা যাইতে পারে—তবে সামান্য, সম্পূর্ণ নহে।"

আমি বলিলাম, "আমি অনুমান করিতে পারি নাই—এমন কিছু নূতন আছে ? বোধ হয়, আবশ্যক কিছুই আমি উপেক্ষা করি নাই।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, তোমার সিদ্ধান্ত সমস্তই ভ্রমাত্মক। এইমাত্র আমি বলিলাম যে, তোমার দ্বারা আমার অনেক

সাহায্য হইয়াছে, তাহার মানে তোমার ভুল হইতে আমি অনেক সময়েই ঠিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি। তবে ইহাও বলিতে চাহি না যে, তুমি এইমাত্র যাহা যাহা বলিলে,তাহা সবই ভুল। এই ডাক্তার যে কোন পল্লিগ্রামের চিকিৎসক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; ইনি যে অনেক হাঁটিয়া থাকেন, তাহাও নিশ্চিত।"

"তাহা হইলে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক।"

"ঐ পর্য্যন্তই ঠিক বটে !"

"ইহা ছাড়া আর কি আছে ?"

"অনেক—ডাক্তার, অনেক—প্রথম তুমি যে বলিলে 'সি এম সি' কোন সভা বা ক্লবের নাম, তাহা ঠিক ; আমার বোধ হয়, ইহা কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেসন। খুব সম্ভব, এই ডাক্তার এখানকার মিউনি-সিপালিটীতে কাজ করিতেন।"

"হয় ত তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক।"

"তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয়, তাহা হইলে এই ডাক্তার সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।"

আর নূতন এমন কি অনুমান—করা যাইতে পারে ?"

"আর কিছু কি অনুমান করা যায় না ? তুমি ত আমার পর্য্যবেক্ষণের প্রথা জান, সেই প্রথায় ভাবিয়া দেখ।"

"আমার এইমাত্র মনে হয় যে, লোকটি এখানে ডাক্তারী করিয়া তাহার পর পল্লিগ্রামে গিয়াছেন।"

"ইহা ছাড়া আমরা আরও একটু অগ্রসর হইতে পারি। আমি যেভাবে বিবেচনা করিতেছি, তুমিও সেইভাবে বিবেচনা কর। কখন তোমার মনে হয় কি যে, তাঁহার 'সি এম সির' বন্ধুগণ তাঁহাকে এই প্রীতি উপহার দিতে পারে ? কখন তাহাদের উপহার দেওয়া সম্ভব ! নিশ্চয়ই যখন নলিনাক্ষ বাবু মিউনিসিপালিটীর কাজ ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতে প্রস্থান করেন—এই কি উপহার দিবার সময় নহে ? আমরা জানি, তিনি একজন পল্লিগ্রামের ডাক্তার ; তাহাই বুঝিতে হয়, তিনি যখন মিউনিসিপালিটীর কাজ ছাড়িয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে এই লাঠীটি উপহার দিয়াছিল।"

"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"তাহার পর, বৃদ্ধ বয়সে কেহ চাকরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে যায় না ; তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে, তোমার ডাক্তারের বয়স বেশী নহে—বয়স ছত্রিশের উর্দ্ধ নহে ; তবে বিনয়ী, তত উচ্চাভিলাষ নাই, বড়ই অন্যমনস্ক, একটী কুকুর সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকে ; তবে সে কুকুরটা খুব বড় বা খুব ছোটও নহে।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। গোবিন্দরাম আরাম-কেদারায় আড় হইয়া পড়িয়া মুখে নল লাগাইলেন। আমি বলিলাম, "তাঁহার কুকুরের বিষয়টা সম্বন্ধে তোমার কথার প্রতিবাদ করিবার আমার কিছু নাই, তবে তাঁহার বয়স আর ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুমান করা শক্ত নহে।"

গোবিন্দরাম সেলফ্ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এম বি ডাক্তারের নাম পাওয়া কঠিন নহে। এই লও,—নলিনাক্ষ বসু—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এম বি পাশ—মিউনিসিপালিটীর ফুড-ইনস্পেক্টর ; সুতরাং ইঁহার বয়স সম্বন্ধে আমার অনুমান ভুল হয় নাই ; তবে বিশেষণগুলি কি বলিয়াছি—বিনয়ী, অন্যমনস্ক, অনুচ্চভিলাষী ? বিনয়ী, মিষ্টভাষী না হইলে কেহ কি অপরের প্রিয় হইতে পারে ? আর যে অপরের প্রিয় হইতে পারে না, সে কখনই অন্যের নিকট হইতে উপহার পায় না। তাহার পর অন্যমনস্ক ? নিতান্ত অন্যমনস্ক স্বভাব না হইলে প্রীতি-উপহারের লাঠিটা ফেলিয়া যায় না। আর অনুচ্চভিলাষী ? তাহা না হইলে কলিকাতা ছাড়িয়া মফঃস্বলে কে চিকিৎসা করিতে যায় ?"

"আর কুকুরটা ?"

"কুকুরটার চিহ্ন লাঠীতেই রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, এই লাঠীতে কুকুরের কামড়ান দাগ রহিয়াছে ; সুতরাং বুঝিতে হয়, কুকুরটা সর্ব্বদা ডাক্তারের সঙ্গে থাকে, আর অন্য কাজ না পাইয়া ডাক্তারের লাঠী কামড়াইতে থাকে। দাঁতের দাগ দেখিয়া কুকুরটার আকার বলা কঠিন নহে ; নিতান্ত বড় কুকুর হইলে বড় দাঁত হইত, তবে দেশী—না—না—কুকুরটা লম্বা রোঁওয়ালা বিলাতী কুকুর।"

তিনি উঠিয়া এই সময়ে জানালার কাছে গিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "সহসা এত নিশ্চিত হইলে কিরূপে ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কারণ সেই কুকুরটাকে আমি আমার দরজায় স্বচক্ষে দেখিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মালিকও আসিয়াছেন। ডাক্তার,

তোমার সমব্যবসায়ী একজন আসিতেছেন, তোমার উপস্থিতি ভারি দরকার। ডাক্তার, বলিতে পার, নলিনাক্ষ বাবু—দস্যু-ডাকাতের শক্র গোবিন্দরামের বাড়ীতে কেন ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বে নলিনাক্ষ বাবুকে একজন রীতিমত পাড়াগেঁয়ে ভাবিয়াছিলাম,—কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি খুব লম্বা, খুব কৃশ, মুখাকৃতি সুন্দর, নাসিকাটি শুক পাখীর ঠোঁঠের ন্যায় লম্বা ও বাঁকা, চক্ষু উজ্জ্বল, দুই বৃহৎ চসমার কাচের মধ্য হইতে চোখ দুইটি সুস্পষ্ট প্রকাশিত; বয়স ছত্রিশ বৎসরের মধ্যেই হইবে; তবে বয়সানুসারে তিনি গম্ভীর, মুখের ভাব দেখিয়া বিনয়ী, সদাশয়, ভাললোক বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার দৃষ্টি প্রথমেই গোবিন্দরামের হস্তস্থিত তাঁহার সেই লাঠীর উপরে পড়িল। তিনি ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "লাঠীটা এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলাম! যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে এখানে ছিল, নতুবা আর পাইতাম না। এ লাঠীটা আমার বন্ধুদের উপহার, হারাইলে মনে বড় কষ্ট পাইতাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কলিকাতা মিউনিসিপালিটী হইতে বন্ধুরা লাঠীটা উপহার দিয়াছিলেন।"

"হাঁ, কয়েকজন বন্ধু দিয়াছিলেন। আমার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহারা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।"

গোবিন্দরাম মুখখানা অত্যন্ত কদাকার করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "বিবাহ উপলক্ষে উপহার—কি মুস্কিল!"

এই কথায় নলিনাক্ষ বাবু বিস্মিত হইয়া চসমার ভিতর দিয়া গোবিন্দ-রামের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "ইহাতে আবার মুস্কিল হইল কিসে, মহাশয় ?"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের অনুমান ওলট-পালট করিয়া দিলেন। আপনি এই লাঠী বিবাহের সময় উপহার পাইয়া-ছিলেন ?"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, সেই সঙ্গে আমার শ্বশুরের কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলাম; তাহা দেখিবার আর কেহ লোক ছিল না, তাহাই সহর ছাড়িয়া পল্লিগ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের বড় বেশী ভুল হয় নাই। এখন মহাশয়——"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "নলিনাক্ষ—আমার নাম নলিনাক্ষ—"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনার অনেক পড়া-শোনা আছে, দেখিতেছি।"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "সামান্য—সামান্য ; কারণ, যেখানে আছি, সেখানে কোন কাজ-কর্ম্ম নাই, কাজেই বই লইয়া থাকি। বোধ হয়, আপনিই গোবিন্দরাম বাবু ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, আমারই নাম।" বলিয়াই আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর ইনি আমার পরম বন্ধু, ডাক্তার বসু।"

নলিনাক্ষ বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ হইয়া বড়ই আনন্দ হইল—আপনার বন্ধু গোবিন্দরাম বাবুর নামের সঙ্গে আপনারও নাম শোনা আছে।"তাহার পর গোবিন্দরাম বাবুর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার মস্তকের এরূপ গঠন আমি মনে করি নাই ; অত্যাশ্চর্য্য মস্তিষ্ক! অত্যাশ্চর্য্য মস্তিষ্ক! আপনার মাথাটা একবার আমায় পরীক্ষা করিতে দিন, এরূপ মাথা আর আমি দেখি নাই।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া মাথাটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি ; বিজ্ঞান চর্চ্চায় আপনার বিশেষ উৎসাহ আছে। আপনার আঙ্গুল দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনি নিজেই সিগারেট পাকাইয়া খান। ঐ বাক্সে সব আছে, লউন।"

নলিনাক্ষ বাবু তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গুলি-সাহায্যে অতি শীঘ্র সিগারেট প্রস্তুত করিয়া টানিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, আমার বন্ধু তাঁহাকে ক্ষণকাল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "নলিনাক্ষ বাবু, বোধ হয়, আপনি আমার মস্তক পরীক্ষার জন্য এখানে আসেন নাই। কাল আপনি আসিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই—"

নলিনাক্ষ বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না—না,—অন্য কাজ আছে ; তবে এরূপ মস্তক পরীক্ষা করিতে পারিলে আমি যে বিশেষ আনন্দিত হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি অন্য কারণে আপনার কাছে আসিয়াছি আমার সংসার-বুদ্ধি একবারে নাই, আমি কতকগুলা বই লইয়া দূর পল্লিগ্রামে পড়িয়া থাকি। আপনি সংসার-জ্ঞানে অদ্বিতীয়—"

গোবিন্দরাম তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "নলিনাক্ষ বাবু

আমার প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া যদি আপনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাহা সহজ কথায় বলেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হই।"

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "আমার পকেটে একখানা পুঁথি আছে—"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনি ঘরে আসিবামাত্রই আমি তাহা দেখিয়াছি।"

"খুব পুরান পুঁথি।"

"খুব সম্ভব, দুই শত বৎসরের।"

"আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?"

"আপনার পকেট হইতে অনেকটা বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অনেকটা লেখা আছে, আমি তাহাই বিশেষ করিয়া দেখিতেছি। পুঁথি নাড়া-চাড়া অভ্যাস একটু আমার আছে, লেখার ধাঁচ, পেট কাটা ব, প্রভৃতি পুরান অক্ষর দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, পুঁথিখানা দুই শত বৎসরের কম নয়।"

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। বীরভূম জেলায় নন্দনপুর বলিয়া একটা গ্রাম আছে. এইখানে এক অতি পুরাতন রাজ-পরিবার বাস করেন, এক সময়ে ইহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু এখন সে গৌরব আর নাই; তবে এখনও বেশ জমিদারী আছে। এই পুঁথিখানিতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের একটী বিবরণ লিখিত আছে। অহিভূষণ বাবু, তাঁহাকে আশপাশের সকলেই রাজা বলিয়া ডাকিত, আমরা সকলেও তাঁহাকে রাজা অহিভূষণ বাহাদুর বলিতাম, প্রায় তিন মাস হইল, তিনি মারা গিয়াছেন, হঠাৎ মারা যান। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ভীরু বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবুও এই পুঁথিখানিতে যাহা লেখা আছে, তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাস হইতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

গোবিন্দরাম পুঁথিখানি ডাক্তারের হাত হইতে লইলেন। আমি তাঁহার স্কন্ধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, পুঁথির উপর লিখিত রহিয়াছে:— "নন্দনপুর রাজ্যের কাহিনী।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এটা দেখিতেছি, কে কি করিয়া যাইতেছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ এই রাজপরিবারে যে চলন চলিত আছে, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "প্রাচীন কথা আমি মনে করিতেছিলাম, আপনি আধুনিক কিছু বলিবার জন্ত আসিয়াছেন।"

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা খুব আধুনিক। কালকের মধ্যেই তাহার একটা শেষ মীমাংসা করিতে হইবে। তবে এই পুঁথিতে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত সে বিষয় বিশেষ জড়িত, বিষয়টা বড় নহে—অনুমতি করেন তো পড়ি।"

নলিনাক্ষ বাবু অনুমতির অপেক্ষা করিলেন না। পুঁথি খুলিয়াই পাঠে মন দিলেন দেখিয়া গোবিন্দরাম নিজের চেয়ারে ঠেস দিলেন, তাহার পর দুই চক্ষু মুদিত করিলেন। ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পুঁথি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কোম্পানীর আমলের আয় ব্যয়।

কোম্পানী বাহাদুরের চার্টার (Charter) আর একবার পরিবর্দ্ধিত হইল; কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের য়্যাক্টে (Act) এই নূতন চার্টারের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বিধিবদ্ধ হয় না। কেবল ঘোষিত হয় যে, পার্লামেণ্ট হইতে পুনরাদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্রাটের (Crown) ভারত সাম্রাজ্য কোম্পানীর অধীনেই থাকিবে। ডিরেক্টরের সংখ্যা চতুর্বিংশ হইতে অষ্টাদশে নামিয়া আইসে এবং এতন্মধ্যে ছয়জন ডিরেক্টর মনোনয়নের ক্ষমতা ইংলণ্ড রাজের হস্তে প্রদত্ত হয়। বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়।

নূতন চার্টার য়্যাক্ট দ্বারা আরো কতিপয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহা বঙ্গদেশের নিমিত্ত একজন গবর্ণর বা ছোটলাট নিয়োগের ব্যবস্থা করে। যে প্রদেশ একাল যাবত স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, ১৮৫৪ অব্দে সর্ব্বপ্রথম সেই প্রদেশের ছোটলাটের (Lieutenant-Governor) পদ সৃষ্ট হয়। উক্ত য়্যাক্টে আর একটী প্রদেশ স্থাপিত করার বিধান থাকে; তদনুসারে ১৮৫৯ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশ স্বতন্ত্র এক ছোট-লাটের অধীনে প্রদত্ত হয়। এই য়্যাক্ট প্রচলনে অপর যে সকল গুরুতর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে;—গবর্ণর-জেনারেল বা বড়লাটের মন্ত্রী-

সভার (Council) সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ রাজকার্য্যে ভারতীয়-গণের নিয়োগ ক্ষমতা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের হাত হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। এই সময় হইতে, এ বিষয় বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে মীমাংসিত হইতে থাকে; এই বিধানেই ভারতের সিভিল্ সার্ব্বিশ পরীক্ষায় সাধারণের প্রতিযোগীতা আরব্ধ হয়।

এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে কোম্পানীর ক্ষমতা কতকাংশে খর্ব্ব হইয়া রাজ-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পূর্ণ সমর্থিত 'ডবল গবর্ণমেণ্ট' প্রথা প্রচলিত হইতে থাকে। এই প্রথা আরো কয়েক বৎসর চলিতে থাকে, অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায়, ইংরেজ-জাতি ও ইংরেজ-পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানীর মূলোচ্ছেদের উপযুক্ত ও গুরুতর কারণ প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে ভারতবর্ষে কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বে শাসনের অবসান হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে কোম্পানী বাহাদুরের আমলের আয়-ব্যয়ের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত যে একবিংশতিবর্ষ ভারতবর্ষে কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিম্নে সেই সময়ের আয় ব্যয়ের খতিয়ান প্রদত্ত হইল। দেশীয় লেখকগণ কর্ত্তৃক এই সকল খতিয়ান সরকারী কাগজপত্র হইতে সংকলিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। এই তালিকা হইতেই পাঠকবৃন্দ তাৎকালিক দেশের আর্থিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অবসরও প্রাপ্ত হইবেন। ভূমিকর বাবদ সংগৃহীত মোট রাজস্ব এবং হোম চার্জ্জ স্বরূপে বিলাতে ব্যয়িত সমগ্র খরচের হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সন	ভূমির রাজস্ব। (পাউণ্ড)	মোট রাজস্ব। (পাউণ্ড)	ইংলণ্ডের ব্যয়ের পরিমাণ। (পাউণ্ড)	সমগ্র ব্যয়। (পাউণ্ড)
১৮৩৭—৩৮	১১৮৫৩৯৭৫	২০৮৫৮৮২০	২৩০৪৪৪৫	১৯৮৫৭৯৭০
১৮৩৮—৩৯	১২৩০৩২০০	২১১৫৮০৯৯	২৬১৫৪৬৫	২১৩০৬২৩২
১৮৩৯—৪০	১২২৭৩৯৮২	২০১২৪০৩৮	২৫৭৮৯৬৬	২২২২৮০১১
১৮৪০—৪১	১২৩১৩৮৪০	২০৮৫১০৭৩	২৬২৫৭৭৬	২২৫৪৬৪৩০
১৮৪১—৪২	১২১৫৪৫৮৭	২১৮৩৭৮২৩	২৮৩৪৭৮৬	২৩৫৩৪৪৪৬
১৮৪২—৪৩	১৩৩২২৮৮০	২২৬১৬৪৮৭	২৫৫৮১৯৩	২৩৮৮৬৫২৬

সন	ভূমির রাজস্ব। (পাউণ্ড)	মোট রাজস্ব। (পাউণ্ড)	ইংলণ্ডের ব্যয়ের পরিমাণ। (পাউণ্ড)	সমগ্র ব্যয়। (পাউণ্ড)
১৮৪৩—৪৪	১৩২২৮৮৫০	২৩৫৮৬৫৭৩	২৯৪৪০৭৩	২৪৯২৫৩৭১
১৮৪৪—৪৫	১৩২২৪০৫৪	২৩০৬৬২৪৬	২৭৮৫২১২	২৪২৯৩৬৪৭
১৮৪৫—৪৬	১৩৫৮৬৫১৭	২৪২৭০৬০৮	৩০৪৪০৬৭	২৫৬৬২৭৩৮
১৮৪৬—৪৭	১৩৯৯৫৭১৭	২৬০৮৪৬৮১	৩০৬৬৬২৫	২৬৯১৬১৮৮
১৮৪৭—৪৮	১৪৪৩৭২৫৪	২৪৯০৮৩০২	৩০১৬০৭২	২৬৭৪৬৪৭৪
১৮৪৮—৪৯	১৪২৭৪২৭০	২৫৭৯৬৮৬	৩০২২৯০৮	২৬৭৬৬৮৪৮
১৮৪৯—৫০	১৫২৪৮৬৯৪	২৭৫২২৩৪৪	২৭৫০৯৩৭	২৬৯৬০৯৮৮
১৮৫০—৫১	১৫৩৮২৪৪২	২৭৬২৫৩৬০	২৭১৭১৮৬	২৭০০০৬২৪
১৮৫১—৫২	১৫৩৯১৬৬৪	২৭৮৩২২৩৭	২৫০৬২৭৭	২৭০৯৮৪৬২
১৮৫২—৫৩	১৫৩৬৫২৫০	২৮৬০৯১০৯	২৬৯৭৪৮৮	২৭৯৭৬৭২৫
১৮৫৩—৫৪	১৫৮৩৮৬৪৯	২৮২৭৭৫৩০	৩২৬২২৮৯	৩০২৪০৪৩৫
১৮৫৪—৫৫	১৬৪১৯০৩১	২৯১৩৩০৫০	৩০১১৭৩৫	৩০৭৫৩৪৫৬
১৮৫৫—৫৬	১৭১০৯৯৭১	৩০৮১৭৫২৮	৩২৬৪৬২৯	৩১৬৩৭৫৩০
১৮৫৬—৫৭	১৭৭২২১৭০	৩১৬৯১০১৫	৩৫২৯১৭৩	৩১৬০৮৮৭৫
১৮৫৭—৫৮	১৫৩১৭৯১১	৩১৭০৬৭৭৬	৬১৬২০৪৩	৪১২৪০৫৭১

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-আরোহণের বৎসর দুই মিলিয়নেরও বেশী হোম চার্জ্জ দেওয়া বাদেও ভারতবর্ষের আয় হইতে কিছু সঞ্চিত ছিল। ইহার একমাত্র কারণ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সতর্ক শাসন এবং তদীয় ও তদীয় উত্তরাধিকারী স্যার চার্লস্ মেটকাফের উপযুক্ত সংস্কারাদি। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া লর্ড প্যাল্‌মারষ্টনের অনুসৃত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও তদনুযায়ী শাসন প্রথার অনুকরণ করেন। তদ্ধেতু সেই বৎসর হইতেই ভারতের উদ্বৃত্তের ভাগ বিনষ্ট হইয়া ঋণের বা লোকসানের অঙ্ক দেখাইতে আরম্ভ করে। তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড এলেনবোরার সময় পর্য্যন্ত এই অবস্থা বর্ত্তমান ছিল।

পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেল হারডিঞ্জ এবং ডালহৌসির শাসন সময়ে শিখযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার অধিকতর শোচনীয় হয় এবং শেষ শিখ-সমর নির্ব্বাপিত হইয়া পঞ্জাবের বর্দ্ধিষ্ণু প্রদেশ সম্মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই

অবস্থার গতিরোধ হইতে পারে না। তৎপর ১৮৪৯-৫০ অব্দে ভারতবর্ষ পুনরায় একবার সঞ্চয়ের বা উদ্ধৃত্তের পরিমাণ প্রদর্শন করায়। কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিধাতা সেই নবীন শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহে ভারতের সে অবস্থা অচিরেই তিরোহিত হইয়া যায়। ডালহৌসির শাসনকাল অবসানের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৫৩-৫৪ অব্দে হঠাৎ একবারে ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ডের উপরে উঠে এবং নাগপুর প্রভৃতি অপরাপর ধনশালী দেশ সমূহ ডালহৌসি কর্ত্তৃক ভারত সাম্রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইলেও, তাঁহার প্রস্থানের সময় ১৮৫৫-৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ব্যয়ের ভাগই অধিক হইতে থাকে।

লর্ড ক্যানিংর শাসনের প্রথম বৎসর কিছু উদ্ধৃত্ত হয়, তাহার প্রধান কারণ—অযোধ্যা অধিকার; তাঁহার আগমনের অব্যবহিতপূর্ব্বে সংসাধিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী ১৮৫৭-৫৮ অব্দে এই উদ্ধৃত্ত বিপুল ঋণভারে পরিণত হয়; এ বৎসর সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং দশ মিলিয়ন পাউণ্ড অধিক ব্যয় হয়।

পূর্ব্বোক্ত খতিয়ান হইতে অপর একটী কৌতুকাবহ অথচ শোচনীয় ঘটনা এই দেখা যায় যে, বিলাতে ব্যয়িত হোম চার্জ্জের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৃটীশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ও সংরক্ষণে গ্রেট্ বৃটেন এবং ভারতবর্ষ উভয় প্রদেশেরই লাভ; সুতরাং রাজ্যের ব্যয়ের ভাগ উভয় প্রদেশকেই বহন করা উচিত। ভারতবর্ষে ব্যয়ের ৯/১০ অংশ যদি ভারতবর্ষের নিকট হইতে আদায় হইত এবং তৎকালে ইংলণ্ডে ব্যয়িত অবশিষ্ট ১/১০ অংশ যদি ইংলণ্ড প্রদান করিত, তবেই ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় বিচার হইত বলা যায়। পূর্ব্বে ব্রিনাসের (Brennus) সময়ে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, অধুনা বিজেতার তরবারী আঘাতে সে পরিমাণ ও অনুপাতের বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে নাই; কাযেই বিজিত ও বিজেতাজাতির মধ্যে যে আর্থিক সম্বন্ধ বিষয়ে ন্যায়পরতার তুলাদণ্ড সমান হইতে পারে না—তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এভাবে প্রতি বর্ষে এদেশ হইতে যে অর্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে খাঁটি লোকসান; দেশ হইতে যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। এই প্রবাহ একটী দরিদ্র দেশ হইতে অপর একটী ধনাঢ্য দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কামনায় প্রবাহিত হইতেছে। যেদেশ হইতে এইরূপ প্রবাহধারা নির্গত হইতেছে সে দেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি, তৎবিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষ গ্রেট্ বৃটেনকে যে কর দিতেছে তাহা আমাদের বর্ত্তমান শাসন-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এক দেশ হইতে কর সংগৃহীত হইয়া সেই দেশেই ব্যয় করিলে যে ফল হয় তাহার সহিত যে দেশ হইতে কর আদায় হয়, সে দেশে তাহা ব্যয় না করিয়া ভিন্ন দেশে ব্যয় করিলে,তাহার ফল—এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান আছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় প্রজাসাধারণের নিকট হইতে যে কর সংগৃহীত হয় তাহারই কিয়দংশ তদ্দেশবাসী রাজকর্ম্মচারিগণকে বেতন স্বরূপ প্রদত্ত হয় এবং সেই সকল কর্ম্মচারী আবার তাহা দেশের শিল্পী শ্রেণীর মধ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। ইহাতে বিভিন্ন ভাবে বিতরিত হয় বটে কিন্তু ইহাতে জাতীয় আয়ের কোন ক্ষতি হয় না।

"কিন্তু যে দেশ হইতে কর আদায় হয়, সে দেশে তাহা ব্যয়িত না হওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। এক্ষেত্রে কেবল যে জাতীয় আয়ের কিয়দংশ এক জাতীয় ব্যক্তির হস্ত হইতে অপর এক জাতীয় ব্যক্তির হস্তে যায় তাহা নহে, পরন্তু কর পীড়িত দেশের সমূহ ক্ষতিকর ও সংগৃহীত সমগ্র অংশের বিলোপ সাধন হয়। ইহাতে জাতীয় সমৃদ্ধি এই হয় যে, সমস্ত টাকা অন্য দেশে যাওয়াও যা' দরিয়াতে নিক্ষেপ করাও তাই।" তৎপর লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই শ্রবণ করুন,—"The Indian tribute, whether weighed in the scales of justice or viewed in the light of our true interest, will be found to be at variance with humanity, with common sense, and with the received maxims of economical science. It would be true wisdom, then, to provide for the future payment of such of the Home Charges of the Indian Government, as really form the tribute, out of the Imperial Exchequer."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টকের লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) স্বরূপ, বিলাতী ঋণের (Home Debt) সুদ, ভারত-গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সংস্পৃষ্ট অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের ব্যয় ও কর্ম্মচারিগণের বেতন, ভারতীয় মিলিটারী ও সিভিল সার্বিশের কর্ম্মচারিগণ ছুটি লইয়া বা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে অবস্থান করিতে থাকা সময়ের বেতন, ভারতে নিযুক্তিয় গোরাপল্টন সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যয় এবং ব্রিটিশ সেনার ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াতের ব্যয়—সমস্তই ঐ পূর্ব্বোক্ত চার্জ্জের অন্তর্গত। *

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* Our Financial Relations with India, by Major Wingati.

রাণা প্রতাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

শনিগুরু ও কৃষ্ণসিংহ।

শনিগুরু। রায়ৎ কৃষ্ণসিংহ, কি শুন্‌ছি, মৃত রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপের অভিষেক-আয়োজন না হয়ে কনিষ্ঠ জগমল্লের অভিষেক আয়োজন কি নিমিত্ত দামামা ঘোষণা কচ্চে?

কৃষ্ণ। মহাশয় কি শ্রুত নন যে জগমল্লকেই রাণা উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেছেন?

শনি। কথা শুনে থাক্‌বো, কিন্তু আমার বিস্ময় উপস্থিত হচ্চে। বংশাবলীক্রমে রায়ৎকুল মিবারের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত, সেই উচ্চবংশের বংশধর রায়ৎ কৃষ্ণ-সিংহ স্বয়ং বিদ্যমান—মিবারে এরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন? রাণাবংশের চিরপ্রথা কি নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হচ্চে?

কৃষ্ণ। রোগী আসন্নকালে একটু দুগ্ধ পান কর্‌তে ইচ্ছা করেছে, তাতে আমাদের ক্ষতি কি? কেনই বা তাতে আমরা অসম্মত হব?

শনি। মহাশয়ের মনোভাব আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্চে না।

কৃষ্ণ। ঝালোয়ার অধিপতি! আপনার ভাগিনেয়ই সমস্ত সর্দ্দারের একান্ত মনোনীত, আমরা সেই পরামর্শই মৃত রাণার চিতা-বেদিকার পার্শ্বে ব'সে স্থির করেছি, আমরা প্রতাপের পক্ষই অবলম্বন কর্ব্বো। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, আসুন তাদের মন্তব্য শ্রবণ কর্ব্বেন। মিবার সর্দ্দারগণ অন্যায় কার্য্য কখন অনুমোদন করে না।

(উভয়ের প্রস্থান)।

প্রতাপমহিষী ও প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। দেবী, তুমি একান্তই আমার সঙ্গে যাবে? আমি কোথায় যাচ্চি অবগত আছ কি?

রাণী। প্রভু, সূর্য্যবংশের কুলনারীর প্রথা স্বামীর অনুবর্ত্তী হওয়া,—এ প্রথা জানকীদেবী স্থাপন করেছেন, দাসী সেই প্রথা অনুসারে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী, বৃক্ষতল তার অট্টালিকা। যে স্থানে স্বামী, সূর্য্যবংশের কুলবধূও সেই স্থানে অবস্থান করে—সে প্রথা এ দাসী হতে লঙ্ঘন হবে না।

প্রতাপ। দেবী, অতি দূরদেশে গমন কর্ব্বো, যথায় রাজপুত নাম কেউ শ্রবণ করে নাই, এমন স্থানে গিয়ে বাস কর্ব্বো যথায় আরাবলী পর্ব্বত নয়ন-পথে পতিত হবে না, সেই স্থানে যাবো, যথায় মোগলের সিংহনাদ কর্ণপথে প্রবেশ কর্ব্বে না—সেই আমার বাসস্থান। অতি দূরে—অতি দূরদেশে গমন কর্ব্বো।

রাণী। চলুন।

প্রতাপসিংহ। হে জননী মাতৃভূমি সুন্দরী মিবার,
হতভাগ্য পুত্র তব হবে নির্ব্বাসিত—
তব অঙ্কে নাহি স্থান তার!
যেই স্নেহময়ী-অঙ্কে করেছ লালন—
প্রতি শিলাখণ্ড যথা করিছে প্রচার
শিশোদিয় বংশের গৌরব,
সেই বীরভূমে নাহি প্রতাপের স্থান!
ছিল সাধ মনে, স্মরি পিতৃদেবগণে
হে বীর জননি,
তব যশোরাশি করিব বিস্তার—
বিফল সে সাধ,
পিতা মম সাধিলেন বাদ,
সিংহাসন অর্পি জগমলে।
শত্রু নিপীড়িত অই শ্রীহীনা চিতোর
তব উদ্ধার কারণ,
বক্ষের শোণিত দানে ছিলাম উৎসুক
নিষ্ফল সে আলোচনা আজি
ওই দুন্দুভি নিনাদ
কলরব অভিষেক-উৎসবে
প্রতাপের নির্ব্বাসন করিছে জ্ঞাপন।

(শনিগুরু, কৃষ্ণসিংহ, সর্দ্দারগণ, পুরোহিত ও চারণের প্রবেশ)

কৃষ্ণসিংহ। মহারাণা, বন্দে দাস,
রাজপুরী পরিহরি কোথায় গমন?
আজি অভিষেক দিন তব।

প্রতাপ। রাওয়ৎ প্রধান, পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে
মম কনিষ্ঠের অভিষেক হয় আয়োজন,
রাণাপুরে স্থান কোথা মম ?

কৃষ্ণ। মহারাণা, মিবার সর্দ্দারগণে
জানে মাত্র মিবারের প্রাচীন নিয়ম,
সে নিয়ম অনুগামী সবে,
বদ্ধমূল যে নিয়ম রাজপুত হৃদয়ে
শিখায় নীচত্ব ঘৃণা, মনুষ্যত্বে করে উত্তেজিত
যার বলে তুচ্ছ জ্ঞান বিপদ মরণ
যে নিয়মে সিংহাসন প্রতাপসিংহের।
সে নিয়ম করি অতিক্রম
শত্রু-করগত হেরি চিতোর নগরী
সুযোগ প্রয়াসী অরি সতর্ক সতত
মিবার ধ্বংসের কল্পনায়—
এ সকল হেরি বিদ্যমান
কোথা যাও রাজপুত প্রধান
মাতৃভূমি ক্রন্দনে না করি কর্ণপাত ?

প্রতাপ। পুরোহিত, নহে তো বিহিত
সূর্য্যবংশে পিতৃআজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।

পুরো। সূর্য্যবংশের নিয়ম, পিতৃদেবগণের কৃপায় এ ব্রাহ্মণ অবগত। সূর্য্যবংশের নিয়ম ধর্ম্মরক্ষা, সূর্য্যবংশে অপর নিয়ম নাই। যদি সে নিয়ম পালন বাপ্পারাওয়ের বংশধরের বাঞ্ছনীয় হয় তাহলে প্রতাপসিংহের সিংহাসন গ্রহণ করা উচিত, তাঁর মিবার পরিত্যাগ করা কাপুরুষত্ব হবে। শত্রু সম্মুখীন হয়ে এরূপ কাপুরুষজনিত ভাব বীরবর অর্জ্জুনের হৃদয়ে উদয় হ'য়েছিল। যদি প্রতাপসিংহ মিবার পরিত্যাগ করেন, তাহলে সকলে অবজ্ঞা করে বল্‌বে যে বাপ্পারাওএর বংশধর তুর্কির ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ কর্‌লে। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উদ্ধৃত করে বংশের হিতার্থে বল্‌ছি,
"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

চারণ। আরে ঠাকুর তুমি কি বল্‌ছ কৃষ্ণ অর্জ্জুন ঘটে এক তিল বুদ্ধি নেই। মহারাণা রামলীলে কর্‌বেন, তারই জোগাড় কর্‌তে পার, দেখ! মহারাজ

ঘরো হনুমান এই চারণ আছে, এই হনুমানেই এক রকম চল্‌বে, এদিকে তো মহারাণীকে এনে গাছতলাতে দাঁড় করিয়েছেন, পিতৃসত্য পালনে বনে যাচ্চেন, রাণী সঙ্গে আছেন, এখন একটা রাবণ ঠাউরে দেখুন।

প্রতাপ। বর্ব্বর!

চারণ। বর্ব্বর কে মহারাজ!

প্রতাপ। তুমি রাবণের কথা কি বল্‌ছ?

চারণ। আপনি সূর্য্যবংশের রাণার বনে যাবার কথা কি বল্‌ছেন?

প্রতাপ। আমি পুরোহিত মশায়ের নিকট হিতকথা জিজ্ঞাসা কচ্চি।

চারণ। আমি মহারাণার নিকট মিবারের হিতকথা বল্‌চি।

প্রতাপ। চারণ, তুমি কি এ গুরুতর অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

চারণ। গুরুতর অবস্থা না বুঝে কি এই গানটী রচনা করেছি?

গীত।

জয় জয় আকবর বাদ্‌সার জয়
পালায় প্রতাপসিং পেয়ে মহাভয়
উচ্চ রবে গাও সবে মিবার বিজয়।

প্রতাপ। কি চারণ, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা!

চারণ। মহারাণা, অরাজক রাজ্যে তো লোকের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়ই। বাপ্পা-রাওএর সিংহাসন পরিত্যাগ কচ্চেন, মিবারকে তুর্কির করে অর্পণ কচ্চেন, সর্দ্দারের উপরোধ অবহেলা কচ্চেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ কচ্চেন, প্রজার মুখ চাচ্চেন না, যখন স্বয়ং মহারাণার এই অবস্থা, তখন মহারাণার আশ্রিত লোকের যে অবস্থা হওয়া উচিত, তাই আমার হয়েছে। মহারাণা তুর্কিকে রাজ্যদান কচ্চেন, আমিও তুর্কির জয়গান কচ্চি। মনে মনে সংকল্প, যে সকল বীরগাথা, কুলগৌরব মহারাণা এই আশ্রিতের মুখে শ্রবণ কর্‌তেন, মনে করেছি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে, প্রতি প্রস্তরে এই নূতন গাথা খোদিত করে আরাবলী শিখর হতে ঝাঁপ দেব।

প্রতাপ। পুরোহিত, যদি আমার সিংহাসন গ্রহণ করা সকলের অভিমত হয়, আমি সিংহাসন গ্রহণ কর্ব্বো, কিন্তু জয়মল্ল অযোগ্য কেন আপনারা স্থির করেছেন? জয়মল্লও ক্ষত্রিয়, বাপ্পার শোণিত তার ধমনীতেও প্রবাহিত! জয়মল্ল যদি অযোগ্য না হন, তবে কেন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ব্বো?

পুরো। মহারাণার বিবেচনায় যদি তিনি যোগ্য হন, তবে কি নিমিত্ত মিবার

পরিত্যাগ কর্ব্বেন? চণ্ডের ন্যায় কনিষ্ঠকে সিংহাসন দিয়ে আপনি রাজ-কার্য্য কি নিমিত্ত কর্ব্বেন না?

প্রতাপ। পুরোহিত মার্জ্জনা করুন। বাল্যকাল হতে মনে মনে আশা, চিতোর উদ্ধার কর্ব্বো, পিতৃদেবগণের নাম রক্ষা কর্ব্বো, কিন্তু সে আশা আমার সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

চারণ। না আপনার বীর বাসনা পূর্ণ হবে, এই আশ্রিত চারণ চিতোর জয়গান কর্ব্বে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়!

কৃষ্ণ। রাজনীতি সুপণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রতাপ,
নহে কভু অগোচর তব,
প্রজা করে রাজা নিরূপণ;
সেই রাজা—প্রজা যার মানিবে শাসন,
কর্ত্তব্য প্রজার রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন,
প্রজা যারে করে নির্ব্বাচন
রাজসিংহাসন করিতে গ্রহণ
নহে কি কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁর?
মীবার সর্দ্দারগণে করে নির্ব্বাচন
সিংহাসনে ছত্রধারী তুমিহে রাজন্!
শূন্য সিংহাসন বহুক্ষণ রাখা অনুচিত—
আগমন হোক সভাস্থলে।

প্রতাপ। চল তবে অভিমত যদি সবাকার।

সকলে। জয় মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গীয় নাটকের ক্রমোন্নতি।

(সংক্ষেপে লিখিত)

বঙ্গসাহিত্য এখন নিজেকে নির্ব্বিবাদে সাবালক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। যে সাহিত্য হইতে প্রকৃত নাটক প্রসূত হইয়াছে—তাহার যে বন্ধ্যাত্ব

ঘুচিয়াছে, সে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। অবশ্য, আমাদের দেশে যাঁহারা 'বিখ্যাত নাট্যকার' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের 'নাটকাবলীই' যে প্রকৃত নাটক,—আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে এই সংখ্যাতীত নাট্যকারদিগের মধ্যে দুই এক মহাত্মার আবির্ভাবে যে আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত নাটকের অভাব দূর হইয়াছে,—একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। সমীচীন সমালোচক মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। আর শুধু আমাদের দেশ কেন? নাটক সম্বন্ধে একথা প্রায় প্রত্যেক দেশের পক্ষেই খাটে। প্রায় প্রতি উন্নত সাহিত্যেই রাশি রাশি পুস্তক নাটক-নামে অভিহিত হইয়া প্রসূত হইতেছে;—কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকই—নাটকত্ববিহীন! যে ইংরাজী সাহিত্য আজ জগতে একটা মহাশক্তিশালিনী-সাহিত্য বলিয়া পরিচিত, যে সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যে ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালিত করিতেছে সেই সাহিত্যের আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে নাটক রচনায় সেক্সপীয়র ব্যতীত আর কেহই পূর্ণ-কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গত শতাব্দী হইতে ইংরাজী নাট্য-কাব্যে প্রকৃত নাট্য রচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন ইংরাজী সাহিত্যেরই এই দশা, তখন এই দরিদ্র সাহিত্যের আর কথা কি? তাই বলিতেছিলাম, যে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত নাটকের অভাব বলিয়া এখন আর আক্ষেপ করিবার বিশেষ কারণ দেখি না। আমাদের সাহিত্যে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে যে পাইয়াছি—ইহাই আমাদের বহু সৌভাগ্যের কথা।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাগত পার্থক্যে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও, ইহার অর্থ এক। শ্রাব্যকাব্যের ন্যায় যে কাব্যের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কাব্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকেই দৃশ্যকাব্য বা নাটক কহে। * রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে 'নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয়ত হইতে পারে, না হয়ত অভিনয়ের পোড়া কপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই!" আমরা কিন্তু নাটকের উক্তরূপ 'ভাবখানা' হওয়া উচিত মনে করি না। 'মান্ধাতা আমলের' কোন দুই একখানি অভিনয়-অনুপযোগী নাটকের নামোল্লেখ করিয়া একথা সমর্থন

নাটকের অভিধান।

* ইংরাজী ভাষায় নাটককে 'ড্রামা' বলিয়া থাকে। Drama শব্দটী Drao ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। Drao কথাটা গ্রীসীয়। গ্রীস দেশই ইউরোপীয় নাটকের পথপ্রদর্শক।

করিতে যাওয়া বৃথা! নাটক অভিনয়াত্মক। অভিনয় কার্য্যই যে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর এই নিমিত্তই নাটকের অপর নাম—দৃশ্যকাব্য। যদি কোন নাটক নানা গুণপনা থাকা সত্ত্বেও অভিনয়োপযোগী না হয়, তাহা হইলে সেই পুস্তক নিবদ্ধ নির্জীব অক্ষরগুলা কবির হৃদয়োচ্ছ্বসিত ভাবের সম্পূর্ণ সজীব, পূর্ণতম প্রতিমূর্ত্তির স্থান কখনই পূর্ণ করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, নাটককে পাঠোপ-যোগী এবং অভিনয়োপযোগী উভয়ই করিতে হইবে। উপরোক্ত দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইলেই, নাটকে নাটকীয় ভাগের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।

শ্রাব্য কাব্য দুরূহ বলিয়া সকলের অধিগম্য নহে। সেই জন্য, অভিনয় দেখিয়া সাধারণে যাহাতে আনন্দলাভ ও শিক্ষালাভ করিতে পারে,—সেই উদ্দেশ্যেই নাটক কল্পিত হইয়াছে। প্রায় সকল দেশেই ধর্ম্মের উপরেই নাটকের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণের অভিনীত দৈবক্রিয়া হইতে বিলাতী নাটকের উৎপত্তি।* গ্রীসদেশে এপলো, ডাইওনিসিয়স্ প্রভৃতি দেবগণের প্রীত্যর্থে জাতীয় উৎসব হইত। সেই সময় হইতেই গ্রীসে নাটক অভিনয়ের আরম্ভ হইয়াছিল।

নাটকের উৎপত্তি।

"ভারতীয় নাট্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে মহামুনি ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদশাস্ত্র দ্বিজাতির বিশেষ অধিকারভুক্ত বলিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুরোধে বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা যোগযুক্ত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ নাট্যাখ্য সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন।" † সেইরূপ আমাদের সাহিত্যেও বৈষ্ণব-কবিদিগের গান হইতেই গীতাভিনয়ের আরম্ভ হইয়াছে। দেবতা-সম্বন্ধীয় জাতীয় উৎসবে, যাত্রায়, নাটকাদি রচিত হইয়া অভিনীত হইত। তাই বলিতেছিলাম যে, সর্ব্ব দেশেই নাটক ধর্ম্মমূলক ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষার সঙ্গে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া অবশেষে সার্ব্বজনিক চিত্রাঙ্কনে পরিণত হইয়াছিল। কোন নাটকই ধর্ম্মের একটা সঙ্কীর্ণ বন্ধনীর মধ্যে বেশী দিন থাকিতে পারে নাই।

Drao অর্থে ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকে মূল ধরিয়া ইংরাজী নাট্যশাস্ত্রকারেরা ক্রিয়ার অনুকরণে ক্রিয়ানুষ্ঠান—নাটকের এই অর্থ করিয়াছেন।

* The drama had been at first connected with the church. It represented, both to instruct and to amuse the people, events of sacred history and of the lives of saints, or threw into the form of a play some moral allegory, enlivened by grotesque incidents :—Dowden.

† সর্ব্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্ব্ব শিল্প প্রবর্ত্তকং।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্॥

কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই বঙ্গীয় নাট্যকলার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা আর নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে বহুদর্শী চিন্তাশীল লেখকদিগের অনুসরণ করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই বলিব।

যখন সংস্কৃত নাটক, সাহিত্যের মধ্য গগন পার হইয়া অস্তগমনোন্মুখ হইতেছিল, যে সময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ ধর্ম্মের মহাপ্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই শুভ মুহূর্ত্তের অব্যবহিতকাল পর হইতেই বঙ্গসাহিত্যে গীতাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। মহা প্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-নদীতে নৈতিক-উন্নতির 'কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল। সেই উন্নতির যুগে, শুধু ধর্ম্ম সঙ্গীত, আর বঙ্গবাসীদের চিত্ত বিনোদন করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-রাধার গুণ কীর্ত্তনাদির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মনের অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মনের স্বরূপ দেখাইবার আগ্রহেই গীতাভিনয়ের উৎপত্তি। এই গীতাভিনয়ের আবির্ভাব কালের পর হইতে ভারতে ফিরিঙ্গী-শাসনের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত, যে সমস্ত নাটকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের ন্যায় 'ইতিহাসের জীর্ণ মন্দিরে আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' 'বস্ত্র হরণ নাটক'• 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' প্রভৃতি যে সকল নাটকের নাম শুনিয়া আসিতেছি, সে সকল নাটকের অস্তিত্ব এখন শুদ্ধমাত্র নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে গীতাভিনয়ের সূত্রপাত।

তবে সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকায়"বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণে" যে সকল নাটকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'প্রেম নাটকের' ভাষা দেখিয়া উক্ত পুস্তকখানিকেই বঙ্গীয় আদি নাটক বলিয়া মনে হয়। প্রায় আশি নব্বই বৎসর হইল, বঙ্গভাষা যখন সমাস বিড়ম্বিত হইয়া এক অভিনব কণ্টকিত ভাষার সৃষ্ট হইতেছিল, যখন 'ভাষার কণ্ঠে অলঙ্কার ভ্রমে গলগণ্ড হইতেছিল,—তখনই যে এই 'প্রেম নাটকের' সৃষ্টি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পুস্তক বুঝিয়া উঠা দুরূহ ব্যাপার! কারণ তাহাতে না আছে কিছু কবিত্ব না আছে ভাষা। থাকিবার মধ্যে কেবল বিশেষণের ঘটা আর কলুষিত প্রেমের বর্ণনা! পুস্তকের আরম্ভে 'শুণক ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পর—"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী

বঙ্গীয় আদি নাটক।

ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রূকুটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দকুসুমদশনা কোমল রসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রূকামধনুগঞ্জনা গৃধিনী শ্রবণা' ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ রাজি একটানা স্রোতে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারা যায় না!" তবে পুস্তকের উপসংহারে চারি লাইনের কবিতাটি পাঠে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝা যায়। লেখক 'প্রেম নাটকের' উপসংহারে বলিতেছেন,—

"অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ
নারীর সহিত প্রেম করোনা কখন।"……ইত্যাদি।

১২৯৫ সালে ভদ্রার্জ্জুন নামক নাটক এবং পরে আরও দুই একখানি প্রাচীন নাটকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদারের কৃত সীতার অগ্নি পরীক্ষান্তে রাম ও সীতার সম্মিলন বৃত্তান্ত মূলক নাটকই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি উক্ত পুস্তকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, যে জীব জগতের ন্যায় সাহিত্য জগতেও ক্রমপরিণতি হইয়া থাকে। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভাষা এবং ভাব ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইয়াছে। এই কথা বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠিচরণের ভাষা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম:—"প্রাণসই কি করি এ অসিম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছিনা, হৃদয় বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে. তত্রাচ আমি তোমার বাক্যের অধিন, কেবলমাত্র তোমার স্নেহময় বাক্যে এতদিন জীবনধারণ করেছি, এখন তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি।

যাহাহউক, নাটকের আদি রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যে সর্ব্বপ্রথম প্রহসন লেখক তাহা অস্বীকার করিবার কারণ দেখিনা। কারণ মধুসূদনের প্রহসনের পূর্ব্বে আর কোন প্রহসনের অস্তিত্ব দেখিয়াছি বলিয়াত মনে হয় না। ইহার দুইখানি প্রহসন। একখানির নাম—'ভদী বিদ্যানিধির সং।' অপর খানির নাম—'সখাদাসী সখাদাস বৈষ্ণবের সং।' পুস্তক দুইখানিই ভণ্ডামির মস্তক চর্ব্বণার্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত উভয় পুস্তকই অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ—সুতরাং অপাঠ্য।

প্রথম প্রহসন লেখক।

যে সময় বঙ্গীয় নাট্যকলার উক্তরূপে হাতে খড়ি চলিতেছিল, বঙ্গভাষা যখন যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদিগের দ্বারা পুষ্টলাভ করিতেছিল, সেই সময়ে একজন পণ্ডিতের আবির্ভাবে নাটকের কিছু বেশী রকম সংস্কার হইয়া গেল।

তাঁহার নাম—রামনারায়ণ তর্করত্ন। মৃত্যুঞ্জয় যেরূপে 'অনাদৃতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মাণা, সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা মাতৃভাষাকে "তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা" বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, রামনারায়ণও সেইরূপ পিতৃমাতৃহীনা বালিকার মত অপোগণ্ড বঙ্গীয় নাট্যকলার লালনপালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নামক সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতানুযায়ী নাটক প্রণয়ন করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই 'কুলীন কুল সর্ব্বস্বকেই, সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য নাটক বলা যাইতে পারে। কুলীন কুল সর্ব্বস্ব পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজ কলঙ্কের চিত্র। এখন সমাজে যেরূপ ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তখন সেইরূপ মেয়ে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এই বৈবাহিক বণিক্ বৃত্তি লোপ করিবার জন্য এই নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নাট্যশক্তি সমাজের হীনবৃত্তি লোপ করিতে পারিয়াছিল কিনা জানিনা। তবে বাঙ্গালী এই গ্রন্থখানিকে নিজের প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, তিনি বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর মজ্জাগত কথা, ঠিক বাঙ্গালা ভাষায় বলিতে পারেন নাই। সেই রুচির পরিবর্ত্তন কালে (Transition periodএ) তিনি বাঙ্গালীর রোচক করিয়া নাটক লিখিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় নাট্য জগতে এক সীমায় প্রচলিত ভাষায় রচিত যাত্রার নাটকে এবং এক সীমায় সংস্কৃত নাটকানুযায়ী 'রত্নাবলী' 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' প্রভৃতি নাটকাদিতে গোল বাঁধাইয়াছিল। এই উভয় জাতীয় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যভাবে সমাবেশ দ্বারা নাটকের আদর্শ ভাব ও ভাষা সৃষ্টি করিবার জন্য, এবং নাটকের নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য, বঙ্গসাহিত্যে এক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের আবশ্যক হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাহাই পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম—"মধুসূদন।" মধুসূদন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে যুগ গিয়াছে তাহার পটোত্তলন পূর্ব্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া বৃথা। এই পরিবর্ত্তন সময়ে (Transition periodএ) প্রাচীন রুচির উপাসনা করিতে যাইলে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই অধিক। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কতকটা ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটক প্রণয়ন করিলেন। নান্দী, নটী ও সূত্রধর এ সমস্ত তিনি নাটক হইতে একেবারে বিদায় দিলেন। আর এদিকে সংস্কৃত নাটকসমূহের অনুকরণে তাঁহার নাটকে কঞ্চুকী বিদূষক প্রভৃতির চরিত্র প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাকেই নব্যধরণের নাটকের প্রকৃত পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কারণ অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনিই নাটকের প্রায় সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিসও তিনি কিছু কিছু নাটকান্তর্গত করিয়া গিয়াছেন। প্রথম—প্রহসনের চরিত্র গুলি। দ্বিতীয়—সঙ্গীত। প্রহসনের ভাষা যাহার মুখে যেমন দেওয়া সঙ্গত, তাহার মুখে ঠিক তেমনই দেওয়া হইয়াছে। আর সঙ্গীত—ইহা

বাঙ্গালা ভাষার একটা জীবন্ত জিনিষ! মধুসূদন নাটকে সেই সঙ্গীত দিয়া নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অনেকে নাটকে সঙ্গীত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, অপর কোন ভাষার নাটকেত বড় একটা সঙ্গীতের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে বাঙ্গালা নাটকের এ বিড়ম্বনা কেন? কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে নাটক-উপযোগী হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের ভাষার সঙ্গীতে যত আছে, সেরূপ আর কোন ভাষায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে সঙ্গীত বঙ্গীয় নাটকের একটা অঙ্গ বিশেষ। ইহাকে নাটক হইতে নির্ব্বাসিত করিলে নাটককে কিছু খোঁড়া হইয়া থাকিতে হয়। যাঁহারা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার মধুরতা আস্বাদন করিতে অক্ষম। নতুবা এমন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

সয়রুল মোতাখরীণ।—৺গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক অনুদিত। শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশার পারস্য ইতিহাস 'সয়রুল মোতাখরীণে'র সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। 'সয়রুল মোতা-খরীণ' নামক ইতিবৃত্ত খানির ঐতিহাসিক উৎকর্ষতা পারস্য ভাষাভিজ্ঞ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল পণ্ডিতকেই স্বীকার করিতে হয়। গোলাম হোসেন কৃত 'সয়রুল মোতাখরীণে'র প্রথম অধ্যায়ে কৈফি লিখিত হিন্দু পর্ব্বের এবং আওরঙ্গজেবের সময়াবধি মুসলমান পর্ব্বের ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় বড়ই সুপ্রসিদ্ধ। ইং ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খৃঃ অব্দ অবধি হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইহাতে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা শেষ সপ্ত মুসলমান সম্রাট এবং ইংরাজ শক্তির প্রথম অভ্যুত্থানের ইতিহাস। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ইলিয়ট্ সাহেব বলেন—"এই সকল চিত্তাকর্ষক ঘটনা লেখক অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত স্পষ্ট, সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। এরূপ ভাষা এসিয়ার লেখকদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং এই কারণেই লেখক মুসলমান গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।" ফিরিস্তার অনুবাদক ব্রিগস্ বলেন—"ইতিহাস সঙ্কলন ইহাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও আবশ্যকীয় হইতে পারেনা।"

আমরা এ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। নমুনার কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াছি; বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইতেছে। আমরা ইহার অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া রহিলাম।

৩১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫ম বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৫। [৩য় সংখ্যা।

April 1908.

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়" ১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে বঙ্গীয়-সাধনা সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। ডাঃ মাঃ লাগে না।

বঙ্গীয় নাটকের ক্রমোন্নতি।

মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে 'ঐতিহাসিক নাটক' আমদানী করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে 'শর্ম্মিষ্ঠা' তৎপরে গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে 'পদ্মাবতী' এবং অবশেষে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক তিন খানিতে তাঁহার লিপি-কৌশল ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। ভাষার পারিপাট্যে, ঘটনা বৈচিত্র্যে, চরিত্র চিত্রণে পদ্মাবতী শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণকুমারী পদ্মাবতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার নাটকের ভাষা ঠিক নাটকোপযোগী না হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব নাটককারগণের ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে সুমধুর এবং কবিত্বপূর্ণ। যাহা হউক, মধুসূদনের নিকট তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গীয় নাট্যকারগণ যত ঋণী, তত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে।

মধুসূদন যখন আর্য্যসাহিত্যের ও জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ লইয়া কতকটা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে নাটক প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন মনিষী ঠিক তাঁহার পথানুসরণ না করিয়া আত্মশক্তি উদ্ভাবিত পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম দীনবন্ধু। মধুসূদন 'প্রহসনে' যে জাতীয় চরিত্রের সামান্য একাংশ আঁকিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই জাতীয় চরিত্রের বিভিন্ন অংশ আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই চরিত্র—বাঙ্গালী চরিত্রের মৌলিকতা। স্বীকার করি, যে আমাদের চরিত্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্রের মিশ্রভাব অর্থাৎ 'মিক্শ্চার'। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য, যে তাহা মৌলিক মনোভাবেরই মিশ্রণ। দীনবন্ধু সেই মৌলিক চরিত্র অঙ্কণে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও বহুল বৈচিত্র্য বিহীন হইলেও এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই কবিত্বশক্তি ও কল্পনা খেলাইবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা। আর সেই জন্যই বোধ হয় দীনবন্ধুকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন এক এক খানি 'ফটোগ্রাফ্' হইয়াছে।

তবে মধুসূদনের নাটকাদি যে দোষে দূষিত, দীনবন্ধুর নাটকাদিও সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই; স্থানে স্থানে কৃত্রিমতা দোষে দূষিত হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক নাটকে যেখানে সেখানে বৌ, ছেলের মুখে

কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। 'নীলদর্পণের' শেষ অঙ্কে বিন্দুমাধব পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বীয় জায়াকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া, যে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে কবিতা 'আওড়াইতে' লাগিলেন,—তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে নাটকীয় সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস! অনেকে উক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যখন শোকের সময় বিন্দুমাধবকে বলিতে শুনি যে,—"হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনী যোগে অঙ্গ চালনা দ্বারা স্তন-পানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোক দুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।"—তখন মনে হয়, বিন্দুমাধব স্বীয় জননীর সহিত রোদনের পরিবর্ত্তে 'ইয়ারকি' দিতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় উহা হৃদয়ের ভাষা নহে, কৃত্রিমতাপূর্ণ শব্দাড়ম্বর মাত্র! যাহা হউক, জগতে নির্দ্দোষ জিনিষটা পাওয়াই দুষ্কর! দীনবন্ধুর নাটকাদি নির্দ্দোষ না হইলেও, যে তাঁহার 'নীলদর্পণ' সর্ব্বপ্রথম নাটকীয় আত্ম সমন্বিত নাটক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, এই নাটকই একদিন বঙ্গভাষাকে জগতের নিকট পরিচিত করাইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকে আর একটা বিশেষত্ব আছে। তাহা হাস্যরস। তিনি নাটকে অজস্র-ধারায় হাস্যরস ছড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই হাস্যরসে একটু সংযমের অভাব ছিল। তাহার ফলে, নাটকগুলি স্থানে স্থানে একটু অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইয়াছে। অবশ্য, একথা স্বীকার করি, যে কবি অনেকস্থলে অনেক কথা নিঃসঙ্কোচে ও বিশুদ্ধ চিত্তে লিখিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের পাপ মনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অযথা কবির রুচির নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকের সর্ব্বত্র তাহা নহে। তাঁহার 'লীলাবতী' ও 'সধবার একাদশী' একথায় সাক্ষ্য দিবে। সাহিত্যের যেঅঙ্গেই হউক—অসংযমজনিত অনাবশ্যক অশ্লীলতা অসমর্থনীয়।

ক্রমে ক্রমে নাটক আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না। জগতের সকল পদার্থই সঙ্কীর্ণতা ও সসীমতার মধ্য দিয়াই অসীমতা ও অনন্তে পৌঁছাইয়া থাকে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। নাটকের অবস্থাও তাহাই হইল। নাটকের পরিধি বাড়িবার শুভ লক্ষণ দেখা দিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন উষার অসংখ্য রশ্মি জগতের অন্ধকার অনেকটা অপসারিত করিয়া দেয়, নাট্য জগতেও

সেইরূপ অসংখ্য রশ্মি দেখা দিয়াছিল। সেই অসংখ্য রশ্মির মধ্যে মনোমোহন, শরচ্চন্দ্র, হরলাল ও রাজকৃষ্ণের রশ্মিই সমধিক সমুজ্জ্বল।—তদ্দ্বারা বাঙ্গালী জীবন কতকপরিমাণে আলোকিত হইয়াছিল। মনোমোহন দুই একখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া কল্পনাবলে একটী নূতন জিনিসের সৃষ্টি করিলেন। তাহা—'প্রণয় পরীক্ষা'। রাজকৃষ্ণ দেখিলেন যে, হিন্দুজাতির প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম। "তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।" সেই জন্য পৌরাণিক অবলম্বন করিয়া তিনি 'প্রহ্লাদ-চরিত্র,' 'বামনভিক্ষা' প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই বঙ্গীয় নাটকের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবন কতটা পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা আমার সাধ্যাতীত। তবে বঙ্গীয় নাট্যালয়গুলি 'নীলদর্পণ' এবং শরচ্চন্দ্রদাসের 'শরৎসরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীর জড়প্রাণে এক অপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেমের ভাব জাগাইতে এবং তাহার পর পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ে আমাদের কতকটা ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া তুলিতে যত সহায়তা করিয়াছিল, তত আর অন্য কিছুতে পারে নাই;—ইহা স্থির নিশ্চিত। ইতিমধ্যে 'নয়শো রূপেয়া' নামক একখানি সামাজিক নাটক "শিশিরীদল" হইতে বাহির হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় যত নাটক প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'নীলদর্পণ' ব্যতীত কোনটিই নাটকত্বে 'নয়শো রূপেয়া'র নিকট পৌঁছে নাই বলিয়া মনে হয়।

এই সময়ে নাট্যজগতে এক অতি শুভমুহূর্ত্ত আসিল। এই শুভমুহূর্ত্তে গিরিশচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। বঙ্গ-ভাষাকে ধন্য করিলেন, নিজে ধন্য হইলেন। মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রভৃতি পূর্ব্ব নাট্য-কারগণের সমস্ত উপকরণই ইনি উত্তরাধিকারীর মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুধু যে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে! সেই জিনিষগুলিকে নিজের মত করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা, এবং অদ্ভুত-সৃষ্টিকরী ক্ষমতা লইয়া নাট্যজগতে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পূর্ণ নাটকীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সামঞ্জস্যরূপে সমাবেশ দ্বারা অর্থাৎ বিষয় হিসাবে একের অল্পতা এবং অপরের প্রবলতা দ্বারা, আদর্শ নাটক প্রণয়ন করিলেন। অবশ্য, তাঁহার সকল নাটকেই যে কৃতিত্ব আছে—এমন কথা

বলিতেছি না। তবে একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যে তাঁহার এই "রাশি রাশি" নাটকের মধ্যে কতকগুলি নাটক,—আজ জগতে যাঁহারা বিখ্যাত নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রায় অধিকাংশ নাটকেরই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে সক্ষম। 'বঙ্কিমের প্রতিভা অদ্ভুত সৃষ্টিকরী' বটে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইলে, এই কথা বলাই উচিত, যে চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের স্থান আমাদের সাহিত্যে সকলের উচ্চে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসেই সেই গুলির বিকাশ সাধন করিয়াছেন। যেমন নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ও অমরনাথ এই তিনেরই একটি চরিত্র—কেবল রূপান্তর মাত্র। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহার উক্ত শ্রেণীর প্রত্যেক নাটকেই বিভিন্ন প্রকার মৌলিক চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহার 'মুকুল মুঞ্জরায়' মুকুল ও বরণচাঁদ, 'ভ্রান্তিতে' রঙ্গলাল ও গঙ্গাবাই, 'কালাপাহাড়ে' কালাপাহাড় ও চিন্তামণি, 'সৎনামে' বৈষ্ণবী, গুলসানা ও চরণদাস, 'বলিদানে' জোবী ও দুলালচাঁদ, 'প্রফুল্লে' মদনদাদা ও কাঙ্গালীচরণ, প্রভৃতি কত বলিব,—সকলগুলিই এক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি! কবিবর ভাবের চক্ষে মানব-প্রকৃতির অনন্ত তত্ত্ব দেখিয়া স্বীয় প্রতিভা গুণে উক্ত চরিত্রগুলিকে সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র যে শুধু চরিত্র সৃজনে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা নহে। ঘটনাবৈচিত্র্যে তাঁহার নাটকের সমকক্ষ বঙ্গভাষায় অতি অল্প পুস্তকই আছে। সমালোচক প্রবর Dowden বলিয়াছেন,—Shakspere, though so remarkable for his power of creating character, is not distinguished among dramatists for his power of inventing incident'" সুলেখক বিহারীবাবু এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, "ঘটনা কল্পনাতে সেক্সপীয়রের কৃতিত্ব নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অতুল কৃতিত্ব। তাঁহার বাহাদুরী নিশ্চিতই।" তাই বলিতেছিলাম, যে গিরিশচন্দ্রের নাটক বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তিনি যে শ্রেণীর নাটকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই সোণা ফলাইয়াছেন। "তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে প্রফুল্ল, হারানিধি ও বলিদান সামাজিক নাটকে দেখাইয়াছেন, যে গৃহস্থ বাঙ্গালীর শান্ত হৃদয়েও ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাতে ইয়ুরোপের সাহিত্যগর্ব্ব রোমান ট্রাজিডির তমসাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গও সংঘটিত হইতে পারে।" তাঁহার বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব

ও পাণ্ডবগৌরব প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটকের জীবন্ত মোহিনী-শক্তিতে শিক্ষিত বঙ্গের প্রাণে হিন্দুপুরাণের আদর, হিন্দুধর্ম্মের আদর আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল।" তাঁহার সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও শিবাজী ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অদ্ভুত কল্পনা প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছেন। ঐ তিনখানি নাট্যকাব্যে ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও কবিত্বের সহিত ঐতিহাসিক সত্যের যেরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন, সেরূপ আর অন্য কোন পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিভা-পরিচায়ক নাট্য-কাব্যগুলি বাক্‌বিন্যাসের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং কল্পনা-উদ্ভাবকতার উচ্চতম আদর্শ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের আর একটা বিশেষত্ব এই যে,—ধর্ম্ম তাঁহার নাটকের ভিত্তি। তিনি আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার নাটকে ধর্ম্মের অবতারণা করিয়া তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য সকলই চিত্রিত করিয়া "বিমুগ্ধকর চিত্রের দ্বারা পাঠকের মন মুগ্ধ করিয়া দেন। মুগ্ধ করিয়া আবার সেই চিত্রকে ভীষণান্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া পাঠকের মন আকুলিত করিয়া তুলেন। ধর্ম্ম বুঝি নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, এই আশঙ্কায় পাঠকের মন যখন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে, বিলোড়িত হইতে থাকে, তখন আবার দেখা যায় যে দক্ষ নাট্যকারের তুলিকা সম্পাতে ধর্ম্মজ্যোতিঃ আবার ক্রমশঃ অন্ধকার অবহেলা করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।" বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর নাটকত্ব অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়।

তাঁহার নাটকে আর একটি বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা—সঙ্গীত রচনা। সঙ্গীত রচনায়—রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই তিন জনেরই শক্তি কতক পরিমাণে তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই শুভমুহূর্ত্তে গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক আরও জনকয়েক মনিষী নাট্য-সাহিত্যে দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অমৃতলাল অন্যতম। ইনি গিরিশচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য বটে, কিন্তু ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া তিনি আত্মশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আর সেই জন্যই কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন। কারণ গুরু শিক্ষনীয় ও অধ্যনীয় বটে কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাকে অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অনবরত পরের শক্তি ঋণ করিয়া চলিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। অমৃতলাল প্রহসন লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়া চাবুকে চাবুকে দেশের ভণ্ডদের অস্থিচর্ম্ম সার করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহার সকল প্রহসন গুলিতেই যে শক্তির সদ্ব্যবহার হইয়াছে,এমন কথা বলি না। তবে

একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব, যে তাঁহার 'তরুবালা' 'বিবাহ-বিভ্রাট' 'তাজ্জব ব্যাপার' 'বাবু,' 'কালাপানি,' 'অবতার' প্রভৃতি প্রহসনগুলি পরিহাস শক্তির যত পরিচয় দিয়াছে, এমন আর কোন বাঙ্গালা পুস্তক দেয় নাই। আর তাঁহার প্রহসনগুলি আমাদের শুধু হাসাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে চরিত্র উন্নীত করিয়াছে। তাঁহার কষাঘাত যে শুধু যন্ত্রণাদায়ক—তাহা নহে; পরিশোধকও বটে। প্রহসন ক্ষেত্রে—তাঁহার একাধিপত্য!

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও নাট্যকাররূপে একবার সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে 'রাজা ও রাণী' খানিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কথার দ্বারাই তাঁহার এই পুস্তক সমালোচনা করিব। "নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই।" কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। *

ক্রমশঃ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ইরাণ-রমণী।

(৫)

সেবার পশ্চিমে গিয়া উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষার ঝঙ্কার শুনিয়া এবং উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই উর্দ্দুর প্রচলন দেখিয়া মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে অন্ততঃ উর্দ্দু ভাষাটা শিক্ষা করিব। এত বড় একটা আবশ্যকীয় ভাষা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষেই শিক্ষা করা উচিত। সুতরাং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার ছয় মাস পরেই একটি বাঙ্গালী মুসলমান বন্ধুর নিকট "আলেফ-বে ফার্সী" নামক উর্দ্দু প্রথম ভাগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম।

তাহার পর বি-এল পরীক্ষার গোলমালে একবার উর্দ্দু পড়া বন্ধ রাখিতে হইলেও পরীক্ষার পর দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত উর্দ্দু পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার এক আত্মীয় পাটনায় ওকালতি করিতেন। আমি পাস

* চতুর্থ বর্ষের ৯ম সংখ্যক 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় 'রাজা ও রাণীর' যে নাটকত্ব সমালোচনা হইয়াছে, তাহা পড়িলেই উক্ত কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

হইয়া যখন আলিপুরের শান্তিপ্রদ শিক্ষানবিশ উকীলসখা মহীরুহ-রাজির আশ্রয় গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিতেছিলাম তখন আমাদের আত্মীয় গিরীশ বাবু হঠাৎ বাবাকে পত্রে লিখিলেন—"যদি ব্রজেন ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে এখানে আমার নিকট আসিতে পারে। এখানে আমরা সাহায্য করিলে প্রথমাবস্থা হইতে কিছু হইতে পারে। তবে উর্দ্দু জানা বিশেষ আবশ্যক। যদি আসিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সে যেন উর্দ্দু শিখিবার চেষ্টা করে।"

গিরিশ বাবুর পত্র পাইয়া আমি তো স্বর্গ হাতে পাইলাম। পশ্চিমের উপর আমার বরাবর ঝোঁক ছিল। বিশেষ তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেই স্ত্রীর সহিত পত্রে মনোমালিন্য হওয়ায় কয় দিন ধরিয়াই নির্ব্বাসিতের মত আত্মজন বিস্মৃত হইয়া সুদূর প্রবাসে নিভৃতবাস করিবার কল্পিত চিত্র আমার মানসপটে প্রতিফলিত হইতেছিল। সুতরাং পিতাকে বুঝাইয়া বলিলাম পাটনা তো কলিকাতার নিকটেই এমন কি শনিবারে শনিবারে বাটী আসিতে পারিব।

পিতা কিন্তু সহজে কোনও মতামত দিলেন না। শেষে আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন—আমি তিন মাস ছুটি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। তাহার পর যেমন যেমন ঘটে তেমনি হইবে।

আমার নিভৃত প্রবাস বাসের আশা সম্পূর্ণ হইবে না জানিয়াও প্রবাস বাস হইবে ভাবিয়া মনে মনে পিতার স্নেহের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম। ভাবিলাম তিনটে মাস তো দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর একবার প্রবাসে থাকিয়া স্ত্রীর সেই নিষ্ঠুর মূর্ত্তিখানা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিব। পরে গিরীশ বাবুর কথা মত একটি মুন্সী রাখিয়া "ইস্তিখাবে হবীব" নামক পুস্তকে সিংহ, গর্দ্দভ, মণ্ডুক প্রভৃতির অপূর্ব্ব হিকায়াত বা গল্পরাজি পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং কলের চাকার মত প্রতিদিন আদালতে যাতায়াত আরম্ভ করিলাম।

(৬)

এই চারি বৎসরে গিরীশবাবুর সাহচর্য্যে এবং আপনার অধ্যবসায়ে আমার একটু প্র্যাকটিস্ জমিয়াছিল। কমিসন লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং কতক মিষ্ট কথায় কতক পরিশ্রম করিয়া মোক্তার মহলে একটু প্রিয় হইয়াছিলাম। সুতরাং অর্থাগমের পথটা এক প্রকার উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছিল।

প্রথমে যখন বিদেশে আসিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব বিঘ্ন বাধার মধ্যে পড়িয়া সংগ্রাম করিতাম তখন ভাবিতাম আর্থিক অবস্থাটা একটু উন্নত হইলেই হৃদয়ে সুখ

হইবে। কিন্তু এখন আর্থিক অবস্থা উন্নতির সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে প্রশ্ন উঠিত এইরূপ উপার্জ্জন কলিকাতায় হইলে কেমন হইত। আর সেই স্বদেশের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, কলিকাতার অন্তরঙ্গ বন্ধুর 'প্রাত্যহিক পোষ্টকার্ড' পাইবার প্রত্যাশায় ঘন ঘন ঘড়ি দেখা, কলিকাতার লোক দেখিলে হৃদয়ে পুলক অনুভব করা, খবরের কাগজে প্রথমেই কলিকাতার সংবাদ অন্বেষণ করিবার ঔৎসুক্য প্রভৃতির জন্য আমার জীবনসঙ্গিনী সরলাই প্রধানতঃ দায়ী।

আজ যখন কোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহে বসিয়া স্ত্রীর সহিত রহস্যা-লাপ করিতেছিলাম, তখন সরলা বলিল—কিছু দিন ছুটী নিয়ে কেন বাড়ী চল না। কল্‌কাতার খোকার ভাত দিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে।

আমি বলিলাম—তুমি আর মিছে আমার মন খারাপ করে দিও না, সরলা। তোমার জন্যই ত দেশছাড়া হইয়াছি। তোমার জন্যই ত আজ আমি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বিবর্জ্জিত স্থানে নির্ব্বাসিত। তুমি যদি তখন না রাগাতে তা' হ'লে তো আর এদেশে আসিতাম না।

আমার feeling দেখিয়া সরলা খুব হাসিতে লাগিল। তাহাতে তাহার স্বাভাবিক কান্তি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"এবার যদি ও কথা বল্‌লে হাস সরলা, তা হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা ক'ব না"। সরলা বলিল—"সে চালাকী আর বিদেশে চলে না।"

আমি আপনার চিত্তসংযম দেখাইবার জন্য বাহিরে বারান্দায় গেলাম। নিম্নে পথের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলাম কতকগুলি ইরাণী-জিপ্সি চলিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র হৃদয়ের ভিতর একটা উত্তেজনা অনুভব করিলাম। ছুটিয়া ঘরে গিয়া বলিলাম—"শীঘ্র বাহিরে এস সরলা, একটা নূতন জিনিস দেখিবে।" বিস্মিত সরলা আমার বাহুধারণ করিয়া বলিল—"কি নূতন জিনিস?"

আমি বলিলাম—তোমাকে দিল্লির ইরাণী-জিপ্সির গল্প ব'লেছিলাম। তুমি ইরাণী দেখিতে চাহিয়াছিলে। কতকগুলা আমাদের বাড়ীর সামনে যাচ্ছে, শীঘ্র এস।

সরলা আগ্রহের সহিত বাহিরে আসিল। তখন ইরাণীগুলা আমাদের সম্মুখ হইতে অনেকটা তফাতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সরলা তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না।

সরলা বলিল—তুমি যে ব'লেছিলে সেই 'সেলিনা' বড় সুন্দরী, কই এদের দেখে তো তা' মনে হয় না।

আমি বলিলাম—তুমি ওদের ভালো করে দেখতে পেলে না তাই বল্‌ছ। ওদের মধ্যে এক এক জন খুব সুন্দরী।

সরলা হাসিয়া বলিল—যখন তুমি তাকে সুন্দরী মনে করেছিলে তখন তুমি আইবড় ছিলে মাত্র।

আমি সরলার চিবুক ধরিয়া বলিলাম—"এত রূপের গরব কেন?" সরলা অপ্রতিভ হইয়া আমার হাত ছাড়াইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

(৭)

উক্ত ঘটনার দুই দিন পরে সন্ধ্যার সময় সেরেস্তায় বসিয়া কাগজ পত্র উল্টাইতেছি এমন সময় বেশ সুন্দরকান্তি একটী মুসলমান যুবক আসিয়া সেলাম করিয়া "আদাব" বলিল। যুবককে দেখিয়া পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু তাহাকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছি স্থির করিতে পারিলাম না।

ভদ্রলোকটি বলিল—কেয়া উকিল সাহেব পহচান্‌তেহেঁ নেঁহি?

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—মাফ কিজিয়ে ইয়াদ নেহি হোতা কাঁহা আপসে মোলাকাত হুয়ী থি।

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন—আব্দুল মজিদকো ভুল গয়েঁ।

আমার স্মৃতির কবাট খুলিয়া গেল। তাই ত, এতো আমাদের সেই পরিচিত রোমাণ্টিক আব্দুল মজিদ। বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল, একেবারে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া বেচারাকে বিব্রত করিয়া তুলিলাম।

মজিদ বলিল—এতগুলি প্রশ্নের একেবারে উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিছু গোপনীয় কথা আছে।

আমি আমার মুহুরীর দিকে চাহিলাম, সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মজিদ বলিল—আপনাকে পাটনায় প্রথম দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম—তবে পরিচয় দেন নাই কেন?

সে বলিল—কোন্ লজ্জায় দিব। সবইতো জানেন।

আমি বলিলাম—লজ্জার কথা কি? ভালবাসার কি লজ্জা আছে মজিদ সাহেব?

মজিদ হাসিল। তাহার পর আমার অনুরোধে দিল্লী ত্যাগের পর হইতে তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিল। সে বলিল—সত্যকথা বলিতে কি

ব্রজেনবাবু প্রথম যখন সেলিনার সহিত দিল্লী কুইনস্পার্কে বসিয়া রহস্য করিতে-ছিলাম তখনই কেমন তাহার সেই অমার্জ্জিত রূপরাশি ও তাহার সরলতা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সেলিনাও স্বীকার করিয়াছে আমাকেও সে সেই সময় অকস্মাৎ ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর যে দুই দিন দিল্লীতে রহিলাম, গোপনে সমস্ত স্থির করিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলাম।

আমি তাহাকে আমাদের নিগ্রহের কথাটা বলিলাম। বেচারা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তাহা হইলে যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইয়াছিল। তাই আপনাদিগকে সেই রাত্রেই দিল্লী ত্যাগ করিবার জন্য অত বেশী জোর করিয়া-ছিলাম। আর জহরৎ সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জহরৎ সমস্তই সেলিনার। আর জগদীশ্বরের দিবা (খোদা কসম্) তাহার একটিও আমি এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নাই।"

আমি বলিলাম—হ্যাঁ আমি তাহাই ভাবিয়াছিলাম।

সে বলিল—তাহার পর কানপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরে কিছু কিছু দিন থাকিয়া শেষে পাটনায় আসিয়া বাস করিতেছি। কানপুরেই আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

আমি বলিলাম—আপনার আত্মীয়েরা কিছু জানেন না?

সে বলিল—আত্মীয়ের মধ্যে আমার জননী ও খুল্লতাত। মাতা আমারই সঙ্গে আছেন। খুল্লতাত স্বর্গে গিয়াছেন। এখানে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে-ছিলাম। বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ হইতে এক বড় বিপদে পড়িয়াছি।

আমি প্রশ্ন করিলাম—"কিসের বিপদ?" কতকগুলা মক্কেল আসিয়া পার্শ্বের গৃহে বসিয়াছিল। মজিদ তাহা দেখিয়া বলিল—প্রথমে উহাদিগকে বিদায় করুন, আমি অপেক্ষা করিতেছি।

তাহার যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আমি মক্কেলদিগের কার্য্য সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া মজিদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

(৮)

মজিদ একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া বলিল—গত রবিবার সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকিয়া অকস্মাৎ এই কাগজখানি পাইলাম।

ফার্সিতে আমার কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও সে লেখা পড়িতে পারিলাম

না। সুতরাং আলোর দিকে সরিয়া আসিয়া মজিদ পড়িল—"লাইন, বদ্‌বখ্‌ত্‌, নেগরান্‌বাস। কেমাবয়নে দহ্‌ রুজ বেগববে গুণাহে খুদ্‌ ওয়াসেলে জাহান্নম খাহি শুদ্‌।"

"শাপগ্রস্ত হতভাগ্য সাবধান। আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে তোমার পাপের ফল স্বরূপ জাহান্নমে যাইতে হইবে।"

"বলিতে কি ব্রজেনবাবু এখানে তো আমার কোনও শত্রু নাই। ভৃত্যেরা কেহ কিছু বলিতে পারে না। আমার সন্দেহ হয় সেলিনার জিপ্সিগণ—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—বোধ হয় কেন? আমি স্বচক্ষে কতকগুলা জিপ্সিকে পরশুদিন পথে দেখিয়াছি। তবে তাহারা আপনার বিবির আত্মীয় কিনা চিনিতে পারি নাই।

মজিদের মুখখানি একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে বলিল—জানেন না ইহারা কিরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ। আমি সেলিনার নিকট ইহাদের প্রতিহিংসার অনেক সংবাদ পাইয়াছি।

বলা বাহুল্য, উর্দ্দু এবং ফার্সি পড়িলেও এবং পশ্চিমে বাস করিলেও আমি ষোল আনা বাঙ্গালী ছিলাম। সুতরাং ইরাণীদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার উল্লেখে আমারও প্রাণটা গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কে বলিতে পারে বর্ব্বরগুলা আমাকে চিনিতে না পারিবে এবং মজিদকে ও আমাকে একস্থলে দেখিতে পাইয়া আমাকেও বিপন্ন করিতে চেষ্টা না করিবে। কিন্তু মুখে ব্যবহারোপজীবি সুলভ সাহস দেখাইয়া বলিলাম—ভয় কি আপনার। এ ইংরাজের রাজত্ব ও সব জঙ্গলি উপায় এদেশে চলিবে না।

মজিদ বলিল—আর তো দুই দিন মাত্র আছে কি উপায় করিব বলুন দেখি।

আমি বলিলাম—পুলিসে খবর দিন। জিপ্সিদের উপর তো পুলিসের নিক নজর আছেই। তাহার উপর এ সংবাদ পাইলে একেবারে তাহাদের গঙ্গাপারে রাখিয়া আসিবে।

চিন্তিত মজিদ বলিল—তাহা হইলেই তো একটা জানাজানি হইবে। প্রথমতঃ সেলিনাকে এ বিষয়ে কোনও কথাই বলিতে চাহিনা। তাহার পর এখানে আমারও কতকটা ইজ্জত হইয়াছে। সাধারণকে জানাইতে চাহিনা যে এই জিপ্সিগুলার সহিত আমার কোনও একটা সম্পর্ক আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বিবিকে এ বিষয় জানাইতে দোষ কি। তাঁহার আত্মীয়দিগকে তিনি যেমন বুঝিবেন এমন তো কেহ বুঝিবে না।

বলা বাহুল্য, এখন সেলিনা পরদানিশিন জেনানা সুতরাং তাহার বিষয় সশ্রদ্ধ হইয়া কথা কহিতে হইতেছিল। মজিদ বলিল—"কি জানেন ব্রজেনবাবু সেলিনা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে সত্য। কিন্তু কথায় বলে রক্ত জলের অপেক্ষা গাঢ়। জানেনই তো বনের পাখী ধরিয়া পরদানিশীন করিয়াছি।

যুক্তিটা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। তবু তাহাকে বলিলাম—কেন বিবিজি কি তাদের কথা কিছু বলেন নাকি ?

মজিদ বলিল—হাঁ। কতবার বলিয়াছে এই সুখের দিনে যদি আমার আম্মার সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ হইলে তাহার মাতা যে কি পরামর্শ দিবে তাহাতো বলিতে পারি না।

দুই জনে অনেকক্ষণ বাদানুবাদেও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। পরদিন বৈকালে আবার তাহার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

এসকল কথা সরলাকে কিছু বলিলাম না।

(৯)

সরলা বলিল—সেই হাবুড়ের দলের একটা মাগি আজ আমাদের বাড়ী এসেছিল, বুধুয়া তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম—কখন এসেছিল ?

স্ত্রী বলিল—দুপুরবেলা আমি বারাণ্ডায় গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক আর একটি পুরুষ আমাদের বাড়ীর চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। আমায় দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, মাজি ফিরোজাহ লিজিয়ে গা ? আমি বলিলাম, —ভিতর আও। কিন্তু বুধুয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল ও আমাকে বলিল, অমন লোক গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

মনে মনে ভৃত্যের প্রশংসা করিলাম। কিন্তু একটা অজানা ভীতি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিল। এ আবার এক নূতন বিপদ আসিল দেখিয়া প্রাণটা বড়ই নিরুৎসাহ হইল। নানা প্রকার কুচিন্তা আসিয়া বিব্রত করিতে লাগিল।

তাহার পর নীচে নামিয়া সেরেস্তা গৃহের জানালার নিকট যখন একটুকরা কাগজ পাইলাম তখন তো আশঙ্কায় অধীর হইলাম। অনেক কষ্টে লিপিটি পাঠ করিলাম, তাহাতে উর্দ্দুতে লিখিত ছিল—"কাফের শয়তান ইরানিয়োঁকো ইন্তেকাম ইয়াদ করো। তবাহ করুঙ্গা আগর নেহি লড়কিকো পাতাহ

বাতাও তো।” অর্থাৎ “কাফের সয়তান ইরাণীদের প্রতিহিংসা স্মরণ করিও। যদি বালিকার ঠিকানা বলিয়া না দাও তাহা হইমে সর্ব্বনাশ করিব।”

আমি কম্পিত হস্তে পত্র পাঠ করিলাম। ভাবিলাম মজিদের যাহাই হউক আমি এ বিষয়ে পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করিব। বিনা দোষে গুপ্ত ঘাতকের করে প্রাণ দিতে পারিব না।

ঠিক এই সময় মজিদ আসিয়া পড়িল। আমার পত্র পাঠ করিয়াই তো তাহার পাংশুবর্ণ বদন একেবারে রক্তহীন হইয়া গেল। লিপি খানি এপিট ওপিট উল্টাইয়া মজিদ বলিল—একই কাগজ, একই লেখা, কি করা কর্ত্তব্য ?

আমি বলিলাম—আপনি যাহাই করুন আমি তো বিষয়টি পুলিসের হস্তে দিব।

মজিদ বলিল—তাহা করিবেন না। যদি শারীরিক অমঙ্গলের কথা হয় তাহা হইলে জানিবেন আমি জীবিত থাকিতে কেহ আপনার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আমি বলিলাম—মজিদ সাহেব ব্যাপারটা বড় ভাল বুঝিতেছি না।

সে বলিল—আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। আমি সেলিনাকে আপনার কথা বলিয়াছি। তাহাকে বুঝাইয়াছি আপনার কি একটা গূঢ় কথা তাহাকে বলিবার আছে। সে বোরকার ভিতর হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছে।

আমার বরাবর ইচ্ছা এ বিষয় সেলিনা বিবির সহিত পরামর্শ করা উচিত। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম তাহাদের প্রতিহিংসার কারণ স্নেহ। সুতরাং তাহাদিগকে সেলিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলে সে বোধ হয় তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে। মজিদকে বলিলাম—আমায় আর কেন ? আপনি স্বয়ং তাঁকে বুঝিয়ে বলুন না।

সে বলিল—আমি তাহাকে ঠিক বুঝাইতে পারিব না। আপনি বুঝাইবেন চলুন। সেলিনা এখন পরিষ্কার হিন্দুস্থানী শিখিয়াছেন।

অনেক বাদানুবাদের পর তাহার কথায় সম্মত হইলাম। পকেটে রিভলভারটি লইয়া কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে মজিদ মিঞার সহিত তাহার ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে কেন যাইতেছিলাম ! কি জানি যদি পশ্চাৎ হইতে হাকহড়করায়া হৃদয়ে ছুরি বসাইয়া দেয় !

(১০)

মজিদ বলিল—সেলিনা আসিতেছে।

আমি বলিলাম—দ্বারের প্রহরীটাতো ঠিক আছে ?

সে বলিল—দুইজনে রহিয়াছি ভয় কি ব্রজেনবাবু ?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গৃহে দুইটি লোক প্রবেশ করিল।

চাহিয়া দেখিলাম—একটি সেই তোতারামের হোটেলের ইরাণী! আর অপরটি ভয়ঙ্করদর্শনা ইরাণ রমণী!

আমি ভয়ে হরি হরি বলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। ঘরের এক কোণে গিয়া রিভলভার হস্তে দাঁড়াইয়া বলিলাম—ভাগো হিঁয়াসে।

তাহাদিগকে দেখিয়া মজিদ তো লাফাইয়া উঠিয়া বলিল - অল্ অজমতু লিল্লাহি।

রমণীটা আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিল—লইন, বেইমান দখতরে মন্ কুজাস্ত ? (পাপী, বিশ্বাসঘাতক আমার কন্যা কোথা ?)

মজিদ বলিল—দখ্তরে সুমা ? (তোমার কন্যা ?)

ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রের মত ইরাণ-রমণী বলিল—সেলিনা কুজাস্ত। (সেলিনা কোথা)

মজিদ হিন্দীতে বলিল—এখান হইতে চলিয়া যাও তাহা না হইলে পুলিস ডাকিব।

রমণীর চক্ষু ভীষণভাবে ঘুরিতেছিল। ধীরভাবে সে আপনার বক্ষস্থল হইতে একখানা ছুরিকা বাহির করিল। আমি রিভলভারটা তুলিলাম। রমণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। কেবল এক চক্ষু ব্যতীত তাহার কোথাও উত্তেজনা দেখিলাম না। সহসা মজিদের দিকে অগ্রসর হইয়া পশুবিক্রমে সে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, আর তাহার দক্ষিণ হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা মজিদের গ্রীবা স্পর্শ করিল।

বলা বাহুল্য, আমার হস্তস্থিত রিভলভারের ঘোড়া টানিবার অবধি শক্তি আমার শরীর হইতে পলাইয়াছিল। ঠিক যেমন ইরাণীর ছুরিকা মজিদের গ্রীবা স্পর্শ করিল অমনি জ্যোৎস্নাবরণী এক দেবীমূর্ত্তি আসিয়া বজ্র মুষ্টিতে রমণীর হস্ত ধারণ করিল। বিস্মিত রমণী পশ্চাতে ফিরিয়া বোধ হয় তাহার রূপের মাধুরিতে অন্ধ হইয়া গেল। কারণ মজিদের কণ্ঠ হইতে তাহার অপর হস্তটিও উঠিয়া গেল।

বিস্মিত রমণী বলিল—সেলিনা!

সুন্দর বীণাবিনিন্দিতস্বরে সেলিনা বলিল—শরম, শরম, মাদর তু দামাদে খুদ্‌রা মিকসী ? (মা ছিঃ ছিঃ আপনার জামাতাকে খুন করিতেছ ?)

তাহার মাতার রুদ্ধ উৎস এইবার বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত হইল। সে বলিল—জামাতা? কিসের জামাতা? যে তস্করের মত আমার হৃদয়ের মণি ছিন্ন করিয়া লইয়া ঐ দুইটা কাফেরের সহিত মিলিয়া, তাহাকে পাপপথে লইয়া গিয়াছে সে আবার জামাতা! বে-ইমানী দুষমণি নির্লজ্জা বালিকা কাহাকে জামাতা বলিতে বলিস। হাত ছাড়, এ দুইটার প্রাণবধ করিয়া তোকে লইয়া আবার বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াই।

সকলে আমার প্রতি চাহিল। পুরুষটা এতাবৎকাল কিছু করে নাই, বুঝিলাম এইবার সে আমায় আক্রমণ করিবে। রিভলভারটা ঠিক করিয়া ধরিলাম। অথচ মনে মনে যাহা হইতেছিল তাহা আর বলিবার নহে।

সেলিনা বলিল—মাতা তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বিবাহের পূর্ব্বে আমি স্বামীকে স্পর্শ করি নাই। আর ঐ বাঙ্গালী বাবুজির সহিত সেই দিল্লীতে সাক্ষাৎ হইবার পর আজ এই দেখা।

দুর্গা! দুর্গা! বিবিজি সত্য কথাটা বলিয়া আমার প্রাণে একটু আশা দিল। সেই গৃহের অস্পষ্ট আলোকে তাহার সেই কমলসদৃশ মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই ৭।৮ বৎসর পরদার ভিতর থাকিয়া যে সেলিনার রূপমাধুরি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া বড় সুখ হইল। সে লাবণ্য নবাবদিগের হারেমের উপযুক্ত।

মজিদ পত্নীর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াও ইরাণী ক্ষান্ত হইল না। কন্যাকে বলিল—ছিঃ সেলিনা নির্লজ্জা, আপনার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর। এ দুইটা শয়তানকে মারিয়া চলো পলাইয়া যাই। তুমি সুলেমানের বংশের কন্যা। মাতার কথা অবহেলা করিওনা।

তাহার সরল মোলায়েম প্রস্তাবে হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। সেলিনা বলিল—মাতা পাগল হইয়াছ? তুমি যদি মাতার মত আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে তাহা হইলে তোমায় পূজা করিতাম। খোদা জানেন কত রাত্রি কত দিন তোমার স্নেহ পাইবার জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে। ছিঃ মা! বর্ব্বরতা ভুলিয়া যাও, জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর।

আহাহা! কি স্বর্গীয় ভাষা! কি উন্নত মন! ইচ্ছা হইতেছিল সে ভাষা চিরকাল শ্রবণ করি। এরকম স্বামীভক্তি তো দেখি নাই।

তাহার মাতা বলিল—শয়তানি পাগল হইয়াছিস! বিদ্রূপ করিতেছিস্। এ দুইটার সহিত তোকেও হত্যা করিব।

নিমেষমধ্যে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমণী তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে মজিদের দিকে ধাবমান হইল। সেলিনাও ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর সেই পুরুষটাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মজিদের দ্বারবান তাহাকে ভূমিশায়ী করিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বাঁধিলাম।

সেলিনা বলিল—মাতা স্মরণ রাখিও আমিও ইরাণী। আমার সম্মুখে আমার স্বামীর গাত্র স্পর্শ করিবে তোমার এখন কি ক্ষমতা ?

মাতা পুত্রীতে অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটার হৃদয়ে যেমন প্রতিহিংসাগ্নি জ্বলিতেছিল, সেলিনার প্রাণও তেমনি ভালবাসার শান্তি-ময় ভাবে পূর্ণ ছিল, সুতরাং দেবীতে ও পিশাচীতে মিলন হইল না।

সেলিনা তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং আমরাও তাহার আদেশমত পুরুষটাকে বন্ধনমুক্ত করিলাম। সেলিনা বলিল—মাতা এখনও বলিতেছি কন্যার গৃহে বাস কর। চিরদিন তোমাকে পূজা করিব। কিন্তু যাহাকে পতীত্বে গ্রহণ করিয়াছি তাহার নামে যদি একটা কথা বল তাহা হইলে তোমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না।

রমণী বলিল—শয়তান তোর গৃহে বাস করুক। এস্থল জাহান্নম সদৃশ জ্ঞান করি। এত কষ্ট করিয়া অন্বেষণ করিয়া আজ তোর নিকট যে পুরস্কার পাইলাম তজ্জন্য তোর গৃহ শ্মশান হউক।

রমণী ও পুরুষটা নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * * *

তাহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইরাণীর অভিসম্পাতে মজিদের গৃহ জাহান্নম না হইয়া স্বর্গসদৃশ হইয়াছে। আর সেলিনার নিকট গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ অবধি ফার্সি পড়িয়াই সরলা তো অশুদ্ধ. অর্দ্ধশুদ্ধ ফার্সি কথা বলিয়া আমার কাণ ঝালাপালা করিয়া দেয়। সেলিনাকে সেই অবধি আর দেখি নাই। কিন্তু সরলা ও মজিদ বলে যে সে বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা বলিতে পারে। আমার বোধ হয় তাহা তাহার নিজের গুণ প্রকাশক ইহাতে তাহার শিক্ষয়িত্রী সরলার কিছু বাহাদুরী নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

রাণা প্রতাপ।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

প্রতাপ। আমার অস্ত্রে বরাহ বধ হয়েছে। সেই বরাহের প্রতি তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ করে মৃগয়ার নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করেছ।

শক্ত। মহারাণার আতপতাপে পরিভ্রমণ করে ভ্রম হয়েছে, আমার অব্যর্থ লক্ষ্যে বরাহ বধ হয়েছে। মহারাণা মৃত বরাহের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। যদি মৃগয়ার নিয়ম ভঙ্গ হয়ে থাকে, সে আমা কর্ত্তৃক হয় নাই।

প্রতাপ। তুমি বার বার আমার সহিত বিতণ্ডা করছ, ভ্রাতৃস্নেহে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করেছি।

শক্ত। মহারাণা বোধ হয় কখনো মার্জ্জনা প্রার্থী দেখেন নাই, সত্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, ভ্রম সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ তর্ক করেছি, এখনো তর্কে প্রস্তুত, মার্জ্জনাকাঙ্ক্ষী নই।

প্রতাপ। বোধ হয় আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় তুমি পাও নাই, সেই নিমিত্ত তোমার এই দম্ভসূচক বাক্য।

শক্ত। দাসের লক্ষ্যের পরিচয়ও মহারাণা পান নাই, তাহ'লে বোধ হয় স্বীকার করতেন, যে তাঁ'র ভ্রাতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বোধ হয় মহারাণার ধারণা জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয়। অনেক স্থলেই তা অপ্রমাণ হ'তে দেখা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহারাণা যদি ইচ্ছা করেন, পেতে পারেন।

প্রতাপ। বুঝ্‌লেম তুমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রয়াসী। তোমার বাসনা পূর্ণ কর্‌তে আমি প্রস্তুত।

শক্ত। কৃপায় মহারাণা দাসের অভিপ্রায় গ্রহণ করেছেন। তজ্জন্য আমি মহারাণার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক বাধা জ্যেষ্ঠ রাণাপদে অভিষিক্ত— রাণার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা রাজপুত নিয়ম বিরুদ্ধ।

প্রতাপ। তোমার আমায় রাণা জ্ঞান করবার প্রয়োজন নাই। অস্ত্রধারী রাজপুত তোমার সম্মুখে বিবেচনা করো।

শক্ত। যে আজ্ঞা, কনিষ্ঠকে পদধূলি দানে উৎসাহ প্রদান করুন।

প্রতাপ। বিজয় লাভ করো।

শক্ত। আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য ; দাস প্রস্তুত,—

(উভয়ের যুদ্ধোন্মুখ)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি সর্ব্বনাশ করেন—কি সর্ব্বনাশ করেন! ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন।

শক্ত। ব্রাহ্মণ, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়দ্বয়ের মধ্যস্থান পরিত্যাগ করো।

পুরো। রাণাকুল পুরোহিত পদস্থ ব্রাহ্মণ—
হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের ধরহ বচন,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর সম্বরণ।
জন্মভূমি স্বাধীনতা রাজপুতের আশা
অর্পিত তোমার করে!
হে রাণা কুমার
কহ একি ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সময়?
মহাশত্রু তুর্কী সুসজ্জিত—
উচ্চবংশ রাজস্থান শত্রু পদানত—
স্বাধীনতা ধ্বজা মাত্র মিবারে উড্ডীন,
সূর্য্যাঙ্কিত পতাকার তলে, দুই ভ্রাতা মিলে,
শত্রু সংহারের কোথা হবে আয়োজন,
একি ভ্রাতাদ্বয়ে দ্বন্দ্ব-রণ!
ক্ষান্ত হোন মহারাণা!
রাজ-ভ্রাতা! রাখ অসি শত্রু বক্ষ হেতু।
কুল পুরোহিত আমি, হিতবাণী করহ শ্রবণ।

শক্ত। দূরে কর অবস্থান অর্ব্বাচীন দ্বিজ!

পুরো। ক্ষান্ত হও রাজভ্রাতা।

প্রতাপ। সমরে আহুত ক্ষত্র
দ্বিজোত্তম, বৃথা আকিঞ্চণ
রক্তের একের না তিতিলে মেদিনী
অসি নাহি পশিবে পিধানে।

পুরো। হোক তবে রণ-অবসান,
হের বক্ষঃরক্তে তিতে বসুমতী। (বক্ষে অস্ত্রাঘাত)।

উভয়ে। একি একি ব্রহ্মহত্যা হলো!

পুরো। হিত সাধে পুরোহিত হে ক্ষত্রিয়দ্বয়,
শান্তি দান করো এই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণে
নিজ নিজ অস্ত্র দোঁহে রাখিয়া পিধানে। (মৃত্যু)

প্রতাপ। রাজ্য মম কর পরিত্যাগ,
ব্রহ্মহত্যা তোমার কারণ!

শক্ত। ত্যজি রাজ্য রাজ্যেশ্বর অগ্রজ আদেশে,
কিন্তু প্রতিহিংসা-তৃষা অতৃপ্ত রহিল,
তৃষা শান্তি অবশ্য হইবে।

[প্রস্থান]

প্রতাপ। হউক সৎকারের আয়োজন।
হউক স্মারক-স্তম্ভ নির্ম্মিত এস্থলে
পুরোহিত হিতগাথা করিতে প্রচার।
রাজবংশ দ্বিজবংশ যতদিন রবে,
দ্বিজোত্তম বংশধর রাজ-বৃত্তি পাবে।

[প্রতাপসিংহের প্রস্থান।

(শনি গুরু ও কৃষ্ণসিংহের প্রবেশ)

শনি। আজ আহেরিয়ার ফল অশুভ।

কৃষ্ণ। শুভাশুভ বিচারের ভার আমাদের উপর স্থাপিত নয়, রাজ-অনুসরণ আমাদের কার্য্য। আমরা কখন কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হবো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদয়সাগর।

কৃষ্ণসিংহ। অনুমান হয় মহারাণা,
নিশ্চয় এ গৃহভেদী তুর্কীর মন্ত্রণা
নহে রাজা মান, আগুয়ান কি হেতু মিবারে?
স্বেচ্ছায় কিহেতু তা'র আতিথ্য স্বীকার?
রাণা-শত্রু আক্‌বরের অনুগত তিনি

স্বইচ্ছায় মান দান করিতে রাণায়
আগমন সম্ভব না হয় অনুমান।

প্রতাপ। যে হয় অতিথি-সেবা কর্ত্তব্য নিশ্চয়
আগুবাড়ি আসিয়াছি উদয়সাগরে
কিন্তু এক মহা বিঘ্ন হেরি ; করি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
তাঁর সনে একত্রে ভোজন,—
আমা হতে না হইবে।
অভ্যর্থনা করিবেন কুমার তাঁহার।

অমর। শুনি দামামা-নিনাদ—
বুঝিবা আগত রাজা মান।

প্রতাপ। আগুবাড়ি অভ্যর্থনা করো গিয়া তাঁর
জানায়ো তাঁহায়—
শয্যাগত শিরঃপীড়া হেতু
নারিলাম অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার।
শিষ্টাচার উচিত কি কহ বীরভাগ ?

কৃষ্ণ। রাণা হ'তে বিচক্ষণ কেবা ?

প্রতাপ। যাও করো গিয়ে অভ্যর্থনা।

[অমরসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। ভাবি মন্ত্রীবর, একি কপট আচার ?
না—না—শিষ্টাচার প্রয়োজন।
বুঝিবেন রাজা মান—মর্ম্ম কিবা মম ;
সত্য মিথ্যা মর্ম্ম-অনুসারে,
মর্ম্ম মম হইবে প্রকাশ
"প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" নীতিযুক্ত কহে সুধীগণে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাণা, সমাগত রাজা মান।
কন রাজা, ক্ষুধায় কাতর তিনি,
ভোজ্যবস্তু আয়োজন করিতে সত্বর।

প্রতাপ। মর্ম্ম তার বুঝিলে কি অমাত্য সকলে ?

কৃষ্ণ। অভিলাষ রাণা সনে একত্র ভোজন।

প্রতাপ। বিষম সঙ্কট—রাজা মান অতিথি এ পুরে।
কিন্তু ধর্ম্ম সবার উপর—
নির্ম্মল শিশোদীয়কুলে কলঙ্ক অর্পণ
উচিত নহে তো কদাচন—
মুসলমান সংস্পর্শে পতিত যে জন,
তার সনে একত্র ভোজন,
অন্তরে আমার—
নিবারণ করিছেন কুলদেবগণে।
দেখ গিয়ে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হয় বা না হয়।

[মন্ত্রীগণের প্রস্থান।

আত্মা হতে উৎপত্তি আত্মজ—
অতিথি সৎকারে ত্রুটি হয় নাই কভু—
আত্মজ আমার উপস্থিত।

[প্রস্থান।

ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

সম্রাট হুমায়ুন।

কনৌজের যুদ্ধেও বাদসাহ হুমায়ুনসাহকে অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় একজন আফগান যোদ্ধা আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার তুরঙ্গমকে এক বরসার আঘাত করিল। অশ্ব তাহাতে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে আপন মনে ছুটিতে আরম্ভ করিল। অনেক যত্নে যখন সম্রাট তাহাকে ফিরাইলেন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে। কতকগুলি পাঠান সেনা মোগলদিগের খাদ্যপূর্ণ শকটাদি লুণ্ঠন করিতেছে দেখিয়া হুমায়ুন তাহা-দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যেমনি অশ্বের মুখ ফিরাইলেন অমনি এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার অশ্ববল্গা ধরিয়া বাদসাহকে নদী তীরে লইয়া আসিলেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি একটি হস্তী দেখিতে পাইলেন। মাহুৎকে ডাকিয়া হুমায়ুন বলিলেন—"আমায় পার করিয়া দাও।" হস্তীচালক বলিল—"এত স্রোতে হস্তী পার হইতে পারিবে না।" সম্রাট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া একটি খোজাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত আপনার প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। খোজা বলিল—"জাঁহাপনা, এ হস্তীচালকের উপর আমার সন্দেহ হয়। এ বোধ হয় আপনাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিবে। ইহার শিরশ্ছেদ করুন, আমি হস্তী চালাইয়া আপনাকে পর পারে লইয়া যাইতেছি।" আপনার জীবন রক্ষা করিবার জন্য পরাক্রান্ত দিল্লীর সম্রাট একটা খোজার পরামর্শানুসারে হতভাগ্য মাহুৎকে আহত করিলেন। তখন কাফুর খোজা হস্তী চালাইয়া সম্রাটকে পরপারে লইয়া গেলেন। পরপারে পৌঁছিয়া কিন্তু উচ্চ পাড় বাহিয়া সম্রাট উঠিতে পারিলেন না। তখন কতক গুলি তুগ বানান বা ধ্বজাবাহী তাঁহাকে সেই অবস্থায় নদী সৈকতে দেখিতে পাইল, তাহারা আপনাদের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তাহার এক প্রান্ত হুমায়ুনের দিকে নিক্ষেপ করিল এবং বাদসাহ সেই পাগড়ী ধরিয়া তীরে উঠিলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে একটি অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিল, এবং হুমায়ুন সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আগ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

—তাজকিরাতুল ওয়াকিয়ৎ *।

ইহার পর কিপচকের যুদ্ধে সম্রাটের যে দশা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা জৌহরের আবেগময়ী ভাষায় পাঠ করিলে পাঠকের চক্ষে জল আইসে। ইলিয়ট সাহেব এই অংশটি ইংরাজিতে অনুদিত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার নিজের কথায় এ কাহিনীটি পাঠককে উপহার দিব।

"শত্রুদলের এক দুর্ব্বৃত্ত বাদসাহের নিকট আসিয়া তাঁহার মস্তকে একবার তরবারির আঘাত করিয়া, দ্বিতীয় বার যখন আঘাত করিতে উদ্যত হইল তখন জাঁহাপনা তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"হতভাগ্য, এত সাহস?" সে আর মারিতে পারিল না। তখন জনকতক সেনানায়ক আসিয়া সম্রাটকে সমর প্রাঙ্গণের বাহিরে লইয়া গেলেন। আঘাতটি কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। রক্তহানিতে তিনি ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার জোব্বাটি

---

* এই ইতিবৃত্তের বিশেষ পরিচয় নব্যভারত ৫ম বর্ষে দিয়াছি।—লেখক।

খুলিয়া সম্রাট একটা হাব্‌সি ভৃত্যকে রাখিতে দিলেন। নিজের প্রাণ লইয়া ভৃত্যটা পলাইবার সময় সে জোব্বাটা ফেলিয়া দিয়া গেল এবং সাহজাদা কামরাণের কতকগুলি অনুচর সেটি কুড়াইয়া লইয়া সাহজাদার নিকট লইয়া গেল। কামরাণ ঘোষিত করিলেন সম্রাট ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন।

এই সময় সাহানসাহের সহিত ভৃত্য এবং এই ইতিবৃত্ত লেখককে লইয়া একাদশটি অনুচর ছিল। সুতরাং আমরা তাঁহাকে রণস্থলের বাহিরে লইয়া গেলাম, তাঁহার নিজের অশ্ব অশান্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র অশ্বে আরোহণ করাইলাম এবং দুইজন সেনানায়ক দুইদিক হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা তাঁহার সান্ত্বনার জন্য পূর্ব্বে যে সকল ভূপতি ঐরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের গল্প বলিতে বলিতে চলিলেন এবং পাছে শত্রুরা আমাদিগকে আক্রমণ করে তজ্জন্য তাঁহাকে শক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং শিরতুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। * * * * পথে শীতের জন্য একটি মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত জোব্বা তাঁহাকে পরিধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রাতঃকালে আমরা গিরিবর্ত্মের ঊর্দ্ধে পৌঁছিলাম। তখন বেশ উষ্ণতা অনুভব করিতে পারা গেল। সুতরাং সম্রাট অশ্ব হইতে নদীতীরে অবতরণ করিয়া স্নানাদি সমাপন করিলেন এবং ক্ষতস্থান ধৌত করিলেন। উপাসনা করিবার জন্য কোনও গালিচা পাওয়া গেলনা দেখিয়া সম্রাটের দীন ভৃত্য (জৌহর লেখক) একখানি রক্তবর্ণ টুলের আবরণ আনিয়া পাতিয়া দিল এবং সম্রাট তাহার উপর নতজানু হইয়া কিবলার দিকে মুখ করিয়া উপাসনা সমাপন করিলেন। * * *

"বাদসাহ্ পুনরায় অশ্বারোহণে পর্ব্বণ অবধি আসিয়া অবতরণ করিলেন। এস্থানে একজনের ব্যবহারোপযোগী একটি সামিয়ানা ব্যতীত অপর তাম্বু সংগ্রহ করা গেল না; সুতরাং তাহারই নিম্নে শয়ন করিয়া ভূপতি নিদ্রা গেলেন। এই গ্রন্থকর্ত্তা প্রভাতে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া বলিলেন, প্রভাত-প্রার্থনার সময় হইয়াছে। তিনি বলিলেন—'বৎস, আমি এরূপ ভাবে আহত হইয়াছি যে শীতল জলে আপনাকে (ধৌত করিয়া) পবিত্র করিতে পারিব না।" আমি নিবেদন করিলাম যে তাঁহার জন্য কতকটা উষ্ণ পানি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সম্রাট উঠিয়া স্নানাদি করিয়া নমাজ পড়িলেন। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া সামান্য দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই বলিলেন, তাঁহার বস্ত্রস্থিত শুষ্ক রক্ত তাঁহাকে যন্ত্রণা

দিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার ভৃত্যেরা কি কেহ তাঁহাকে একটি জামা ধার দিতে পারিবে। বাহাদুর খাঁ বলিল—"আমার একটি জামা আছে। জাঁহাপনা পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিয়া উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি এ জামা ব্যবহার করিয়াছি।" বাদসাহ বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি নাই, লইয়া আইস।" তিনি তখন সেই জামা পরিধান করিলেন এবং তাঁহার সেই শোণিত কলঙ্কিত পরিচ্ছদটি তাঁহার অনুগত ভৃত্য আফ্‌তাবজি জৌহরকে দান করিয়া বলিলেন—পোষাকটিকে যত্ন করিও এবং কেবল পবিত্র দিবসে ইহাকে পরিধান করিও।

"পর্ব্বণ হইতে আমরা কহরুদে যাত্রা করিলাম। এখানে তাহের মহম্মদ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিল। সে বাদসাহের জন্য একটা পুরাতন তাম্বু খাটাইয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার জন্য আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু নির্ব্বোধ কোনও নজরাদি এমন কি একটা পোষাকও লইয়া আসে নাই। জাঁহাপনা তাঁহার অনুচরবর্গকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং একটি ফোয়ারার ধারে গেলেন। তাহারা তাঁহার জন্য ধুম এবং ধূলিসিক্ত একটা তাম্বু খাটাইয়া ছিল। অপর তাম্বু না থাকায় অনুগত ভৃত্য দুইটা তক্তা আনিয়া পায়খানা করিয়া দিল। এই সময় একটি বৃদ্ধা আসিয়া বাদসাহকে একটি রেশমী পাজামা উপহার দিল। তিনি বলিলেন—"যদিও এটি পুরুষের পরিধানোপযোগী নহে তথাপি আমার নিজের পাজামা রক্তসিক্ত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহা পরিধান করিব।" তাহার পর স্ত্রীলোকটীর কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তথাকার ফৌজদারের উপর পরওয়ানা দিলেন যেন সে ভবিষ্যতে তাহার নিকট কর গ্রহণ না করে।"

আফতাবজি জৌহর বর্ণিত কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে স্বয়ং দিল্লী সম্রাট ধৈর্য্য ধরিয়া যে যাতনা যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা কোনও সামান্য দীন প্রজা এরূপ ধীর ভাবে ভোগ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কাহাকেও বলি নাই। আমি পূর্ব্বে যে এ কথা প্রকাশ করি নাই, তাহার কারণ আমার ন্যায় শিক্ষিত লোকে যদি একটা কুসংস্কারে, একটা আষিমার গল্পে বিশ্বাস করে, তবে লোকে বলিবে কি? বিশেষতঃ এ কথা যত প্রকাশ হইবে, ততই নন্দনপুরের গড়ে আর কেহ বাস করিতে পারিবে না। ইহাতে সে প্রদেশের বিশেষ অনিষ্ট। এই সকল ভাবিয়া আমি এ পর্য্যন্ত এ কথা কাহাকেও বলি নাই। তবে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; আপনার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি, সুতরাং আপনার কাছে কোন কথাই গোপন করিব না, সমস্ত কথাই বলিতেছি;—

"এই প্রদেশটায় লোকজনের বসতি খুব কম, দূরে দূরে গ্রাম, মধ্যে কেবলই মাঠ। নন্দনপুরের চারিদিকেই যে কঙ্করাকীর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর আছে, তাহাতে কাহারই বসতি নাই; দুই-তিন ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম নাই। নিকটে কোন গ্রাম না থাকায়, আমি নন্দনপুর হইতে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই নন্দনপুরে রাজার কাছে যাইতাম। এত ঘন ঘন যাইবার কারণ, রাজার শরীর ভাল ছিল না, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার বলা ছিল যে, সুবিধা ও সময় পাইলেই আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইব।

"এইরূপ ঘন ঘন যাতায়াতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। রাজা বড় বাহির হইতেন না; লোক-জনের সঙ্গেও বড় মিশিতেন না; বই পড়িতে খুব ভালবাসিতেন; আমার ন্যায় তিনিও সর্ব্বদাই বই লইয়া থাকিতেন।

"কয় মাস হইতে আমি দেখিলাম যে, রাজার স্নায়ু ক্রমেই অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে; এমন কি আমি বুঝিলাম, এরূপ ভাবে আর কিছুদিন থাকিলে তাঁহাকে শীঘ্রই শয্যাগত হইতে হইবে, এমন কি তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুও হইতে পারে। বিশেষতঃ তাঁহার বংশের এই শাপের কথা তিনি মনে মনে বড়ই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এমন কি রাত্রে তিনি কিছুতেই গড়ের বাহির হইতেন না।

"তিনি সুশিক্ষিত লোক, এইজন্য আপনি হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তিনিও এই ভৌতিক কুকুরের কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ভৌতিক কোন কিছু যে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে আছে, ইহা তিনি সব সময়েই মনে করিতেন; প্রায়ই আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ডাক্তার, তুমি ত রাত্রে দিনে—সব সময়েই এখান হইতে বাড়ী যাও, অন্য দূর গ্রামেও যাও, কখন কিছু দেখিয়াছ, কখনও কি কোন কুকুরের বিকট চীৎকার শুনিয়াছ ?'

"আমি পুনঃপুনঃ না বলায়ও তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিতেন না, কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভয় দূর হইত না।

"আমার একখানা ছোট টমটম গাড়ী আছে, আমি সেইখানিতে রোগী দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাই। একদিন সন্ধ্যার পর আমি রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি, রাজা অহিভূষণ দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলে তিনি আমার স্কন্ধের উপর হাত দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভয়াবহ একটা কিছু দেখিতেছেন। আমি সত্বর পশ্চাদ্দিকে ফিরিলাম—আমার বোধ হইল, কিছুদূরে অন্ধকারে একটা কাল বাছুর ছুটিয়া চলিয়া গেল। রাজা এত ভীত ও বিচলিত হইয়াছেন দেখিয়া, সেটা কি আমি দেখিতে গেলাম, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কোন জানোয়ার যে নিকটে আছে, তাহা আমার বোধ হইল না। এই কথা রাজাকে আসিয়া বলায় তিনি আরও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে রহিলাম। সেইদিন রাত্রে তিনি সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া এই পুঁথি আমাকে দিয়াছিলেন।

"এই বিষয়টা যে আপনাকে বলিলাম, তাহার কারণ তাঁহার মৃত্যুর সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে; তখন কিন্তু আমি ইহা কিছুই নহে, মনে করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম।

"তাহার পর আমিই রাজাকে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে পরামর্শ দিলাম। আমি ভাবিলাম, কিছুদিন বেড়াইয়া আসিলে তাঁহার শরীর মন দুই-ই ভাল হইবে। সদানন্দ বাবুও আমার মতে মত দিলেন। সদানন্দ বাবু আমাদের গ্রামের কাছেই থাকেন, বরং তাঁহার বাড়ী গড়ের কাছে—বেশী দূর হইবে না। রাজার সঙ্গে তাঁহারও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

"রাজার পশ্চিমে যাওয়ার সব স্থির, এই সময়ে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুপ তাঁহার মৃতদেহ দেখিবামাত্র একজন লোক আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়, আমিও তখনই ছুটিয়া আসি। আমি রাজার পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া যাই। তাঁহার মৃতদেহ যেখানে পড়িয়াছিল, তাহাও ভাল করিয়া দেখিয়াছি; তবে দেখিলাম, অনেকটা দূর তিনি পা টিপিয়া বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া গিয়াছেন, এই স্থানে তাঁহার পায়ের সম্পূর্ণ দাগ পড়ে নাই। আমি ইহাও দেখিলাম যে, সেখানে অনুপের পায়ের দাগ ভিন্ন আর কাহারও পায়ের দাগ নাই।

"আমি যতক্ষণ না উপস্থিত হইয়াছিলাম, ততক্ষণ রাজার দেহ কেহ স্পর্শ করে নাই। আমি দেখিলাম, রাজা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত, নখ মাটির ভিতর বসিয়া গিয়াছে, যেন তিনি নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেখানে অনেকগুলি নখের আঁচড়ের দাগ পড়িয়াছে। তাঁহার মুখের এমনই ভয়াবহ ভাব হইয়াছে যে,আমিই প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। পরে দেহ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন আঘাতের চিহ্ন নাই। তবে অনুপ একটা বিষয় লক্ষ্য করে নাই, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যেখানে দেহটা পড়িয়াছিল, তাহার প্রায় ত্রিশ হাত দূরে কতকগুলি স্পষ্ট দাগ ছিল।"

গোবিন্দরাম ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কিসের দাগ?"

ডাক্তার বলিলেন, "পায়ের দাগ।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকের না পুরুষের?"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু কেমন একরকম সশঙ্কভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন, পরে অনুচ্চস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, স্ত্রীলোক বা পুরুষের পায়ের দাগ নহে—একটা খুব বড় কুকুরের পায়ের দাগ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই কথায় আমার শিরায় শিরায় রক্ত যেন জল হইয়া গেল। ডাক্তারের কম্পিত স্বরে বুঝিলাম যে, তিনিও অতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। গোবিন্দরামও ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বসিলেন, এবং এক মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎসাহে ও আগ্রহে অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন?"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বলিলেন, "আপনাকে এখন যেরূপ স্বচক্ষে দেখিতেছি, ঠিক সেই রকম দেখিয়াছিলাম। স্বপ্ন নহে—কল্পনাও নহে।"

গোবিন্দ। কাহাকে এ কথা বলেন নাই ?

নলিনাক্ষ। না। বলিয়া লাভ কি ?

গো। আর কেহ এই কুকুরের পায়ের দাগ লক্ষ্য করে নাই কেন ?

ন। যেখানে মৃতদেহ ছিল, সেখান হইতে এই দাগ প্রায় ত্রিশ হাত দূরে ছিল; তাহাই কেহ ইহা লক্ষ্য করে নাই। আমি যদি এই পুঁথির কথা না জানিতাম, তাহা হইলে আমিও হয় ত তাহা লক্ষ্য করিতাম না।

গো। গড়ে অনেক কুকুর থাকিতে পারে।

ন। না, একটা কুকুরও ছিল না, কুকুরের উপরে রাজার অতিশয় বিরক্তি ছিল।

গো। আপনি বলিতেছেন, কুকুরটা খুব বড়।

ন। খুব বড়।

গো। রাজার দেহের কাছে কুকুরটা আসে নাই। তাহা হইলে তাহার পায়ের দাগ থাকিত।

ন। হাঁ, কাছে আসে নাই।

গো। রাত্রিটা কি রকম সেদিন ছিল ?

ন। মেঘ্লা—ঠাণ্ডা।

গো। বৃষ্টি পড়ে নাই ?

ন। না, আগের দিন একটু বৃষ্টি হইয়াছিল।

গো। রাজার দেহ যেখানে পড়িয়া ছিল, সেদিক দিয়া মাঠে যাইবার কোন পথ ছিল ?

ন। হাঁ, গড়ের খালের উপর দিয়া একটা ছোট সাঁকো আছে। সেই সাঁকো দিয়া মাঠে যাওয়া যাইতে পারা যায়।

গো। গড়ে যাইবার আর কোন পথ কি আছে ?

ন। না—আর সম্মুখের বড় পথ।

গো। তাহা হইলে কাহাকে বাহির হইতে গড়ের মধ্যে যাইতে হইলে হয় সম্মুখের পথ, না হয় এই সাঁকো, এ ছাড়া আর কোন পথে যাইবার উপায় ছিল না ?

ন। না, আর কোন পথ নাই।

গো। এখন একটা কথা—পথের দুই পাশে নিশ্চয়ই ঘাস ছিল?

ন। হাঁ, ছিল। পথটা সরু, দুইদিকেই ঘাস জন্মিয়াছিল।

গো। এই কুকুরের পায়ের দাগ ঘাসের উপর ছিল কি?

ন। না, ঘাসের উপরে পায়ের দাগ পড়িতে পারে না।

গো। সাঁকোর দিকে এই দাগ ছিল?

ন। হাঁ, সাঁকোর দিক্ দিয়াই বোধ হয়, কুকুরটা আসিয়াছিল।

গো। এদিকে কোন দরজা ছিল?

ন। হাঁ, সাঁকোর মুখেই একটা দরজা ছিল, সেটা সে রাত্রে তালা দিয়া বন্ধ ছিল।

গো। তাহা হইলে একটা প্রাচীর ছিল?

ন। হাঁ, কিন্তু বেশি উঁচু প্রাচীর নয়।

গো। আপনি আমাকে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন, দেখিতেছি। আচ্ছা বলুন দেখি, কেহ এই প্রাচীর অনায়াসে লাফাইয়া আসিতে পারে কি না।

ন। বেশ পারে।

গো। এই দরজার কাছে আর কোন দাগ ছিল?

ন। না, আর বিশেষ কোন দাগ ছিল না।

গো। কি আশ্চর্য্য! কেহ কি ভাল করিয়া দেখে নাই?

ন। আমি খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম।

গো। কিছুই দেখিতে পান নাই?

ন। রাজার পায়ের দাগ ছিল। বোধ হয়, রাজা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গো। কিসে জানিলেন?

ন। তাঁহার চুরুটের ছাই এখানে পড়িয়াছিল।

গো। খুব ভাল, এত লক্ষ্য কেহ করে না। আপনার সঙ্গে কাজ করিয়া আনন্দ আছে। তাহার পর দাগ সম্বন্ধে কি?

ন। সেখানে তাঁহারই পায়ের দাগ দেখিতে পাইয়াছিলাম, আর কোন দাগ ছিল না।

গোবিন্দরাম চেয়ারের হাতায় দুই তিনবার করাঘাত করিয়া, সেই সঙ্গে জিহ্বা ও তালুর সংযোগে একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিলেন, "আমি যদি

সেদিন সেখানে ঠিক সেই সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতাম! ব্যাপারটা যে বিশেষ কৌতুকাবহ ও রহস্যজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই স্থানটা আমি সে সময়ে দেখিলে হয় ত অনেক কথা জানিতে পারিতাম। যাক্, এখন সেখানে আর কোন দাগই নাই। ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু, পূর্ব্বেই আমাকে আপনার সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

ডাক্তার নলিনাক্ষ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, এই অদ্ভুত কুকুরের ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় নাই; তবে যে আপনাকে বলিতেছি, সে কেবল কর্ত্তব্যে বাধ্য হইয়া। ইহা প্রমাণ করিলে আমাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হইত। তাহার পর—তাহার পর—"

গো। তাহার পর কি? বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? বলুন।

ন। ইহার ভিতরে আরও অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে। আমার মনে হয়, খুব সুদক্ষ বহুদর্শী প্রবীণ ডিটেক্টিভের দ্বারাও সে সব ব্যাপারের কিছু কিনারা হইতে পারে না।

গো। তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস, এটা সম্পূর্ণ ভৌতিক ব্যাপার?

ন। না, আমি ঠিক একথা বলি না।

গো। কিন্তু না বলিলেও স্বতই আপনি তাহাই ভাবিয়াছেন?

ন। রাজার মৃত্যুর পর অনেক বিষয় আমার কানে আসিয়াছে, সে সব ভৌতিক ভিন্ন আর কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই।

গো। কি রকম একটা বলুন, শোনা যাক্।

ন। এই ব্যাপার ঘটিবার পূর্ব্বে, গড়ের বাহিরের মাঠে অনেকে একটা ভয়াবহ কুকুর দেখিয়াছে। যাহারা তাহা দেখিয়াছে, তাহারাই বলে যে সেটা কুকুর নয়,—কুকুর তেমন হয় না, এত বড়, এমন কুকুর কেহ কখনও দেখে নাই, তাহার পর রাত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতে থাকে। যাহারা এই ভয়াবহ জানোয়ার দেখিয়াছে, তাহাদের আমি বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে তাহারা যাহা বলে, তাহাতে এই পুঁথির কুকুরের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়। সেখানকার লোকে এত ভয় পাইয়াছে যে, আর কেহ বাড়ীর বাহির হয় না।

গো। আপনার ন্যায় সুশিক্ষিত লোকও এটাকে ভূত মনে করিতেছেন?

ন। আর কি মনে করিব?

গোবিন্দরাম মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমি চোর, জালিয়াৎ,

খুনী দস্যুদের ধরিয়া বেড়াইতেছি, তবে ভূত কখনও ধরি নাই ; বোধ হয়, ইহা আমার অধিকার ও ক্ষমতার বাহিরে। ডাক্তার বাবু, আপনি কুকুরের যে পায়ের দাগ দেখিয়াছিলেন, সেটা ভৌতিক বা মিথ্যা নহে, এটা ত স্থির ?”

নলিনাক্ষ বলিলেন, “এই পুঁথির কুকুরটা ভৌতিক হইলেও সেই রাজার রক্তপান করিয়াছিল ; এরূপস্থলে এ ব্যাপারটাকে ভৌতিক বলিব, কি পৈশাচিক বলিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না।”

গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, আপনি সম্পূর্ণ ভূত-বিশ্বাসী হইয়া গিয়াছেন। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার ইহাই বিশ্বাস, তবে আমার কাছে আসিয়াছেন কেন ? আপনি বলিতেছেন, রাজা অহিভূষণের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা বৃথা, আবার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টা গাইতেছেন—এই অনুসন্ধান করুন।”

ন। আমি যে সেইজন্য আপনার কাছে আসিয়াছি,তাহা ত আমি এ পর্য্যন্ত আপনাকে বলি নাই। অনুসন্ধানে আর ফল কি ?

গো। তাহা হইলে কি জন্য আসিয়াছেন ?

ন। রাজা মণিভূষণ আর এক ঘণ্টার মধ্যেই হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে কি করিব, তাহাই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনার পরামর্শে অবশ্যই আমরা উপকৃত হইবার আশা রাখি। [ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কবিতা-কুঞ্জ।

বেলা যে যায়

(১)

বিদেশে কেন আর বেলা যে যায়!
আঁধার চারি ধারে ঢেকেছে ধীরে ধীরে,
তারকা ফুটিয়াছে গগনময়!
বিদেশে কেন আর বেলা যে যায়!

(২)

পূরবী রাগিণী ওই যে কে গায়!
উদাস প্রাণ কার ধ্বনিয়া চারি ধার,
গাহিছে ওই শোন, “বেলা যে যায়!
আয় গো প্রবাসী ঘরে ফিরে আয়!”

(৩)

আজিকে তাই বলি চল্ গো তোরা।
হেথায় কেন মিছে, থাকিবি পড়ে পিছে—
নয়ন-নীর তোর মুছাবে কারা ?
মানব যারে ভাব কোথায় তারা ?

(৪)

মানব আছে যত হৃদয়হীন ;
নাহিক ভালবাসা শুধুই স্বার্থ আশা
স্বার্থে পাগল হ’য়ে দলিছে দীন—
পাষাণে প্রাণ সব করেছে লীন!

(৫)

বৃথায় কেন আর বাড়িছে বেলা!
তব এ ক্ষুদ্র প্রাণ করুণ যার দান—
হরিলে সেই দান, ঘুচিবে খেলা—
রহিবে পড়ে সব—ভাঙ্গিবে মেলা!

(৬)

ওই শোন গাহে কে চেনা সে সুরে!
ধ্বনিছে ওই শোন নগর, গিরি, বন—
ও গানে প্রাণ মোর গিয়েছে ভরে!
আমারে লহ দেব করুণা করে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

নারী।

নারি! তুমি কি মাধুর্য্যে, বিরাজ সংসারে সদা
শোভার মাঝারে;
মনে হয় সৌদামিনী চমকি চমকি ছুটে
মেঘ অন্ধকারে।
প্রকৃতির কি চারুতা, বিজনে বিপিনে সখি,
কি পিক কুহরে;
মাথায় দিল গো কেশ রক্তিম অশোক রাগ
বিম্বের অধরে।
কাননে জড়ায়ে তরু, কুসুম কুন্তলে বাঁধি
শ্যামালতা দোলে;
কীটাণু মজিয়া আছে সর্ব্বাঙ্গে পরাগ মাখি
কমলের কোলে!
তেমতি সুন্দরি আমি, রূপের সাগরে তব
ডুবি রাগভরে,
বিশ্বের বিকাশে সখি, শোভার নির্ঝর হেন
আর কোথা ঝরে।
কেন হও বরাননী পাষাণী?—পাষাণ বুকে
ভরিয়া গরল;
কুসুম কোমলা কভু, বহে ও কোরক বুকে
অমিয় তরল।
রহস্যে জড়িত তুমি হে রহস্যময়ী নারি,
মানস-মোহিনী;
হে রূপসি! প্রতি রূপে, হয়ে আছ মানবের
জীবন-সঙ্গিনী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

সাহিত্য-সমাচার।

অবসর।—(কবিতা পুস্তক) শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। আমরা এই পুস্তক একখানি উপহার পাইয়াছি এবং আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি ভাবহীন ভাষাহীন শ্রুতিমধুর হেঁয়ালী নহে। প্রত্যেক কবিতাটি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কোমল ভাবের বিকাশ সুতরাং বড় মধুর, বড় চিত্তাকর্ষক। সদ্যজাত শিশুকে উদ্দেশ্য করিয়া অনেক কবি অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু লেখিকার মত কে কবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

সকল সান্ত্বনা স্থল মধুর হৃদয় শূন্য
যে রচিল মাতৃ কোল যে শিশু তোমার জন্য
যে তোর সুখের লেগে তাঁর কথা একবার
সঞ্চারিল আগে ভাগে বল শিশু সুকুমার?

প্রত্যেক জননী যদি প্রথম বাক্য স্ফূর্ত্তির সময় হইতেই শিশুকে বিভুনাম গাহিতে শিখায় তাহা হইলে জগত পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। "অশ্রুজল"কে সম্বোধন করিয়া লেখিকা বলিয়াছেন—

তখন সে অভাগিনী
হারায়ে নয়ন-মণি,
শূন্য দেখি গৃহ-দ্বার
করে শুধু হাহাকার।
সে দুঃখ সময়ে তারে কে দেয় সান্ত্বনা
তুমিই ত অশ্রুজল তাহার আপনা।

বলা বাহুল্য কেবল গ্রন্থ ছাপাইয়া যশস্বী হইবার বাসনা থাকিলেই এরূপ কবিতা লেখা যায় না। যিনি প্রকৃত কবি, যিনি হৃদয়ের ভাবরাজিকে কাগজে কলমে প্রকটিত করিতে পারেন তিনিই এরূপ কবিতা রচনা করিতে পারেন। "উমা" কবিতাটি বড় সুমিষ্ট। "অবসর" সর্ব্বাঙ্গে উত্তম হইয়াছে। আমরা অচিরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

৫১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, বণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫ম বর্ষ।]   জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫

May 1908

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়" ১৮ নং পার্ব্বতীচরণ [illegible] লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে [illegible]-সাধনা সমিতির সম্পাদক শ্রী[illegible] রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।]   [ডাক মাশুল লাগে না।

পারিতোষিক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

ধারোওয়াল প্রথম লিমারিক প্রতিযোগিতা।

প্রথম পুরস্কার।

মেজর এ, বেগবি, ৮ম রাজপুত, লক্ষ্ণৌ — ১০০০৲

Dhariwal is the place where they make,
Pure Wool Lohis without any fake,
Than imported, far better,
Just send us a letter,
You'll be rapt with our wrap, no mistake.

দ্বিতীয় পুরস্কার।

মিসেস এ, সি, এরিংটন, কোপ্পা, কেদার, মাইসোর — ২৫০৲

And you'll get what the dhobi can't break.

দশটী পৃথক পুরস্কার।

মেজর বেগবি, ৮ম রাজপুত, লক্ষ্ণৌ — ৫০৲
আর, ব্র্যাওন্, নিসবেট রোড, লাহোর — ৫০৲
জি, ম্যাক্‌করলি, ৯ ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা — ৫০৲
এইচ, ও' ক্যালাঘ্যান্, টেম্পল রোড, লাহোর — ৫০৲
সার্জেণ্ট ইনস্পেক্টর সি, কজিন্স ১ম পি, ডি, আর, অমৃতসর — ৫০৲
আর, পি, ডালে, এম্প্রেস রোড, লাহোর — ৫০৲
ই, এ, হার্বার্ট, কোর্ট ষ্ট্রীট, লাহোর — ৫০৲
ডবলিউ, লেট, পোলো ভিউ, শিলং, আসাম — ৫০৲
সি, সি, মুখার্জি এস্কোয়ার, বি-এ, বি-এল, ১৯।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলি — ৫০৲
এম, ট্রিগিয়ার, কোহিমা, নাগা হিলস্ — ৫০৲

কুড়িটী পৃথক পুরস্কার।

ডবলিউ, পি, এপেলফোর্ড, শ্রীনগর, কাশ্মীর — ২৫৲
আর, বি, বেইনব্রিজ, মুগল, বি, এন্, ডবলিউ রেলওয়ে, বেঙ্গল — ২৫৲

মিসেস এইচ, জি, বিলসন, দি সিডার্স, চকরাতা	২৫৲
আর, বি, ডিমক, ব্যারাক মাষ্টার, ডালহৌসী	২৫৲
মিসেস এম, ডি'গামা, কোট্রি, সিন্ধ	২৫৲
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, পুলিস ট্রেনিং কলেজ, রাঁচি ক্যাণ্টনমেণ্ট	২৫৲
রসিক লাল সেন, এইচ, কে, রেলওয়ে, হুগলী, বেঙ্গল	২৫৲
ডি, ই, লিটল, এলবিয়ন হাউস, দি মল, লাহোর	২৫৲
পি, ম্যাকভয়, কাঁচরাপাড়া, ই, বি, এস, রেলওয়ে	২৫৲
জে, আর, ও'নিল, ধারওয়ার, বোম্বে	২৫৲
মিসেস ই, পোলার্ড, এমলি লজ, নাইনিতাল	২৫৲
বি, ডি, পদমজি, এইচ, আই, এম'স মিণ্ট, বোম্বে	২৫৲
রামচন্দ্র রাও, বি, এল, কড্ডালোর, এন, টি	২৫৲
মিসেস এল, রোজ, মালাকান্দ, এন, ডবলিউ, এফ, পি	২৫৲
মিসেস কে, সাউবোল, ম্যানর কটেজ, বাঁকুড়া	২৫৲
এইচ, টমসন, রায় বেরেলি, ইউ, পি	২৫৲
আর, এন, উইটম্যান, হোসেঙ্গাবাদ, সি, পি	২৫৲
ই, ডবলিউ, উইলকিন্স, ইয়ারকন্দ, সেঞ্চুরি হিলস্, মান্দ্রাজ	২৫৲
এ, এ, উডহাউস, বুলান্দসহর, ইউ, পি	২৫৲
মিসেস, এফ, এ, ইয়ং, আরুভানকাডু, নিলগিরি	২৫৲
মোট	২,২৫০৲

কতকগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত পংক্তি।

With *cash* : *mere* shams you'll then ne'ver mistake.
And with all other *made uns* you'll *break*.
They've *caught-on*, not *cotton*, not a flake.
With the Lohi the *Mill* (c) you may take.
Since our *Lohis'* price *low is* prize take.
You are in for the *Gold-an* (d) *Fleece* stake.
The *surge* (serge) of the *shore'll* (shawl) never break.
Hurry on ! for they go like hot cake.

কোম্পানীর আমলের আয় ব্যয়।

একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে যদি ন্যায়-সঙ্গত বিদ্রোহের কোন উদাহরণ অন্বেষণ করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ গরু ও শূকরের চর্ব্বিতে রঞ্জিত কার্টিজ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়া যে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল, তাহাই জগতের মধ্যে একমাত্র সঙ্গত বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসন-কর্ত্তাদের দ্বারা এই ভুল সংঘটিত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার ব্যয় বহন করিল। এতৎপূর্ব্বে চীন ও আফগানিস্থানে ভারতীয়-সেনাদল নিযুক্ত থাকিত; কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার রাজ্যের প্রান্ত সীমার বহির্ভাগে নিযুক্তিয় সেনা-দলের ব্যয় বাবদ কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ যখন মিউটিনী দমনের নিমিত্ত ইংরেজ-সেনাদল ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়, ইংলণ্ড তখন অদৃষ্টপূর্ব্ব কঠোরতার সহিত তাহার ব্যয় ভার আদায় করিয়া লয়। *

"ঔপনিবেশিক কার্য্যালয়ের (Colonial office) বা ভারতবর্ষ ব্যতীত যাবতীয় বৃটীশ উপনিবেশের হোম গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয়, সামরিক ও নৌ-বহর সম্বন্ধীয় সমস্ত খরচ যুক্তরাজ্যের রাজস্ব-ভাণ্ডার হইতেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; সুতরাং, স্বভাবতঃই মনে হয় যে, ভারতবর্ষের এবম্প্রকার সমুদয় খরচই ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাই কি? এ পর্য্যন্ত একটী শিলিংও ইংলণ্ডের রাজ-কোষ হইতে আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের সামরিক ব্যয়ের আনুকূল্যে প্রদত্ত হয় নাই।

"যে জাতি উপনিবেশ ও অধীন পর-রাজ্যের প্রয়োজনের সময় নিজ অর্থ-ভাণ্ডার হইতে এত মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারে, সে জাতি নিজের অধিকৃত বিপুল ভারতীয় সাম্রাজ্যের গুরুতর অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় যে এরূপ অনভ্যস্ত ও অননুমিত ব্যয়কুণ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের কথা।

"কিন্তু এই খানেই মন্দের শেষ নহে; আরো কিছু বলিতে আছে। গত বিদ্রোহের সময় যখন বিলাত হইতে অতিরিক্ত সেনা-দল ভারতবর্ষে প্রেরিত

---

* Lecky's *Map of Life.*

হয়, তখন তাহাদের ছয় মাসের বেতন ভারতীয় রাজকোষ হইতে অগ্রিম তলব করা হয়; এবং বৃটীশ সেনা-বিভাগের পে অফিসে ভারত-সরকার হইতে ঐ টাকা আদায় করা হয়।

"ভারতীয় বিদ্রোহের সেই সঙ্কট সময়ে, ভারতের আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় দশায় উপনীত হয়, গ্রেট বৃটেন সেই সময় যে তৎপ্রেরিত অতিরিক্ত সেনা-দলের ব্যয় তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লয় তাহা নহে, পরন্তু সেই সেনাদলের বিলাত ত্যাগের অব্যবহিত ছয় মাস পূর্ব্বের সমস্ত বেতন তলব করিয়া লয়।" *

স্যর জর্জ্জ উইনগেট অপেক্ষাও আর এক ক্ষমতাশালী পুরুষ মিউটিনির ব্যয় ভার সম্বন্ধে সরল ও নির্ভীক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সে ব্যক্তি—জন ব্রাইট; তিনি বলেন;—"আমার মনে হয়, এই বিদ্রোহ দমন করিতে যে, চল্লিশ মিলিয়ন ব্যয় হইবে, তাহা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিলে তাহাদের উপর গুরুতর চাপ দেওয়া হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের ও ইংলণ্ডবাসিগণের কুশাসন হইতেই এই বিদ্রোহের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই চল্লিশ মিলিয়ন মুদ্রা যে এদেশবাসীর উপর কর বসাইয়া তোলা উচিত, তাহা প্রত্যেক ন্যায়পর ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে বলিবেন।" †

এই সকল উক্তি উদ্ধৃত ও ঘটনা বিবৃত করিয়া আমরা যে পুরাতন ও বিলুপ্তপ্রায় বাদানুবাদ পুনর্জ্জীবিত করিতেছি তাহা নহে; পরন্তু কি প্রকারে যে ভারতের ঘাড়ে এই বিপুল ঋণভার পতিত হয় তাহারই প্রকৃতিটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত বিজয় ও শাসনের নিমিত্ত এবং তাহার অর্থাগমের পন্থা সুপ্রশস্ত করিবার অভিপ্রায়ে যে বিপুল অর্থ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়, তাহা হইতেই এই ঋণের সূত্রপাত হয়। এই প্রস্তাবে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋণের প্রকৃতি ঐরূপ ছিল না। ভারতবর্ষ নিজের বিজয় ও শাসনের ব্যয় নিজেই বহন করিয়াছে এবং কোম্পানীর শাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত যে সামান্য বিলাতি অর্থ এদেশে আসিয়া পড়ে, তাহা শতাব্দীকাল ভারত-প্রদত্ত করের তুলনায় অতি নগণ্য মাত্র। সে যে এই ভাবে কত দিয়াছে, তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর

* Our Financial Relations with India.

† John Bright's Speech on East India Loan.

প্রারম্ভ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্যর জর্জ্জ উইনগেটের গণনায় সুদ ছাড়া একশত মিলিয়ন হয়; মণ্টগোমারি মারংটীন উক্ত শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসরের পরিমাণ ভারতীয় সুদের হার—শতকরা বারো টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি মতে সুদ ধরিয়া সাতশত মিলিয়ন স্থির করেন। এই হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যে টাকা দিয়াছে তাহা ধরা হয় নাই।

এই করই হোম চার্জ্জ স্বরূপ ভারতের নিকট হইতে আদায় করা হয়,—এবং ইহাই ভারতীয় ঋণের প্রকৃত কারণ। ভারতবর্ষ তাহার নিজের শাসন ব্যয় নির্ব্বাহ করে, যুদ্ধবিগ্রহাদির ব্যয় প্রদান করে কিন্তু এই সকল নিজ ব্যয় ব্যতীত অতিরিক্ত যে কর তাহার নিকট দাবী করা হয় তাহা দিবার ক্ষমতা তাহার নাই; কাযেই প্রতি বৎসর তাহার ঋণের ভার বাড়িয়া উঠিতেছে এবং এবম্প্রকারে তাহার পরিমাণ লর্ড ডালহৌসির ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে ৬০ মিলিয়নে পরিণত হয়, এবং মিউটিনীর প্রথম বর্ষের ব্যয় বাহুল্যে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিরোভাব সাধিত হয়, তখন ভারতের ঋণের পরিমাণ সত্তর মিলিয়নে পরিণত হয়।

ইংলণ্ড কি অন্ততঃ এই ভাবে পুঞ্জিকৃত ঋণভারের দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে পারে না? তাহা হইলেও বৎসরে প্রায় এক মিলিয়ন ষ্টারলিংএর উপর সুদ কমিয়া গিয়া ভারতের করদাতাগণের কতকটা স্বস্তি আনয়ন করে। লর্ড ষ্টান্‌লি অবশেষে লর্ড ডার্‌বি ১৮৫৯ অব্দে বিচক্ষণতার সহিত বলিয়াছেন;—"পার্লিয়ামেণ্টের এবং এদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট শাসন-নীতি (uniform policy) যে ভারতীয় ঋণের কোন দায়ীত্বই স্বীকার করে না, তাহা যে কেবল ভারতীয় এক্‌স্‌চেকারের ঘাড়ে চাপান আছে, তাহা আমি অবগত আছি। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় আমি বর্ত্তমান নীতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ জানি, তাহাতে ভয়ঙ্কর অশান্তি কোলাহলের সৃষ্টি করিবে, এবং সে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব কাহারই মনোমত হইবে না। কিন্তু এই প্রশ্নটাই পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইবে এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও উহার মীমাংসার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।"

"আমি ইহাও হাউস্‌কে মনে রাখিতে বলি যে, কালে যদি এই নির্দ্দিষ্ট নীতির কোন ব্যতিক্রম হয় এবং এই ঋণ সম্বন্ধে যদি জাতীয় দায়ীত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সে দায়ীত্বে ভারতীয় ঋণের জন্য প্রদত্ত ৭৫০,০০০ পাউণ্ড, বা হয়ত ১,০০০,০০০, পাউণ্ডেরও বেশী পরিমাণ সুদ কমিয়া আসিবে।" *

* Lord Stanley's Speech on East India Loan.

ইহার ছয় মাস পরেই জন ব্রাইট এই Imperial guaranteeএর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করেন,—

"আমি Imperial guranteeএর বিরোধী নহি, এ বিষয়ে ইংরেজ করদাতাগণের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি বিবেচনা করি ইংরেজ করদাতাগণ ভারতের সমস্ত কার্য্যেই অবহেলা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। * * * কিন্তু এইজন্য আমি রাজকীয় দায়ীত্ব স্বীকারের বিরোধী হইতেছি যে,যদি আমরা ভারতের অর্থ-ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়া উহার অধিবাসিগণকে ইংরেজদের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া—ভারতবর্ষের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসি তাহা হইলে ভারতীয় ব্যয় বাহুল্যের উপর ইংলণ্ডের কোন ক্ষমতা না থাকা হেতু, কি পরিমাণে যে তাহাকে অমিতব্যয়ী হইতে হইবে, তাহা কল্পনাতেও আনা অসম্ভব। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া কি আমরা ইংলণ্ডের ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করিব না ?" *

ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া পরিচিত জন ব্রাইটই এখন ভারতের ঋণভার লাঘবের জন্য ইংলণ্ডের দায়ীত্ব গ্রহণের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। †

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

রাণা প্রতাপ।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

অমরসিংহ। স্বাগতঃ রাজন্—প্রস্তুত আসন।

মানসিংহ। অতি ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথি।
উপযুক্ত আয়োজন করেছ কুমার।
(আহারে উপবেশন)
কিন্তু কোথা মহারাণা ?

* John Bright's Speech, August 1,1895.

† R. C. Dutt's Indian Trade,, Manufactures and Finance.

অমর। মহারাজ, শিরঃপীড়া-ব্যথিত ভূপাল।

মান। যে কারণে শিরঃপীড়া বুঝেছি কুমার,
উপায় নাহিক' কিছু আর,
গত দিন আর না ফিরিবে—
যা হয়েছে নহে ফিরিবার,
জানাও রাণায়,
আমা সনে তিনি নাহি বসিলে অশনে
অম্বর-ঈশ্বর—
করিবে কাহার সনে একত্রে আহার!
কহ তাঁরে, স্বেচ্ছায় আতিথ্য আমি করেছি স্বীকার,
সম্মান প্রদান হেতু তাঁ'র।
সে কারণে মান হত নাহি হয় মম
অতিথি সৎকার উচিত রাণার।

(প্রতাপসিংহের প্রবেশ)

প্রতাপ। অম্বর-অধিপ, সম্মানিত অনুগ্রহে তব আমি,
কিন্তু মতিমান, করহ বিধান,
মুসলমান সংস্পর্শ নাহি এই কুলে,
অনুপায়—কৃপায় মার্জ্জনা করো দান।

মান। মহারাণা, মুসলমান সংস্পর্শিত সমস্ত ভারত,
করিহে স্বীকার, সংস্পর্শ নাহিক মিবারে,
বাসনা কি করেছ রাজন্,
সমস্ত এ হিন্দুকুল করিতে বর্জ্জন?
দুর্দ্দম অরাতি,
আত্মীয় বান্ধবগণে করি পরিহার,
উচ্চশিরে রবে রাণা সম্মুখীন তাঁর
কুমন্ত্রণা ত্যজ মহারাজ।
একতা-বন্ধনে বাঁধ ক্ষত্রিয়-সমাজ—
রাজলক্ষ্মী রহিবে অচলা।

প্রতাপ। নির্ম্মল এ কুলে কালী করিতে অর্পণ
নারিব রাজন্;—

তুর্কিরে করেছ ভগ্নিদান,
সম্ভবতঃ হইয়াছে একত্রে ভোজন,
পানপাত্র একত্রে গ্রহণ
কর ক্ষমা—এস্থলে উপায়হীন আমি।

মান। জান কি রাজন্
কি কারণ আগমন করেছি মিবারে?
রাণা-বংশে সম্মান প্রদান হেতু।
বীরভূমি রাজস্থান—
অংশে অংশে পরাজিত মুসলমান-করে।
অসহায় লইয়াছে অরাতি-আশ্রয়,
কিন্তু ক্ষুব্ধ-চিত্ত যত হিন্দু ভূপতিমণ্ডল
অনিচ্ছায় সম্মান প্রদানে বিজাতীরে।
একমাত্র মিবার অজিত
হিন্দুরাজ্য রক্ষার আশায়—
সবে চায় মিবারের স্বাধীনতা,—
কিন্তু যদি মিবার-অধীপ,
বংশ-গরিমায় না চান সহায়,
মুসলমান জ্ঞানে ত্যজেন আত্মীয়গণে
বিদলিত হিন্দুসনে না করি সম্প্রীতি,
মুসলমান জ্ঞানে নেহারেন ঘৃণার নয়নে
তবে তাঁরে হিন্দু বলি কিহেতু মানিবে,
মুসলমান—মুসলমান সহযোগী হবে,
কতদিন মিবার প্রভাব রবে?
কুলহীন সাগর তরঙ্গ মাঝে
ক্ষীণতরি কতদিন রবে স্থির?
বৃথা দম্ভ ত্যজ মহারাণা;
করি আত্মীয় বর্জ্জন
বিপদ না কর আবাহন—
বন্ধুগণে শত্রু নাহি করো।

প্রতাপ। কদাচ না করি আমি বান্ধব বর্জ্জন,

কিন্তু অনাচার নহিবে সম্ভব এই কুলে,
বারবার মার্জ্জনার প্রার্থী নরবর
তোমার সমীপে আমি—
কৃতার্থ করহ ভোজ্য করিয়ে গ্রহণ।

মান। যা হ'বার হইয়াছে বিধির বিধানে,
কিন্তু ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে এখন' শিরায়,
অপমান অধিক না সয়;
ভাল, পণ যদি তব রাণা আত্মীয় বর্জ্জন,
দেখিব কেমনে কর' আচার রক্ষণ
কতদিন রহে শির উন্নত তোমার
মিবার না হয় মুসলমান ক্রীড়াভূমি;
তর্ক পুনঃ করিব রাজন্—পুনঃ হবে সম্মিলন।
ইষ্টদেবে করিয়াছি নিবেদন,
সেই হেতু অন্ন করি মস্তকে ধারণ।
দাম্ভিক প্রতাপ,
অতি দর্প নহে শ্রেয়ঃ শাস্ত্রে হেন কয়।

প্রতাপ। কহিলে কৃপায় অহে অম্বর-অধীপ,
কৃপায় দানিবে দরশন,
কতদিনে হবে সম্মিলন! রহিলাম প্রতীক্ষায়।
ধর্ম্ম লক্ষ্য—ধর্ম্ম মম প্রাণ,
ধর্ম্ম-বলে ধর্ম্ম রক্ষা আপনি হইবে,
মুসলমান-সাহায্যে নাহিক প্রয়োজন।

১ম সভ্য। পুনঃ যবে হবে আগমন—
আকবর ফুপুরে সাথে আনিহ রাজন।
শুনি রাজা, তুর্কির দক্ষিণ হস্ত তুমি···
তাঁর পাশে দাঁড়াইলে শোভা বৃদ্ধি হবে।

মান। নারি যদি দর্প খর্ব্ব করিতে তোমার,
বৃথা মানসিংহ নাম ধরি।

প্রতাপ। সুখী হব যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে দরশন।

১ম সভ্য। ফুপুরে আনিতে রাজা হয়ো না বিস্মৃত।

[মানসিংহের প্রস্থান।

প্রতাপ। পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ কর স্নান করি,
গঙ্গাজলে ধৌত হোক কলুষিত স্থান
কলুষিত অন্ন হোক সলিলে অর্পিত।

সকলে। জয় হিন্দুকুলশেখর মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ।

আকবর। স্বাগতঃ হে অম্বর-ঈশ্বর!
তব বলে মম বল অজেয় ভারতে,
বাদ্‌সার দক্ষিণ বাহু তুমি,
সোলাপুর জয়-বার্ত্তা শুনি দূতমুখে
দানিলাম শত ধন্যবাদ আপনারে—
তোমা সম বন্ধু মিলে বহু ভাগ্যফলে,
কিন্তু কিহেতু বিষণ্ণ বীরবর?
ঈশ্বর-কৃপায়, অশুভ না হয় যেন অম্বর-আলয়।

মানসিংহ। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন এ দাস—

আক। একি কথা কহ মহারাজ!
সিংহাসনে দৃঢ় স্তম্ভ তুমি—

মান। জাঁহাপনা, কৃতঘ্ন নিশ্চয়, নহে কেন দুর্ম্মতি এমন,
নহে কেন হ'ল মম মিবারে গমন,
নহে কেন করিলাম আতিথ্য গ্রহণ,
স্বেচ্ছায় বাদ্‌সা-দ্বেষী প্রতাপ রাণার?
অবনত যার পদে সমস্ত ভারত,
প্রয়োগ তাহার প্রতি পরুষ বচন,
কিহেতু বা করিব শ্রবণ?

ঘৃণা হয় জীবনে আমার,
বাদ্‌সা-বিদ্বেষী জনে দণ্ডিতে নারিনু
তনু মম দহে অনুতাপে।

আক। অদ্ভুত এ কথা মহারাজ!
হিন্দু-মুসলমান প্রথা আছে চিরদিন
যথাসাধ্য করিবারে অতিথির সেবা,
অতিথি যদ্যপি হয় অতি হীন জন,
করি আপন বঞ্চন—
শুশ্রূষা উচিত অতিথির;
একি বিপরীত—
ভদ্রজন অনুচিত এ হেন আচার
উচ্চ মিবারের পতি সেই প্রতাপ রাণার!
একত্রে ভোজন পান সম্মান প্রদান
তাহাতেও হয়েছে কি ত্রুটি?

মান। লজ্জায় না সরে বাক্ মুখে জাঁহাপনা,
করি ঘৃণা মুসলমান জ্ঞানে
সম্মত নহিল রাণা একত্র ভোজনে।
নাহি রাখে বাদ্‌সার ডর,
বাদ্‌সার কিঙ্করে না করিল সম্মান।

আক। যেবা হয় উচিত বিধান,
কর মতিমান্
ইচ্ছামত করো রাজা প্রতিশোধ দান—
দিল্লী সেনা সুসজ্জিত, অবারিত দিল্লীর ভাণ্ডার
আজ্ঞায় তোমার হবে ওহে বান্ধব-প্রধান!
কিন্তু এক বিঘ্ন এতে হেরি,
শুনি নৃপমণি,
রাজপুত ভূপাল যত সহায় বাদ্‌সার,
রাণা প্রতি মহাভক্তি সে সবার;
হয় যদি রণ আয়োজন,
অসন্তোষভাজন যদ্যপি হই তাহে!

মিবারের রাজছত্র উচ্চ সবা হ'তে
রাজপুতগণের শুনি ধারণা অন্তরে।
এই যে ভূপালগণ আগত সবায়,
সোলাপুর জয় হেতু উৎসব কারণ,
প্রেরি মন্ত্রীবরে আবাহন করেছি সবারে!

(রাজাগণের প্রবেশ)

স্বাগতঃ হে মহীপালগণ,

সকলে। জয় দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!

আক। আসন গ্রহণ করুন সকলে,
দানিলেন রাজা মান অদ্ভুত সংবাদ,
ছিল জ্ঞান, মিবার-প্রধান
সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধীর অতি উচ্চাশয়
কিন্তু শুনি যে আচার তাঁর
নাহি তাহে এ সকল গুণ পরিচয়,
অতিথির অসম্মান শুনি তাঁ'র পুরে!
রাজা মান না দিলে সংবাদ,
প্রত্যয় না হ'ত মম এ হেন বারতা—
মিবারে অতিথি হ'ল অম্বর-ঈশ্বর,
মুসলমান জ্ঞানে তাঁরে করি অনাদর,
কটূ উক্তি করিলেন কত!
কহ রাজা বন্ধুগণে মীবার বারতা!

মান। শুন শুন ভূপতিমণ্ডল,
কেহ কন্যা, কেহ ভগ্নী করিয়ে প্রদান,
করিয়াছি মোরা সবে বাদ্‌সা সম্মান,
রাণার বিদ্বেষ তেঁই আমা সবা প্রতি।
অতিথি হ'লেম তাঁর পুরে,
শুন প্রতিদান—
দম্ভভরে সমাদর না করিল রাণা
কহিল কর্কশ ভাষে লক্ষিয়ে আমায়,
কুটুম্বিতা বাদ্‌সার সনে আছে যাঁর
স্বজাতি সে নহেক আমার!

১ম রাজা। এত দম্ভ মিবারপতির!

মান। কন তিনি,—হিন্দু নহি আমরা সকলে! [ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

[ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মণিভূষণ—ইনিই কি এখন নন্দনপুরের নূতন মালিক হইয়াছেন?"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, রাজা অহিভূষণের মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মণিভূষণের সন্ধান লই। মণিভূষণ পঞ্জাবে ছিলেন, যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, তিনি ভাল লোক বলিয়াই জানিতে পারিয়াছি। রাজা অহিভূষণ উইলে আমাকে অভিভাবক করিয়া গিয়াছেন।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য কেহ কি এ সম্পত্তি দাওয়া করিতে পারে?"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "না, আর কেহ নাই। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইয়াছি। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা অহিভূষণের আর দুই ভাই ছিলেন, দুইজনেই তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান। মণিভূষণ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চরিত্র অতি কদর্য্য ছিল, তাঁহার সন্ধান যতদূর পাওয়া যায়, তাহাতে জানা গিয়াছে, তিনি অবিবাহিত অবস্থায়ই মান্দ্রাজের দিকে কোন স্থানে মারা গিয়াছেন। সুতরাং এই মণিভূষণ ব্যতীত আর নন্দনপুরের কোন মালিক নাই. তাঁহার বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়াছেন। একঘণ্টা পরেই হাবড়ায় উপস্থিত হইবেন। এখন তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?"

"কি বিষয়ে পরামর্শ বলুন।"

"তাঁহার নন্দনপুরে যাওয়া উচিত কি না?"

"তাঁহার নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে তিনি যাইবেন না কেন?"

"এ কথা ঠিক, কিন্তু আপনার ইহাও মনে করা উচিত যে, এই বংশের যিনি নন্দনপুরে বাস করিয়াছেন, তাঁহারই হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, হয় ত রাজা অহিভূষণের এরূপ হঠাৎ মৃত্যু না হইলে তিনিই আমায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নন্দনপুরে

আনিতে নিষেধ করিতেন ; অথচ এখন মণিভূষণ যদি না সেখানে যান, তবে হাজার ম্যানেজার থাকিলেও তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি দেখে কে ? তিনি দেশে আসিলে দেশসুদ্ধ লোকের উপকার। আমি নিজে কিছুই স্থির করিতে পারি নাই বলিয়া, আপনার মত বিচক্ষণ লোকের পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সহজ কথায়—আমার মতে নন্দনপুরে এমন ভয়ানক কিছু একটা আছে, যাহাতে এই বংশের কেহ তথায় বাস করিলে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা।"

নলিনাক্ষ কহিলেন, "কতকটা তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ঠিক, তবে আপনার ভৌতিক ব্যাপারই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই ভূত এই সহরেও এই নূতন রাজার অনিষ্ট করিতে পারে। আপনার ভূতের ক্ষমতা যে নন্দনপুরের বাহিরে যাইতে পারে না, ইহা কখন সম্ভব নহে।"

নলিনাক্ষ কহিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, আপনি এই ব্যাপারে যদি লিপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে এরূপভাবে কথা কহিতে পারিতেন না। যাহা হউক, তাহা হইলে আপনার মতে রাজা মণিভূষণ সম্পূর্ণ নিরাপদে নন্দনপুরে যাইতে পারেন, এই আপনার পরামর্শ।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমার উপস্থিত পরামর্শ, আপনি এখন একখানা গাড়ী ভাড়া করুন—আপনার কুকুরটিকে ডাকিয়া লউন, কুকুরটা ঘরের বাহিরে থাকিয়া কবাট জোড়ার উপরে যে মহা বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার শব্দ স্পষ্ট আমি শুনিতে পাইতেছি ; আমার ইচ্ছা নয়, অসহায় কবাট জোড়াটি কুকুর মহাশয়ের দন্ত-নখরে অনর্থক ক্ষত-বিক্ষত হয়। যাক্, গাড়ীতে উঠিয়া, আপনি হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া এই নূতন রাজার সঙ্গে দেখা করুন।"

নলিনাক্ষ। তার পর ?

গোবিন্দ। তার পর—এখন আপনি তাঁহাকে কোন কথা বলিবেন না। বিশেষতঃ যতক্ষণ না আমি কিছু স্থির করিতে পারি, ততক্ষণ আপনি এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিবেন।

ন। কতক্ষণে আপনি স্থির করিতে পারিবেন ?

গো। একদিন। কাল এই সময়ে আসিবেন, সঙ্গে নূতন রাজাকে আনিলে কাজের আরও সুবিধা হইবে।

না। কাল ঠিক এই সময়ে আমি রাজাকে লইয়া আপনার এখানে উপস্থিত হইব।

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু অন্যমনস্কভাবে গমনে উদ্যত হইলেন। তিনি দরজা পর্য্যন্ত গমন করিলে গোবিন্দরাম তাঁহাকে বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আর একটা কথা, আপনি বলিলেন না যে, রাজা অহিভূষণের মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকে এই ভৌতিক কুকুর দেখিয়াছিল ?"

"হাঁ, অন্ততঃ তিনজন দেখিয়াছে।"

"তাঁহার মৃত্যুর পরে কেহ দেখিয়াছে ?"

"না, কই তাহা শুনি নাই।"

"বেশ, এখন এই পর্য্যন্ত।"

গোবিন্দরাম সন্তুষ্টচিত্তে প্রসন্নমুখে চেয়ারে ঠেসান্ দিয়া বসিলেন। কোন কিছু একটা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ সন্তুষ্ট হইতেন। আমাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি ডাক্তার, যাইতেছ ?"

আমি বলিলাম, "যদি দরকার থাকে বসি।"

তিনি বলিলেন, "না, উপস্থিত এমন কোন দরকার নাই, তবে কাজের সময়ে আমি সর্ব্বদা তোমায় চাই। যাক্, যাইবার সময়ে দোকানীকে বলিয়া যাইও, সে যেন খুব কড়া তামাক একপোয়া আমাকে এখনই পাঠাইয়া দেয়। সন্ধ্যার পর আসিও, তখন দুইজনে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম, কোন গুরুতর রহস্য হাতে আসিলে গোবিন্দরাম একাকী নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত হইতেন; এইজন্য আমি সমস্ত দিন আর তাঁহার বাড়ীতে গেলাম না; প্রায় রাত্রি আটটার সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

তাঁহার বসিবার ঘরের দরজা খুলিলে আমার মনে হইল, সে ঘরে যেন আগুন লাগিয়াছে; ঘর ধূমে এতই পূর্ণ হইয়াছে যে, আলোটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আগুনের ভয় আমার দূর হইল—অতি কড়া তামাকের গন্ধ পাইলাম। এই ধূম নাসিকায় যাওয়ায়

আমি কাসি বন্ধ রাখিতে পারিলাম না, কাসিতে লাগিলাম। সেই ধূমের অন্ধকার মধ্যে দেখিলাম, 'মূর্ত্তিমান ব্যোমের' ন্যায় আমার বন্ধুবর গোবিন্দরাম তাঁহার আরাম-কেদারায় নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। এত ধূম যে তাঁহাকে পরিষ্কার দেখা যায় না।

তিনি আমাকে কাসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি ডাক্তার, কোথায় ঠাণ্ডা লাগাইলে? সর্দ্দির কাসি নাকি?"

আমি বলিলাম, "না, তোমার চণ্ডালে গুড়ুক তামাকের ধোঁয়া।"

"ওঃ! হাঁ, তামাকটা একটু কড়া বটে।"

"একটু কড়া? একেবারে অসহ্য।"

"জানালাটা খুলিয়া দাও, তাহা হইলেই ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবে। সমস্ত দিন বাড়ীতেই ছিলে?"

"কিসে জানিলে?"

"তোমার ভাব দেখিয়া। আমি কোথায় ছিলাম মনে কর?"

"এই বাড়ীতেই।"

"না, আমি নন্দনপুরে গিয়াছিলাম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি রকম! যোগবলে?"

"হাঁ, কতকটা তাহাই বটে, আমার এই দেহখানা এই চেয়ারে পড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু আমি নন্দনপুরে গিয়াছিলাম। ইতোমধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমার এই দেহটা এই অত্যধিক কড়া তামাক প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস করিয়াছে। আমি দোষী নই, ডাক্তার।"

"ওখানা কি?"

"বীরভূমের মানচিত্র। সমস্ত দিন আমার আত্মা এই ম্যাপে—বিশেষতঃ নন্দনপুরের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।"

"ইহাতে কি, সব আছে?"

"সব। এই দেখ, এইটা নন্দনপুরের গড়——"

"চারিদিকেই মাঠ।"

"হাঁ, এই ছোট গ্রাম। খুব সম্ভব, এই গ্রামের প্রান্তে এইখানে আমাদের বন্ধু নলিনাক্ষ বাবু বাস করেন। দেখিতেছ, প্রায় দুই-তিন ক্রোশের মধ্যে আর কোন বড় গ্রাম নাই—এই মাঝামাঝি পথে একটা ছোট গ্রাম আছে, বোধ হয়, এইখানেই সদানন্দ বাবুর বাস। তাহার পর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে সুরি

সহর। ইহার মধ্যে বৃক্ষলতাশূন্য কাঁকর ও পাথরে পূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ, এই মাঠের মধ্যে জন-মানবের বাস নাই।"

"নিশ্চয়ই, বড়ই মরুর মত জায়গা।"

"নিশ্চয়ই—যদি ভূত একটু লীলাখেলা করিতে চায়——"

"তাহা হইলে তুমিও এ ব্যাপার ভৌতিক বলিয়া মনে করিতেছ?"

"ভূতের চেলাদের রক্ত-মাংসের দেহ হইতে পারে। এখন প্রথমেই দুইটা কথা উঠিতেছে; প্রথম—যথার্থই খুন হইয়াছে কিনা, দ্বিতীয়—যদি খুন হইয়া থাকে, তবে তাহা কিরূপে হইল? যদি ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবুর বিশ্বাসই ঠিক হয়, আর ভূতেই এই কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুসন্ধান এখান হইতেই শেষ হইল। তবে অন্যান্য সমস্ত দিক্ দেখিয়া যদি আর কিছু না পাই, তখন অগত্যা এই ভূতের কথায়ই বিশ্বাস করিতে হইবে। ডাক্তার, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে জানালাটা বন্ধ করিয়া দাও—ঘরের চারিদিক বন্ধ থাকিলে মনের বেশি একাগ্রতা জন্মে; তাহাই বলিয়া আমি এ পর্য্যন্ত কোন বাক্সের মধ্যে বন্ধ হইয়া মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। যাক্, তুমি এই ভূতের সম্বন্ধে মনে মনে কোন আলোচনা করিয়াছ কি?"

"আমি সমস্ত দিনই মনে মনে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি।"

"কি স্থির করিলে?"

"কিছুই স্থির করিতে পারি নাই; ব্যাপারটা বড়ই গোলযোগে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"এ ব্যাপারটায় একটু নূতনত্ব আছে, সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—রাজার পায়ের দাগের পরিবর্ত্তন। এ সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?"

"নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন যে, রাজা খানিকটা দূর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া গিয়াছিলেন।"

"আমাদের ডাক্তার বাবু কেবল আন্দাজের কথা বলিয়াছেন। কেন লোকটা এক স্থানে এভাবে যাইবে?"

"তাহা হইলে তুমি কি মনে কর?"

"ডাক্তার, লোকটা দৌড়িতেছিল, প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়িতেছিল, ভয়ে তাহার হৃদ্পিণ্ডের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল! তাহার পর পড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল।"

"কি জন্য এরূপ ভাবে পলাইতেছিল?"

"এইটাই সমস্যা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লোকটা প্রাণভয়ে দৌড়িবার পূর্ব্বে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।"

"এ কথা কিসে জানিলে ?"

"আমি অনুমান করিতেছি। তাহার ভয়ের কারণ মাঠ হইতে আসিয়াছিল ; তাহা হইলে লোকটা নিতান্ত হতবুদ্ধি না হইয়া গেলে ভয় পাইয়া বাড়ীর দিকে না ছুটিয়া অন্যদিকে ছুটিত না। তাহার পর গড়ের এই নির্জ্জন স্থানে লোকটা সেই রাত্রে কাহারও অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা না করিয়া এখানে গিয়াছিল কেন ?"

"তাহা হইলে তুমি মনে করিতেছ, এই রাজা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিল ?"

"হাঁ, লোকটার বয়স হইয়াছিল, পীড়িত, রাত্রি ঠাণ্ডা—মেঘ্‌লা, এ সময় সে কি ইচ্ছা করিয়া সেই রাত্রে এইখানে বেড়াইতে গিয়াছিল ? না, অসম্ভব। ডাক্তার নলিনাক্ষ চুরুটের ছাই দেখিয়া বুঝিয়াছে যে, লোকটা সেখানে অপেক্ষা করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহাই।"

"কিন্তু এই রাজা রোজই সন্ধ্যার পর এইরূপ বেড়াইত।"

"তাহা বলিয়া নিশ্চয়ই সে এই নির্জ্জন সাঁকোর দরজার কাছে রোজ দাঁড়াইয়া চুরুট খাইত না। বরং ডাক্তার নলিনাক্ষের নিকট জানিলাম যে, রাজা প্রাণ থাকিতে মাঠের দিকে যাইত না ; কেবল যে দিন সে দেশ ছাড়িয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, কেবল তাহারই আগের রাত্রে সে এইরূপ এইখানে অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তার, এখন কতকটা কিছু অনুমান করিবার উপায় হইতেছে। ডাক্তার, আমার সেতারাখানা একবার দাও দেখি, যতক্ষণ ডাক্তার নলিনাক্ষ আর তাঁহার সেই নূতন রাজার সঙ্গে দেখা না হয়, ততক্ষণ একটু সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা করা যাক্।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

সম্রাট হুমায়ুন।

যখন একে একে সিংহাসন রক্ষার সকল আশা ফুরাইল, যখন অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ একে একে বিদ্রোহিতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সুলতান আত্মরক্ষার জন্য অবশিষ্ট অনুচরবর্গ লইয়া পলায়নতৎপর হইলেন। জসলমির পার হইয়া সম্রাট আজমিরাধিপতি মল্লদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তখন হুমায়ুন চঞ্চলা কমলার রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন সুতরাং মল্লদেব সঙ্কল্প করিলেন হুমায়ুনকে ধরিয়া সেরসাহের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাঁহার সৈন্য মধ্যে একথা প্রচারিত হইলে, একজন সৈনিক গুপ্তভাবে আসিয়া সম্রাটকে আজমিরাধিপতির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে হুমায়ুনের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত ছিল সেই জন্য সে আপনার পুরাতন প্রভুর উপকার করিতে আসিয়াছিল।

মল্লদেবের এতাদৃশ কুচক্রের বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট সদলবলে আবার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্তমিত রবির অনাদর চির প্রসিদ্ধ। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট একজন অনুচরের নিকট একটি অশ্ব ভিক্ষা করিয়া পাইলেন না। শেষে অপর একটি সৈনিক আপনার অশ্ব দিয়া হুমায়ুনকে উপকৃত করিল।

—ফিরিস্তা।

হুমায়ুনের ভ্রাতা আস্‌কারী মির্জ্জা গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শেরসাহের নিকট বার বার পরাস্ত হইয়া যখন সম্রাট হুমায়ুন সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন, তখন তিনি নিজ ভ্রাতা আস্‌কারীর শরণাপন্ন হইবার মানসে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া গান্ধারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার সদ্যজাত শিশু আকবর ও আপনার প্রিয় মহিষী বাণু বেগম ছিলেন। ভ্রাতাকে সাহায্য না করিয়া মির্জ্জা আস্‌কারী নির্ব্বাসিত সম্রাটকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভীত হইয়া হুমায়ুন তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, শিশু আকবরকে তাহার খুল্লতাত আস্‌কারীর হস্তে রাখিয়া শিস্তানাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

পারস্যাধিপতি ভূপতি সাহ তামস্পের সাম্রাজ্যের শিস্তানে একটি পরগণা ছিল। তথাকার শাসনকর্ত্তা আহমদ্ সুলতান শমলু বড়ই দয়াদ্র্র হৃদয় ও পরার্থপর ছিলেন। সুবিশাল হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের যিনি একদিন ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন তাঁহার দুঃখে অভিভূত হইয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে শমলু পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি নিজ ব্যয়ে সম্রাটকে কতকগুলি অনুচরসহ হিরাটে পাঠাইয়া দিলেন।

হিরাটে পঁহুছিয়া হুমায়ুন সাহ তামস্পের পুত্র সাহজাদা মহম্মদ মির্জ্জার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দিনে উন্নত-হৃদয় রাজপুত্র তাঁহার প্রতি যে পরিমাণে শ্রদ্ধা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন হুমায়ুন তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানা প্রকার আমোদ উৎসবে নির্ব্বাসিত সম্রাটের হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়া সাহজাদা মহম্মদ তাঁহাকে কজবীন নগরে পাঠাইয়া দেন। তথা হইতে হুমায়ুন পারস্যের সুলতানের নিকট বিশ্বস্ত অনুচর বয়রাম খাঁকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া স্বয়ং রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় কজবীনে বাস করিতে লাগিলেন (ইং ১৫৪২ অব্দঃ)।

পারস্যাধিপতি সে সময় রাজধানী ইস্পাহানে ছিলেন না। সুতরাং নিলক প্রাসাদে বয়রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফলে হুমায়ুন রাজসম্মানে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

সাহ তামস্প হুমায়ুন সাহকে যেরূপ সৌজন্যতা সহকারে আপনার সভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু এরূপ সসম্মানে ইরাণাধিপতির আতিথ্যেও হুমায়ুনকে শক্রর রোষে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। একদিন উভয় সম্রাটে কথোপকথন করিবার সময় সাহ তামস্প জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার শক্র তো দুর্ব্বল। তাহারা কিরূপে আপনাকে বিধ্বস্ত করিল?" হুমায়ুন বলিলেন—"জাঁহাপনা, গৃহে একতা থাকিলে প্রবল শক্রও কিছু করিতে পারে না। আমার দুর্দ্দশার মূল আমার ভ্রাতৃগণের শক্রতা।"

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন সাহ তামস্পের ভ্রাতা মির্জ্জা বয়রম সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটদ্বয় তখন ভোজনে নিযুক্ত

ছিলেন। আহারান্তে প্রথানুসারে রাজকনিষ্ঠ মির্জ্জা বয়রাম সম্রাটের হস্ত প্রক্ষালনের জন্য জল লইয়া আসিলেন। হস্ত প্রক্ষালন করিতে করিতে সুলতান বলিলেন—"দেখুন জাঁহাপনা আমি কিরূপে ভ্রাতৃবর্গকে শাসনে রাখি। তাহাদের নিকট এইরূপ সেবা গ্রহণ করা রাজধর্ম্ম। আপনি যদি আপনার ভ্রাতাদিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে হিন্দুস্থানের সিংহাসন আপনার হস্তচ্যুত হইত না।" হুমায়ুনকে অগত্যা, সাহ তামস্পের বাক্য সমর্থন করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে মির্জ্জা বয়রামের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল। যেমন করিয়া হউক, নিৰ্বাসিত বন্ধুহীন বলহীন হুমায়ুনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মির্জ্জা সাহেব কৃতসংকল্প হইলেন।

মির্জ্জা বয়রামের উদ্যমে ক্রমে রাজসভায় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে একটি দল গঠিত হইল। ইহারা যথাসাধ্য তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যখনই কোনও সুযোগ পাইত তখনই ইহারা রাজসমক্ষে হুমায়ুন সাহের নিন্দা করিত, এবং সাহ তামস্প হুমায়ুনকে অর্থ ও ব্যক্তি দ্বারা সাহায্য করিব্যর প্রস্তাব করিলেই তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সুলতানের কথার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইত যে হিন্দুস্থান তৈমুরবংশাবতংশ ভূপতির শাসনাধীন থাকা পারস্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। ফলে সাহ তামস্পও হুমায়ুনের উদ্ধারের পক্ষপাতী হইলেন না।

হুমায়ুন কিন্তু আপনার শিষ্টাচারে পারস্য সভায় অনেকগুলি বিশ্বস্ত বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান রাজস্বসা সুলতানা বেগম। আপনার ভ্রাতা সাহ তামস্পের উপর সুলতানার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। সুতরাং বয়রাম যেমন হুমায়ুনের শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল, সাহজাদী তেমনি তাঁহার মিত্রতা করিতে আরম্ভ করিলেন। মানুষের দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোক যেমন ধরিতে পারে, পুরুষ সেরূপ পারে না। সুতরাং বেগম সুলতানা বুঝিলেন হুমায়ুনের সিংহাসন লাভ হইলে ভারতবর্ষে সিয়া সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে একথা সম্রাটের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে পারিলে তাঁহার বন্ধু হুমায়ুনের ভাগ্যাকাশ সমুজ্জ্বল হইবে। চতুরা রাজকুমারী হুমায়ুন "সিয়া"দিগের আরাধ্য আলিকে পূজা করিতেছেন এই মর্ম্মে একটি কবিতা লিখিয়া সাহ তামস্পকে উপহার দিলেন। ভগ্নীরচিত কবিতায় চমৎকৃত হইয়া "সুন্নি" ভূপতি হুমায়ুনকে "সিয়া"সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার

জন্য সুলতানের বাসনা হইল। সাহজাদীর সহিত পরামর্শ করিয়া সুলতান স্থির করিলেন হুমায়ুন যদি "সিয়া"মন্ত্রে দীক্ষিত হন তাহা হইলে তিনি ভারত বিজয়ের জন্য তাহাকে সাহায্য করিবেন।

মহাহর্ষে সুলতানা বেগম হুমায়ুনের নিকট এ বিষয় প্রস্তাব করিলেন। হুমায়ুন বলিলেন চিরকালই "সিয়া"ধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা আছে এবং তাঁহার ভ্রাতা-দিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের ইহাও একটি প্রধান কারণ। ফলে হুমায়ুন "সিয়া"সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া আবার সাহ তামস্পের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

পারস্যাধিপতি প্রদত্ত সেনা লইয়া যখন হুমায়ুন কাবুল রাজ্য আক্রমণ করিলেন তখন তাঁহার ভ্রাতা হিন্দল মির্জ্জা ও অপর দুই চারিজন মোগল ওমরাহ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা কাবুলাধিপতি কামরাণ কাবুল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইং ১৫৪৫ অব্দে কাবুলে প্রবেশ করিয়া হুমায়ুন আপনার প্রিয়দয়িতা বেগমকে ও তদীয় শিশুসন্তান আকবরকে দেখিতে পাইলেন। আকবরের তখন চারি বৎসর বয়ঃক্রম। বলা বাহুল্য, স্বর্গীয় কান্তি উদ্ভাসিত সুকুমার আকবরের মুখ দেখিয়া বাদসাহের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল। স্নেহের রাজ্যে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধনের সমান অবস্থা। কুমারকে ক্রোড়ে তুলিয়া বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে স্নেহবিগলিত ভাষায় হুমায়ুন বলিলেন—"আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ভ্রাতাদিগের রোষে পড়িয়া যোসেফ কূপ মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তাহার পর ভগবান তাহাকে উন্নত করিয়াছিলেন। তেমনি তাঁহার অনুকম্পায় তুইও যশোমন্দিরের শিখায় উন্নত হইবি।"

কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া কামরাণ তদানীন্তন দিল্লীর ভূপতি সেলিম সাহ সুরের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সেলিম সাহ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। হতভাগ্য কামরাণ নগরকোটের রাজপুত ভূপতির শরণাপন্ন হইলেন। সেখানেও তিনি আশ্রয় না পাইয়া শেষে পঞ্জাবের গক্কর রাজা আদম সুলতানের নিকট স্থান পাইলেন।

এই সময় (ইং ১৫৫১ খৃঃ অব্দ) কাশ্মীরে একটা বিদ্রোহ হয়। কাশ্মীরের ভূপতি মির্জ্জা হায়দার দোঘলাট হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কাবুলে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে সিন্ধু পার হইয়া হুমায়ুন হিন্দুস্থানে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিতে দেখিয়া ভীত হইয়া সুলতান আদম গক্কর কামরাণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সমস্ত মোগল সভাসদগণ একবাক্যে কামরাণের মৃত্যু কামনা করিলেন। হুমায়ুন কিন্তু ভ্রাতৃরক্তে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার আজ্ঞায় কামরাণের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করা হইল।

ইহার কিছুদিন পরে সম্রাট কারাগারে কামরাণকে দেখিতে গেলেন। অন্ধ কামরাণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"হতভাগ্যকে দেখিতে আসিলে নৃপতির কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।" ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া হুমায়ুন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন স্বাভাবিক সোদর-প্রীতি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাটের আদেশানুসারে কামরাণকে মক্কাতীর্থে প্রেরণ করা হয়। তিনি (ইং ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে) তথায় প্রাণত্যাগ করেন। কামরাণের মৃত্যুর পর আকবরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র আবুল কাশিম মির্জ্জাকে গবালিয়র দুর্গে হত্যা করা হয়।

হুমায়ুনের প্রধান সহচর, তাঁহার বিপদের সহায়, সম্পদের বন্ধু প্রসিদ্ধ বয়রাম খাঁ জাতিতে তুর্কী; বদকসানে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বল্‌খে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুমায়ুনের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া তিনি কনৌজের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। যখন কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুনের পাত্র মিত্র সকলে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করে তখন বয়রাম লক্ষ্ণৌরাধিপতি মিত্র সেনের শরণাপন্ন হয়েন। ভয়ে রাজা তাঁহাকে সের সাহের হস্তে সমর্পণ করেন। সের সাহ বয়রামের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে হুমায়ুনের পক্ষ ছাড়িতে স্বীকৃত হন নাই। নানা কৌশলে গবালিয়রের শাসনকর্ত্তা আবুল কাশিমের সহিত মিলিয়া বয়রাম পলায়ন করিলেন। পথে কিন্তু একদল সৈন্য তাহাদিগকে ধরিল। আবুল কাশেমকেই

তাহারা বয়রাম বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সাহসী বয়রাম অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমার নাম বয়রাম তোমরা আমাকে বন্দী কর।" উদারচেতা আবুল কাশেম বলিলেন—"না না, এ ব্যক্তি আমার ভৃত্য। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বয়রাম বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমিই বয়রাম।" সৈন্যগণ প্রকৃত বয়রামকে ছাড়িয়া দিয়া কাশেমকে সের সাহের নিকট লইয়া গেল এবং সের সাহ তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। বয়রাম আপনার বিপদগ্রস্ত প্রভু হুমায়ুনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে এই বয়রাম খাঁর উপরও শত্রুদের নিন্দাবাদে হুমায়ুন অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হুমায়ুন কাবুল জয় করিবার পূর্ব্বে গান্ধার জয় করেন এবং বয়রাম খাঁকে গান্ধারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইং ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে বয়রামের শত্রুপক্ষ হুমায়ুনকে বলিল, বয়রাম পারস্যাধিপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া স্বয়ং রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হুমায়ুন এ সংবাদে সসৈন্যে গান্ধার যাত্রা করিলেন। অকস্মাৎ হুমায়ুন গান্ধারে আসিতেছেন শুনিয়া, মাত্র পাঁচ ছয়টি অনুচর সমভিব্যাহারে বয়রাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবামাত্র সানন্দে তাঁহার চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। হুমায়ুন আপনার ভ্রম বুঝিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং দুই মাস কাল গান্ধারে বাস করিয়া বয়রামের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

পূর্ব্বে সুলতান বাবর সম্বন্ধে ভাগ্যপরীক্ষাবিষয়ক যে গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছি * ফিরিস্তা ঐরূপ একটি গল্প হুমায়ুন সম্বন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। শেলিম সাহ সুরের মৃত্যুর পর দিল্লি ও আগ্রার অধিবাসীদিগের পত্র পাইয়াও যখন হুমায়ুন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন তখন একজন ওমরাহ বলিলেন, ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন তাহার পর যাহা স্থির হয় সেই মত কার্য্য করিবেন। হুমায়ুন একজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহাকে, প্রথম যে তিনজন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বলিলেন। অশ্বারোহী প্রত্যা-

* অর্চ্চনা ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। হুমায়ুন সম্বন্ধে তবকাতে আকবরীতেও এ গল্পটি আছে।

বর্ত্তন করিয়া বলিল, যে তিন জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের নাম যথাক্রমে—দৌলত, মুরাদ এবং সাদত।

হুমায়ুনের মৃত্যুকাহিনী সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সান্ধ্য সমীরণ উপভোগ করিয়া যখন পুস্তকাগারের ছাদ হইতে অবতরণ করিতেছিলেন তখন রাজমস্‌জিদের মুয়াজিন প্রার্থনার সময় হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া সম্রাট সোপানোপরি উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মোয়াজিন ক্ষান্ত হইলে সোপান হইতে অবতরণ করিবার প্রয়াসে যেমন তিনি যষ্টির উপর ভর করিয়া উঠিলেন অমনি যষ্টি সরিয়া যাওয়ায় তিনি পড়িয়া গেলেন। পাঁচ দিন ভুগিয়া একান্ন বৎসর বয়সে সম্রাট ইহলীলা সম্বরণ করেন।

ফিরিস্তা বলেন হুমায়ুন অত্যধিক পরোপকারী ছিলেন এবং তাঁহার নম্রতা অসাধারণ ছিল। ভূগোল চর্চ্চা তাঁহার যথেষ্ট আদরের ছিল এবং তিনি বিদ্বানদিগের সঙ্গ বড় ভালবাসিতেন। উপাসনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল এবং স্নান না করিয়া তিনি কখনও জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ করিতেন না। কথিত আছে একদিন তিনি মির অবদুল হাইকে ডাকিবার সময় কেবল আব্দুল বলিয়া ডাকেন। আরবীতে আবেদ অর্থে দাস, উল্‌ অর্থে র, এবং হাই ভগবানের নাম। তখনও স্নান করেন নাই বলিয়া হুমায়ুন "হাই" শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, কেবল আব্দুল বলিয়াই মিরসাহেবকে সম্বোধন করিয়াছিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল।

প্রতিদান।

(১)

লাহোরের মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীদের মধ্যে দিবাকর বাবুর যেরূপ সমালোচনা হইত তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, উক্ত সমাজের তিনি একজন খুব উচ্চ দরের ব্যক্তি। অর্থে দিবাকর বাবু সমস্ত বাঙ্গালী অপেক্ষা কেন, লাহোরের অনেক পাঞ্জাবী অপেক্ষা বহুগুণ ধনী ছিলেন। কিন্তু সে কথাটা সমালোচক প্রবরদিগের মধ্যে নগণ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। তাহারা সমালোচনা

করিত দিবাকর বাবুর স্ত্রীবিদ্বেষ, ইংরাজদ্বেষিতা ও তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস গোপনের চেষ্টা। অমায়িকতায় দিবাকর বাবু অদ্বিতীয় ছিলেন, দানে তাঁহার মত উদারতা অল্প লোকই দেখাইতে পারিত। কিন্তু ইংরাজের সহিত কথা কহিবার সময় তিনি যেরূপ রূঢ়তার পরিচয় দিতেন এবং স্ত্রীলোকের নামোল্লেখে তিনি যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহাতে নানা লোকে নানা কথা মনে করিত। অথচ কেহ যদি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত তাহা হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব ধারণ করিত। কাজেই উর্ব্বর-মস্তিষ্ক লাহোর-বাসী বাঙ্গালীগণ প্রায় প্রত্যেকে এক একটা থিওরি উদ্ভাবিত করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেটাকে অপরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইবার জন্য বিশেষরূপে যত্নবান হইত। এ সকল থিওরির মধ্যে আশুঘোষের থিওরিটাই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ। সে বলিত দিবাকর বাবু বাস্তবিক অনূঢ় নহেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তবে তাঁহার স্ত্রী বোধ হয় কোনও ইংরাজের প্রণয়-ভাজন হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাই তিনি ইংরাজকে ও স্ত্রীলোককে অত ঘৃণা করেন।

অবশ্য এ কুৎসিৎ কথাটা সত্য না হইলেও আশুঘোষ একটা বিষয় ঠিক নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। দিবাকর বাবু যে নিরাশ প্রেমিক সে বিষয় কোনও সন্দেহ ছিল না। তাঁহার বেহালা যিনি শুনিয়াছেন তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে দিবাকর বাবুর সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে। সে মধুর ঝঙ্কার, সে বেহাগের মর্ম্মস্পর্শী লহরী, সে ভৈরবীর আশাময়ী ভাষা যে একটা মোলায়েম হৃদয় ব্যতীত সমুত্থিত হইতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা ব্যতীত গৃহসজ্জায়, কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে প্রতি পদে পদে বুঝিতে পারা যাইত যে বিষয়ী প্রৌঢ় দিবাকর যৌবনাবস্থায় প্রেমের অভিনয় করিয়া হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২)

ইংরাজীতে যেমন প্রবচন আছে যে রাজা কখনও মরে না, প্রকৃতপক্ষে দিবাকরের যদি কেহ আসল ইতিহাসটা জানিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে বাল্যে ও যৌবনে ইঁহারও হৃদিসিংহাসন কখনও শূন্য থাকে নাই। বস্তুতঃ বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি একে একে প্রেমে পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রথমেই একটি লাল কাঠ বোটকের প্রেম প্রায় চারি বৎসর বয়ঃক্রমে ছয় দিন ধরিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করিতে থাকে। তাঁহার

পিতা কলিকাতা হইতে তাঁহাকে একটি কাষ্ঠ ঘোটক আনিয়া দিয়াছিলেন। বালক দিবাকর নিশিদিন তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে লাগিল। প্রাতে উঠিয়াই উদ্যান হইতে ঘাস আনিয়া তাহার মুখের সম্মুখে রাখিয়া তবে সে স্বয়ং নিজের মিঠাই সন্দেশের চেষ্টায় জননীকে বিরক্ত করিত। তাহার পর সমস্ত দিন ঘোড়াকে চোখে চোখে রাখিয়া, অস্ফুট অমৃত ভাষায় দেশশুদ্ধ লোককে তাহার বিক্রম ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিয়া আপনার মস্তকের নিকট তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইত। এইরূপে ছয় দিন কাটাইয়া শেষে সপ্তম দিবসে একটি বয়োজ্যেষ্ঠ বালক জিজ্ঞাসা করিল—"দিবু তোর ঘোঁড়া সাঁতার দেয়?" গর্ব্বিত দিবাকর বলিল—"হাঁ।" তাহার পর উক্ত বালকের পরামর্শানুসারে দিবাকর তাহাকে পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যখন দেখিল ঘোড়া আর সন্তরণ দিয়া তাহার নিকট আসিল না, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া একটি বিড়াল শাবকের সহিত প্রেমপাশে বদ্ধ হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে কাকের ছানা, শালিক পাখী, সাদা ইঁদুর, জলছবি প্রভৃতির সহিত প্রগাঢ় প্রেম করিয়া শেষে দিবাকর বিদ্যালয়ের এক বালকের সহিত বিশেষ রকম প্রেম করিয়া ফেলিল। এই সময় হইতেই তাহার হৃদয়ে মধুর রস সিঞ্চিত হইল, এই সময় হইতেই সে স্থির বুঝিল যে অপর একটা হৃদয়ের সহিত না মিলাইতে পারিলে তাহার হৃদয়টা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, দুইটা হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত না হইলে, এক সুরে দুইটা হৃদয় বাঁধিতে না পারিলে, মানুষের হৃদয় জ্যোৎস্নাহীন নীলিমার মত নিরর্থক ও তমসাবৃত হইয়া উঠে।

এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া যখন দিবাকরের বন্ধুবিচ্ছেদ হইল তখন পাশ করিবার আমোদটা তাহার নিকট কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। আনন্দের সময় যদি একটা বিবাদের কারণ অহরহ হৃদয়ের মধ্যে উঁকি মারিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে আর আনন্দের চমৎকারিত্বটা থাকে কোথা? মনের সহিত অনেক বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া দিবাকর অকস্মাৎ একটি সহপাঠীর পরামর্শে একখানি বেহালা কিনিয়া তাহার কাঁ্যা কোঁ ম্যাওঁ ম্যাওঁ প্রেমসঙ্গীতে প্রাণটা ঢালিয়া দিল।

(৩)

যৌবনের দ্বারে পঁহুছিয়া দিবাকর যে মনে মনে কত কামিনীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া একে একে তাহাদিগকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে কিন্তু বি, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া যখন সে

মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিল তখন তাহার জীবনে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন হইল। সে আজ বিংশতি বৎসর পুর্ব্বের কথা, সুতরাং এখনকার মত অট্টালিকা সারি মধুপুরে তখন সৃষ্ট হয় নাই। ছোট ছোট কতকগুলি বাংলা মাত্র তখন মধুপুরে দৃষ্ট হইত।

দিবাকর যে বাংলায় থাকিত তাহার পার্শ্বের বাংলায় মুর নামক এক শ্বেতাঙ্গ বাস করিত। মধুপুরের চতুর্দ্দিকে মুরের কতকগুলি কয়লার খনি ছিল। বৃদ্ধ মুর স্বয়ং বিষয়কর্ম্ম বিশেষ কিছু দেখিত না মধুপুরে থাকিয়াই সে গুলার তত্ত্বাবধান করিত।

দিবাকর মধুপুরের বাংলার বারান্দায় বসিয়া ধুমপান করিতে করিতে যখন প্রথম যুবতী মিসেস্ মুরকে দেখিল তখন সে তাহাকে বৃদ্ধ মুরের কন্যা বলিয়া মনে করিয়াছিল। কুমারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া অবৈধ নয় ভাবিয়া দিবাকর চিত্তকে দমন করিতে পারিল না। সুতরাং বিদেশে আসিয়া যুবক বিদেশিনীর পদতলে আপনার প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি রক্ষা করিয়া রোজ রাত্রে নির্জ্জন গৃহে মর্ম্মস্পর্শী বেহাগ রাগিণী আলাপ করিত আর অবসর পাইলেই সেই লাবণ্য-ময়ীর স্নিগ্ধ রূপরাশি দর্শন করিয়া চিত্তবিনোদন করিত।

যুবতী মুরঘরণীকে ভালবাসিয়া দিবাকর যে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। যাহাকে কখনও পাইবার আশা নাই, যে পাবকের কেবল দাহিকা শক্তি আছে যাহার সঞ্জীবনী শক্তি নাই তাহার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করা, সে বহ্নিতে ভস্মীভূত হওয়া বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার নীল গভীর চক্ষু দুটি যদি আমার দিকে তাকাইয়া থাকে, আমি যেখানে তাহাকে দেখিতে পাইব সেখানে আরাম চৌকিতে বসিয়া যদি সে পুস্তক পাঠ করে, আমার দিকে ফিরিয়া মাঝে মাঝে মৃদু কটাক্ষপাত করে, আমি যখন বেহালায় সঙ্গীতালাপ করি সে যদি তালে তালে তাহার সুন্দর ক্ষুদ্র চর্ম্মাবৃত বাম চরণটি অন্য মনে নাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রেমে উন্মত্ত হইলে, তোমরা কি আমায় পাগল বলিতে পার? দিবাকর জানিত 'রোমান্সটা' ইংরাজ রমণীর রক্তের সহিত ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং নিষ্কর্ম্মা দিবাকর সেই নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া সেই সুন্দরী স্ত্রী শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুমধুর বেহালার সুরে তাহাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিতে যে চেষ্টা করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথা?

তাহার মধুপুর আসিবার দেড় মাস পরে মুর সাহেবের বাংলায় একদিন

মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ মুর সেক্ষপীর বর্ণিত সাইলকের মত হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিতেছিল আর পুলিসের দারোগা তাহার নোটবহিতে কি লিখিয়া লইতেছিল। পুলিস দেখিয়া বাংলার ময়দানের বাহিরে অনেক লোক জড় হইয়া তামাসা দেখিতেছিল। আর দিবাকরের হৃদয় গগনের সুধাংশু শুষ্কমুখে স্থির হইয়া এক কোণে দণ্ডায়মানা ছিল।

দিবাকর একবার ভাবিল এই সুযোগে সাহেবের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়া আসি। কিন্তু অযাচিতভাবে তাহাদের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা ইংরাজী নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া দিবাকর সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা জানিবার জন্য দিবাকরের বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। সে আপনার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—মুর সাহেবের বাড়িতে কিসের গোলমাল হয়েছে?

ভৃত্য বলিল—সাহেবের কতকগুলি বহুমূল্য জহরত টাকা প্রভৃতি চুরি গিয়াছে বলিয়া দারোগা সাহেব তদন্ত করিতে আসিয়াছেন।

বলা বাহুল্য এরূপ বিপদের সংবাদে প্রেমিক দিবাকরের হৃদয় দুঃখে ভরিয়া গেল। পুনরায় সে যখন প্রস্তরমূর্ত্তি সদৃশ দণ্ডায়মানা মিসেস্ মুরের রক্তহীন মুখখানি দেখিল তখন দিবাকরের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস সমুত্থিত হইল! যে প্রেমে সহানুভূতি নাই সে প্রেম প্রেম নামেরই যোগ্য নহে।

(৪)

ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে দিনমণি মুখ লুকাইতেছিলেন। সান্ধ্য সমীরণ দক্ষিণ দিক হইতে সুসংবাদ আনিয়া বরাস ফুলগুলিকে হাসাইতেছিল, আনন্দের স্ফুরণে দুই একটা পাপড়ি খসিয়া তৃণাসনে উপবিষ্ট প্রেমিক প্রেমিকার উপর পতিত হইতেছিল। দোয়েল কুলায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাণ ভরিয়া একবার গাহিয়া লইতেছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে কালো কোকিল কণ্ঠের লুকায়িত সুধা বায়ুবক্ষে ঢালিয়া দিতেছিল।

মিসেস্ মুর বলিল—না ফ্লোরেন্স আর আমি পারিব না। এবার বৃদ্ধ আমায় সন্দেহ করিয়াছে। ওখানে বাস করা আমার পক্ষে যে কিরূপ অসুবিধাজনক হইয়াছে তাহা কি বলিব। বৃদ্ধ কতদিনে মরিবে তাহা জানি না।

যে যুবকটির সহিত মিসেস্ মুর বাক্যালাপ করিতেছিল তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হইবে। দিব্য কর্ম্মঠ বপু, যৌবনের কান্তিতে ফ্লোরেন্স হিলের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। হিল্ মিসেস্ মুরের খুল্লতাত পুত্র, অর্থাভাব

প্রযুক্ত ভগ্নী ক্লারার পাণিগ্রহণ করিতে পারে নাই। অর্থবান বৃদ্ধ মুরকে যুবতী ক্লারা বিবাহ করিয়াও কিন্তু ফ্লোরেন্সের প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা নিভৃতে মিলিত হইত। বৃদ্ধ ইহার কিছুই জানিত না।

হিল্ বলিল—ক্লারা, এবার না দয়া করিলে আমায় অত্যন্ত অবমানিত হইতে হইবে। তুমি সেদিন যাহা দিয়াছিলে তাহা সমস্ত গিয়াছে। অন্ততঃ একশত টাকা না দিতে পারিলে মান ইজ্জত বজায় রাখা অসম্ভব।

ক্লারা বলিল—ছিঃ ফ্লোরেন্স জুয়াখেলা বন্ধ করিতে পার না। এবার কৃপণ বৃদ্ধ ঠিক ধরিবে।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল এবার শেষ একশত টাকা দিয়া ক্লারা ফ্লোরেন্সকে উপকৃত করিবে।

(৫)

উক্ত ঘটনার তিন চারি দিন পরে দিবাকর বাংলার পশ্চাতের ময়দানে প্রাতঃ সমীরণ উপভোগ করিতেছিল। পরদিন মুর সাহেব খনি তদারক করিবার জন্য মফঃস্বল গিয়াছিল। সুতরাং কতকগুলা কুকুর লইয়া মিসেস্ মুর একেলা পদচারণা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার নীল নয়নের দুই একটা কটাক্ষে দিবাকরের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি আলোড়িত করিয়া দিতেছিল।

একটা ছোট কুকুর দিবাকরকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মেমসাহেব বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্থির হইতে বলিল। তখন দিবাকর ও ক্লারার মধ্যে পাঁচ ছয় গজের ব্যবধান। দিবাকর ভাবিল এই সুযোগ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। অতি মোলায়েম ভাবে বিনয় সহকারে যুবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"Thank you, madam."

যুবতী হাসিল, দিবাকরের বাগানের মধ্যে আসিয়া তাহার গোলাপের সুখ্যাতি করিল, কৃতার্থ যুবক তাড়াতাড়ি কতকগুলা ফুল কাটিয়া মেম সাহেবকে উপহার দিল। যুবতী তাহাকে ধন্যবাদ দিল, মাথা মুণ্ডু নানা কথা কহিয়া শেষে বলিল—"আমার স্বামীর অন্তঃকরণ বড় সন্দেহযুক্ত। তাহা না হইলে আপনার মত প্রতিবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুখী হইতাম।" নির্ব্বোধ দিবাকর স্বর্গ হাতে পাইল। তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে এইরূপ আশা দিয়া মুরপত্নী বিদায় গ্রহণ করিল।

উক্ত ঘটনার সাতদিন পরে মিসেস মুর দিবাকরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ

করিয়া তাহাকে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। সে দিন বৃদ্ধ বাটী ছিল না তাই ক্লারা শিষ্টাচার দেখাইয়া বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিল, দিবাকর এইরূপ বুঝিল।

(৬)

নানা প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। একটি মাত্র ভৃত্য তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেছিল। দিবাকর জীবনে এরূপ সুখ কখনও উপভোগ করে নাই। প্রগল্‌ভ ক্লারা নানা কথায় তাহাকে তুষ্ট করিতেছিল আর তাহার রাত্রির শয্যার পোষাকে যুবতীর রূপ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ক্লারা হাসিয়া বলিল—বাবু আপনি তো জমিদার। আমাকে এই বৃদ্ধের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আমায় কোথাও লইয়া চলুন।

দিবাকর চিন্তিত হইয়া বলিল—তাহা কি হয় মেম সাহেব ?

মেম সাহেব বলিল—বাবু অর্থে কিছু সুখ নাই।

ঠিক্ এই সময় বাহিরের পথে অশ্ব পদ শব্দ শ্রুত হইল। বিস্মিত হইয়া ক্লারা বলিল—বাবু সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বোধ হয় সাহেব আসিতেছেন।

ভীত দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্লারা বলিল "কিছু ভয় নাই আমার সহিত আসুন।" বিস্মিত দিবাকর অন্ধকার অলিন্দের উপর দিয়া পার্শ্বস্থিত একটি ঘরের সম্মুখে আসিল। একটি চাবি বাহির করিয়া ক্লারা গৃহের দ্বার খুলিল। তাহার পর তাহাকে সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া তাহার হস্তে সেই চাবির থোকাটি দিয়া বলিল—"বাবু এই গৃহে বসিয়া থাকুন। যখন সমস্ত নিস্তব্ধ হইবে গৃহে চাবি দিয়া চলিয়া যাইবেন। এ গৃহে আমার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি থাকে।"

স্তব্ধ দিবাকর চাবি লইয়া অন্ধকার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী বলিল—বাবু আর এক কথা আমার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়কটি হস্ত হইতে খুলিবেন না।

অঙ্গুরীয়ক পাইয়া দিবাকর প্রেমে অভিভূত হইল। বহুদিনের পরিচিতের মত ক্লারাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গৃহ মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

অভ্যাস বশতঃ বাংলায় আসিয়াই মুর সাহেব আপনার ভাণ্ডার গৃহের দ্বারে

আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ভাবিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? পকেটে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া দেখিল গৃহের চাবি তথায় রহিয়াছে অথচ গৃহের দরজায় রুদ্ধ তালা, কে খুলিল বৃদ্ধ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি দীপ জ্বালিয়া মুর দরজা খুলিলেন এবং তাহার চিরজীবনের পরিশ্রমের ফল, তাহার হৃদয়ের প্রিয়তম সামগ্রী গুলির নিকট একটি অপরিচিত কালা আদমীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীত মুর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের সহিত কালীপাহাড়ী হইতে হেউড্ নামক তাহার একটি বন্ধু আসিয়াছিল। মুরের চীৎকারে হেউড্ ও ভৃত্যাদি অচিরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, ভয়ে, লজ্জায়, বিস্ময়ে দিবাকর কিংকর্ত্তব্য হইয়া গিয়াছিল। যখন তাহার প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া গেল তখন সে বুঝিল আপাততঃ তাহার প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে পলায়ন করা। সুতরাং বৃদ্ধের চীৎকার শুনিবা মাত্রই সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছুটিবার প্রয়াস করিল। কিন্তু হেউড্ আসিবা মাত্র দিবাকরকে বন্দী হইতে হইল।

তখন মুর সাহেবের বাংলায় মস্ত একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। সেই গোলমালের মধ্যে ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ক্লারা আসিয়া বলিল—যোসেফ্ প্রিয়তম কখন গৃহে আসিলে, এ সব কিসের গোলমাল?

মুর বলিল—প্রিয়তমে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন এখনি আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। ভাণ্ডার গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছিল।

হতভাগ্য দিবাকর অনিমেষ দৃষ্টিতে ক্লারার দিকে চাহিয়া ছিল। মুরের কথা শুনিয়া ক্লারা অর্দ্ধস্ফুট একটি ভীতির শব্দ করিল।

হেউড্ বলিল—মুর এ ব্যক্তির হস্তে এ অঙ্গুরীয়ক কাহার?

মুর বলিল—হা ভগবান্। এ যে আমার বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়ক। আমার বাক্সের মধ্যে ছিল। তবে তো হতভাগ্য আমার অন্যান্য দ্রব্যও চুরি করিয়াছে।

তখন হেউড্ সাহেব দিবাকরের পকেটাদি খানাতল্লাসী করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পকেট হইতে ক্লারা প্রদত্ত চাবির থোকা বাহির হইল।

বৃদ্ধ শিরে করাঘাত করিয়া বলিল—Great Heavens! this is a bunch of duplicate keys.

সকলেই বিস্ময়ে দিবাকরের মুখের প্রতি চাহিল। একজন ভৃত্য বলিল—হুজুর ইএ বাবু তো বগলকা বাঙ্গালামে কোই মাহিনা ভোর আয়া হোগা।

তখন বৃদ্ধের একটা বড় জটিল রহস্যের অর্থবোধ হইল। এখন সে বুঝিল কে মাঝে মাঝে তাহার অর্থাদি অপহরণ করে। এই কৃষ্ণকায় বর্ব্বরটা ভদ্র বেশে পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছিল। তাহার উপর ভগবানের অপার করুণা না থাকিলে কি আর আজ এ চোর ধরা পড়িত।

ক্লারা বলিল—যোসেফ্ আমি একটা গোলযোগ করিতে চাহি না। কিন্তু এখন বুঝিতেছ তোমার ব্যবহার কত নীচ। এই নিগারটা তোমার অর্থ চুরি করিত আর তুমি আমাকে, তোমার নিজের স্ত্রীকে, তোমার আপনার ভালবাসার—

বৃদ্ধ তাহাকে আর কোনও কথা বলিতে দিল না। তাহার চম্পকসদৃশ অঙ্গুলি গুলি চুম্বন করিয়া বলিল—ক্লারা, প্রিয়তমে, আমায় ক্ষমা কর।

আর হতভাগ্য দিবাকর? দিবাকর মনে মনে বলিতেছিল—ওঃ! পিশাচি, ওঃ! শয়তানি তাই তোমার এত ভালবাসা, ছিঃ ছিঃ পৃথিবীটা এত কঠিন, ইহার স্বর্গীয় লাবণ্যভরা মূর্ত্তিটা এত নারকী ভাবে পূর্ণ! এই ইংরাজ মহিলা! এই তাহাদের সভ্যতা!

সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। কেবল নাজির খাঁ নামক যে ভৃত্যটি সন্ধ্যা হইতে তাহাদিগকে পরিচর্য্যা করিতেছিল, সে এক একবার সকরুণ দৃষ্টিতে দিবাকরের প্রতি চাহিতেছিল। ক্রমশঃ।

শ্রী কেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

ভগ্নপ্রাণ।

বলো না বলো না আর, আছে বিশ্বে ভগবান!
দুর্ব্বলের গতি সেই করে তাঁ'রে পরিত্রাণ।
বলো না ধরম যেথা, জয় সেথা চিরদিন;
অধর্ম্মে হতেছে ক্ষীণ শোক, দৈন্যে অতি দীন।
এ বিশ্বে আমিত' দেখি সবলের ভগবান;—
অত্যাচার করে যেই, প্রতি পদে তা'র মান।
মুখের গরাস্ যেই কেড়ে লয় দুর্ব্বলের,
হেথায় তাহারি জয়, রাজা সেই সকলের।
এ বিশ্বে আমিত' দেখি ধর্ম্মে যার মন প্রাণ,
পলে পলে সর্ব্বনাশ হয় তার অপমান।
হেথায় নাহিক যুক্তি, নাহি ন্যায় নাই ধর্ম্ম—
লীলা যদি এই তার—কিবা তবে এর মর্ম্ম।
এই যদি লীলা তার যার নাম ভগবান;
কহিব কাহারে তবে প্রাণহীন সয়তান্?
সয়তানি হেথা শুধু, নাহি প্রেম প্রতিদান—
দুর্ব্বলেরে মৃত্যু যেথা দেয় শান্তি হরি' প্রাণ;
পাপ পুণ্য মিথ্যা যেথা সেই বিশ্ব কেন আর—

হয়ে যাক লয় তার, হোক্ তাহা ছারখার।
কঠিন বজ্রের ঘায় হোক ইহা চুরমার,
মনস্কাম সিদ্ধ হোক সয়তান বিধাতার!
ঘুচে যাক্ এ সংসার, দুর্ব্বল-পীড়ন হেথা!
শেষ হোক সয়তানী বিধাতা নাহিক যেথা!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

অশ্রু।

অশ্রু কেন নয়নে আমার;
বিরহে বিয়োগে প্রাণ, হ'ল অর্দ্ধ অবসান,
চণ্ডালিনী প্রকৃতির নৃত্য বারবার
হতেছে এ বক্ষপরি; দিবস রজনী ধরি,
মুহূর্ত্তে ভ্রুক্ষেপ তায় নাহি বিধাতার;
অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে, ধরিলাম বক্ষপাতে,
কলিজা ভাঙ্গিয়ে গেল অস্থি চুরমার;
শূন্য মোর হইল সংসার,
কোথা তথা ছিলে অশ্রুধার!

অশ্রুর যে আদি অন্ত নাই,
(মরে কবি অশ্রুগীতি গাই',)
আমি ফিরি ফিরি চাই, অশ্রু খুঁজি অশ্রু নাই
নিদাঘ-বিশুষ্ক প্রাণ সরসীর মত;
কত বর্ষ মাস ধরি, শ্মশানে ঘুরিয়ে মরি,
দেখিলাম ভস্মীভূত স্বর্ণতনু শত;
উপেক্ষা সহিয়া ঘোর, শতধা হৃদয় মোর
গুমরি পরাণ কাঁদে যাতনায় কত;
অবাকেতে উন্মাদ আকার,
চক্ষে তবু নাহি অশ্রুধার।

আছে অশ্রু;—অশ্রু দেখি ভাই,
কমল আঁখিতে ঝ'রে, কোমল বুকের 'পরে
গড়ায় যেতেছে অশ্রু সাগর বহাই';
হতাশ জীবন ভারে, অন্তিমের অন্ধকারে
যুগরুদ্ধ অশ্রু আসে জগৎ ভাসাই'।

আমি দেখি চেয়ে চেয়ে, আসে যে সতত ধেয়ে
অশ্রুর মুকুতামালা ধরাবক্ষ ছাই'
ঊর্দ্ধনাভ কাঁদের প্রকার,
জীব চক্ষে ঝক্ষে অশ্রুধার।

অশ্রু কি সুলভ বিশ্বমাঝে?
পাগল হাসিয়ে সারা, চক্ষে বহে অশ্রুধারা
ওই যে আগত অশ্রু জীবনের কাজে;
সারানিশি দিনমানে, কি ব্যথা টানিয়ে আনে
অশ্রুর শোণিতস্রোত দুঃখ মর্ম্ম মাঝে;
কারে কি বুঝাব বল, ক্ষীণ বক্ষ হীন বল;
বিরহবিধুর অশ্রু বুকে কিবা বাজে;
তাই যে সুধাই বারেবার?
অশ্রু কেন নয়নে আমার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

নিদ্রিতা দময়ন্তী।

প্রখর রবির কর বরষা আসার
পারেনি পীড়িতে কভু মরম তোমার—
ভয়াকর কত রব কানন মাঝার
পাতিয়াছ উপাদানে নির্ভয় অন্তর
যাপিয়াছ কত নিশি। কান্ত কলেবর
বদন নলিনি তবু মরি কি সুন্দর
যেন তৃপ্তিময়ী হৃদয়ের মুকুর তোমার
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে স্বর্গ সুধাধার।
জাননা নিদ্রিতা সতি! কি বজ্র কঠিন
চুপি চুপি হানিতেছে তব শিরোপরি
নল আজি পাষাণহৃদয়। মর্ম্মভেদীবীণ
এখনি বাজিবে সুরে সুনিদ্রা পাশরি
যখনি হেরিবে বালা শূন্য চারিধার
পতি নাই, হৃদি নাই, পূর্ণ হাহাকার।

শ্রীউমাচরণ ধর।

পারিজাত-গন্ধী মনোমদ কুন্তলবৃষ্য তৈল।
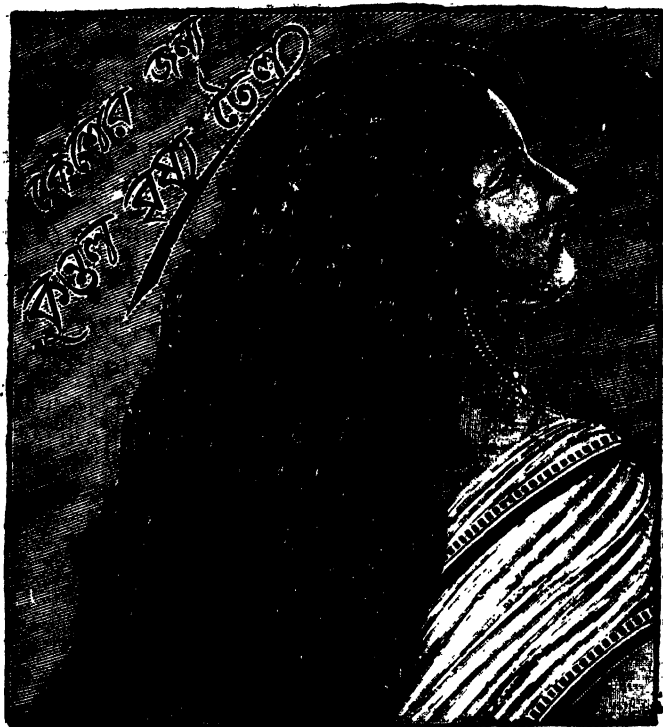
মনে রাখিবেন—কেশের জন্যই "কুন্তলবৃষ্য"।

কারণ :—ইহা মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ ও সবল করে।

কারণ :—ইহা ললনার বেণীরচনার সোহাগের সামগ্রী।

কারণ :—ইহা কেশবৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

কারণ :—ইহা অধ্যয়নশীল ছাত্রদের পরম বন্ধু।

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন ও কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

৩।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

৫ম বর্ষ।] আষাঢ়, [illegible]। [৫ম সংখ্যা।

June [illegible]

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

"অর্চনা কার্য্যালয়" ১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চনা পোষ্ট অফিস হইতে বঙ্গীয়-সাধনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র [ডাঃ মাঃ লাগে না।

অর্চনা, ৪ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

শেরসাহ স্থর।

মোগল সম্রাট হুমায়ূনকে পরাস্ত করিয়া যে রাজবংশ কয়েক বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে পাঠান-কেতন উড্ডীন করিয়াছিল তাহা স্থরবংশ নামে বিখ্যাত। এই স্থরেরা পেশোয়ারের রোহ্ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী। কথিত আছে আফ্‌গানিস্থানের প্রসিদ্ধ ঘোরবংশসম্ভূত মহম্মদ স্থর নামক এক ব্যক্তি আসিয়া রোহ্ নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া এই বংশ স্থরবংশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

শেরসাহের পিতামহ ইব্রাহিম বেহ্‌লুল লোডীর একজন ওম্‌রাহের নিকট কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতা হোসেন শশরাম ও তণ্ডা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। হোসেনের দুই পুত্র ফরিদ ওরফে শেরসাহ এবং নিজাম খাঁ। ইহা ব্যতীত হোসেনের ছয়টি জারজ পুত্র ছিল।

পরিণত বয়সে শেরসাহকে যেরূপ আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হইয়াছিল এবং যেরূপ সাহস ও পরাক্রম দ্বারা তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এই সময়ের জন্য শৈশব হইতেই তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র দোষ জন্য বালক ফরিদ পিতাকে ছাড়িয়া জোনপুরে পলাইয়া গিয়া নিজ উদ্যমে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। হোসেন পুত্রের নিকট দূত পাঠাইলে ফরিদ বলিল— "শশ্‌রাম অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষার জন্য জোনপুর শ্রেষ্ঠ স্থল"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভীষণ যোদ্ধা, পরাক্রান্ত বীর তরুণ বয়সে কেবল কবিতা চর্চ্চা করিত! সুপ্রসিদ্ধ কবি সাদির সমস্ত কবিতা তাহার কণ্ঠস্থ ছিল।

কিছুদিন পরে পিতাপুত্রে সখ্য সংস্থাপিত হইবার পর হোসেন ফরিদের হস্তে আপনার জায়গীরের শাসনভার অর্পণ করেন। সেই সময় ফরিদ যাহা বলিয়াছিলেন

তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যপথ সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রত্যেক শাসনের ভিত্তি ন্যায়বিচার। এবং যাহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া বা সবলকে দুর্ব্বলের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে দিয়া ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুত হইতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

আপন পিতার জীবদ্দশায় ফরিদের কষ্ট-কাহিনী এই স্থলেই শেষ হয় নাই। পিতৃ জায়গীর পাইয়াও হোসেন খাঁর বিলাস বনিতাদের রোষে পড়িয়া তাঁহাকে বিহার পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। শেষে ফরিদ শশরাম উদ্ধার করিয়া বেহারের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ সাহের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। —ফিরিস্তা।

দিল্লী সিংহাসন পাঠান হস্তবিচ্যুত হইয়া যখন মোগল অধিকার ভুক্ত হইল তখন মহম্মদ সাহ বেহারে রাজউপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। ফরিদ খাঁ মহম্মদ সাহের প্রিয়পাত্র হইল। একদিন ফরিদ মহম্মদ সাহের সহিত বনমধ্যে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। একটা বন্য শার্দ্দূল ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগের উপর লম্ফ প্রদান করিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ওমরাহ সেই বিপদের সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি ফরিদ খাঁ প্রভূত বিক্রমে সেই শার্দ্দূলটার প্রাণবধ করিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইল শেরসাহ।

জোনপুরের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁর রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া শেরসাহ পুনরায় জায়গীরচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার পর মোগলদিগের সাহায্যে তিনি আবার শশ্‌রাম অধিকার করেন। এই সময় আপনার পুরাতন শত্রু মহম্মদ খাঁর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া শেরসাহ অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইহার পর শেরসাহ আগ্রায় গিয়া সুলতান বাবরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি মোগল সেনাবল সম্যকরূপে অবলোকন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় বলিয়া বেড়াইতেন—"যদি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে হিন্দুস্থান হইতে নিশ্চয়ই আমি মোগলগণকে

দূরীভূত করিব।" শেরসাহের এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত।

একদিন সুলতান বাবরের সহিত একত্রে ভোজন করিবার সময় শেরসাহ দেখিলেন তাঁহার পাত্রে একটি কঠিন আহার্য্য রহিয়াছে। শেরসাহ পূর্ব্বে সে খাদ্য কখনও আহার করেন নাই। সুতরাং আপনার ছুরিকা বাহির করিয়া সেই কঠিন আহার্য্যকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া শেষে চামচ সাহায্যে সেগুলিকে উদরসাৎ করিলেন। বাবর শেরসাহের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া আপন উজীর খলিফাকে বলিলেন—"উজির সাহেব, এই পাঠানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এ বড় বুদ্ধিমান।" মন্ত্রী মহাশয় শেরসাহকে ভালবাসিতেন। সুতরাং তিনি বলিলেন—"না সাহানসাহ, শেরসাহের স্বভাব মন্দ নহে।" সম্রাট বলিলেন—"মন্ত্রিবর আমি ইহাপেক্ষা অনেক প্রতাপবান আফগান দেখিয়াছি; কিন্তু প্রথম হইতেই ইহার চরিত্র আমার হৃদয়কে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছে এমন কোনও আফগানের চরিত্র করে নাই। ইহাতে আমি মহত্ত্বের ও পরাক্রমের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি, এবং ইহার ললাটে রাজচিহ্ন দেখিতেছি।" উজীর সাহেব বলিলেন—"জাঁহাপনা এ ব্যক্তি নগণ্য। তাহার উপর শেরসাহ এখন আমাদের অতিথি। সুতরাং বিনা কারণে যদি উহাকে কারারুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমাদের নিন্দা হইবে এবং আফগানগণ বিদ্রোহিতাচরণ করিবে।"

চতুর শেরসাহ দেখিলেন সম্রাট তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কি একটা পরামর্শ করিয়াছেন। নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিপদ উপস্থিত, সম্রাট আমার উপর সন্দেহপরায়ণ হইয়াছেন। সুতরাং এস্থলে আর অধিকক্ষণ থাকিলে আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।" তখনই সাজসজ্জা করিয়া সদলবলে শেরসাহ বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

—তারিখি শেরসাহি।

সাহস ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় হইলেও শেরসাহ সময়ে সময়ে চাতুরী দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। বাঙ্গালায় মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তিনি দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীপুত্র পরিবারকে কোনও নিরাপদ স্থলে না রাখিতে

পারিলে তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইবেন না। রোটাস দুর্গ সে সময় বড় নিরাপদ স্থান ছিল। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অধিষ্ঠিত প্রায় পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত রোটাস দুর্গে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যাইত। সুতরাং বুদ্ধিমান শেরসাহ লোভলোলুপদৃষ্টিতে রোটাস দুর্গের প্রতি চাহিলেন।

শেরসাহ দেখিলেন যুদ্ধ করিয়া রোটাস জয় করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। মিছামিছি বলক্ষয় না করিয়া তিনি কৌশলে দুর্গাধিকার করিবার বাসনায় রোটাসাধিপতি রাজা হরিকৃষ্ণ রায়ের নিকট দূত পাঠাইলেন। রাজা বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দূত বলিল—"মহারাজ! অধীন শেরসাহ আপনাকে পুরাতন বন্ধুত্ব স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই বিপন্ন। নিজের জন্য তিনি আপনার দ্বারস্থ হয়েন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিকে আপনার নিকট রাখিয়া এবং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন।"

রাজা হরিকৃষ্ণ বলিলেন—ইহাতে আমার লাভ কি? মিছামিছি মোগলের সহিত বিবাদ করিবার আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

দূত বলিল—মহারাজ যদি শেরসাহ রণে জয়ী হন তাহা হইলে তিনি আপনার উপকার বিস্মৃত হইবেন না। আর যদি লুপ্ত পাঠান গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া তিনি কালের অসীম পয়োধিতে তৃণের মত ভাসিয়া যান তাহা হইলে এ সকলই আপনার। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার স্বজাতির চিরশত্রু মোগল অপেক্ষা তাঁহার ধনাদি প্রাপ্ত হইবার মহারাজ অধিক উপযোগী।

দূতের বাগ্মীতায় সরল রাজা ভুলিয়া গেলেন। মহারাজের মন্ত্রী ব্রাহ্মণ চূড়ামণ গোপনে শেরসাহকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনিও মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। আর বিপন্ন বন্ধুর স্ত্রীপুত্রাদিকে আশ্রয় দিতে কোন্ হিন্দুই বা অসম্মত হইতে পারে? হরিকৃষ্ণ রায় শেরসাহের স্ত্রীপুত্রাদিকে রোটাস দুর্গে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন।

উন্মুক্ত দুর্গদ্বার দিয়া রোটাস দুর্গে সারি সারি শিবিকা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। রাজভৃত্যেরা প্রথম দুই একখানি শিবিকার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল বাস্তবিকই তন্মধ্যে বৃদ্ধা পরিচারিকা রহিয়াছে। সুতরাং শিবিকাগুলি দুর্গমধ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিল। তাহার পর শেরসাহের সঞ্চিত অর্থ আসিতে আরম্ভ করিল। একটি দুইটি তিনটি করিয়া পাঁচ শত দৃঢ়কায় ভারবাহক হস্তে এক একটি যষ্টি ও পৃষ্ঠে এক একটি থলিয়া।

যখন শিবির ও গাঁঠরী সমস্তগুলি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন অকস্মাৎ শিবিকার ভিতর হইতে এক একটি সশস্ত্র যোদ্ধা বাহির হইল আর সেই বলিষ্ঠ গাঁঠরি বাহকগুলি আপনাপন গাঁঠরি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে গুলি বাহির করিয়া বিস্মিত দুর্গরক্ষকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ফিরিস্তা বলেন "তখন হিংস্র শার্দ্দূলগণ মেষদিগের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের বাসস্থান রক্ত দ্বারা চিত্রিত করিয়া দিয়াছিল।"

শিবির জয় হইলে স্বয়ং শেরসাহ আসিয়া তাহা অধিকার করিলেন এবং রাজা হরিকৃষ্ণ রায় মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপ সন্ধিভঙ্গের উদাহরণ শেরসাহের জীবনে আরও দৃষ্ট হয়। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সুলতান শেরসাহ সংবাদ পাইলেন যে মালবের রয়সন দুর্গে পুরণমল্ল প্রায় দুই সহস্র বারবিলাসিনী লইয়া বাস করিতেছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেক রমণী মুসলমানী। শেরসাহ রয়সন দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহার সহিত পুরণমল্লের সন্ধি হইল যে তিনি আপনার অনুচরবর্গ আত্মীয় স্বজন লইয়া দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এবং শেরসাহ তাহাদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণ বধ করিবেন না। রয়সানের যোদ্ধাগণ একে একে দুর্গ ছাড়িয়া বাহির হইতে লাগিল। কতকগুলা মুসলমানী গণিকা পাঠানদিগের নিকট অভিযোগ করিল যে, দুর্গ মধ্যে পুরণমল্ল তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিয়াছেন। ইহাদের প্রতিহিংসার প্রার্থনায় কতকগুলি মুসলমানের বীর হৃদয়ে দয়া হইল। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। তখন রফিউদ্দিন সফি নামক একজন বিদ্বান মৌলভী বলিলেন—"কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অবিধেয় নয়।" তাহা শুনিয়া শেরসাহ পুরণমল্লের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। ফেরিস্তা বলেন—"এই বীর সেনাবৃন্দ এরূপ বিক্রমে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে রস্তম ও ইস্‌ফন্দিয়রের কার্য্যকলাপ শিশুর ক্রীড়া মাত্র বলিয়া মনে হয়।" যে অবধি একজন রাজপুত জীবিত ছিল সেই অবধি যুদ্ধ চলিয়াছিল।

রাজপুত বীর মল্লদেবের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় শেরসাহ অপর একটি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। রাজপুতানার রাজন্যবর্গের প্রতি মল্লদেবের

অত্যন্ত প্রভাব ছিল। শেরসাহ বুঝিলেন যদি ইহাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটাইয়া না দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার রাজপুতানা জয়ের আশা সফল হইবে না। এই উদ্দেশে শেরসাহ কতকগুলি পত্র জাল করিলেন। সেগুলি যেন মল্লদেবের সেনানায়ক ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ দ্বারা শেরসাহকে লিখিত হইয়াছে। হিন্দি ভাষায় উক্ত পত্রে লিখিত ছিল—"বাধ্য হইয়াই আমরা রাজা মল্লদেবের অধীনে আপনার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অন্তরে আমরা কেহই মল্লদেবের বন্ধু নহি, সকলেই তাঁহার শত্রু। তাঁহার নিকট পরাজয়ের অবমাননা আমাদের সকলের হৃদয়ে জাগরিত। যদি আপনি আমাদিগের হৃতরাজ্য মহারাজের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে প্রদান করেন তাহা হইলে আমাদিগের জীবন আপনার কার্য্যে উৎসর্গ করিব।" এই পত্রগুলির উপর পারস্যে শেরসাহ লিখিলেন—"ভয় করিওনা, অধ্যবসায় করিও। স্থির জানিও তোমাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

যাহাতে পত্রগুলা মল্লদেবের হস্তে পড়ে এইরূপ ভাবে সেগুলিকে শেরসাহ বিকীর্ণ করিলেন। পত্র পাইয়া বীর মল্লদেবের বুদ্ধিভ্রম হইল। আর তিনি সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সেনানায়কগণ তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে মল্লদেবের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি সমস্ত সেনাকে পশ্চাৎপদ হইবার আজ্ঞা দিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

রাণা প্রতাপ।

চতুর্থ দৃশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আক। মম এ ধারণা
যোগ্য মন্ত্রী নাহি বুঝি তাঁর
স্বজাতির প্রতি তাঁর দ্বেষ সেই হেতু!
অতি বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ হে তোমরা সকলে,

শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝি জ্ঞান। সম্রাট সম্মান,
শুনিয়াছি গীতার প্রচার
বিষ্ণু যিনি হিন্দুর ঈশ্বর
নর মাঝে নরপতি তিনি
সেই ধর্ম্ম মতে করি সম্রাট সম্মান
শাস্ত্র আজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখেছ তোমা সবে।
কিন্তু একি, মিবার-ঈশ্বর
দৃঢ় তাঁর পণ—
করিতে বর্জ্জন আত্মীয় স্বজনগণে।
অশাস্ত্রীয় মন্ত্রণা চালিত
কন তিনি—
বাদ্‌সার সনে, কুটুম্বিতা করিয়া স্থাপন,
পতিত তোমরা সবে।
নাহি বুঝি কেমন মন্ত্রণা
অশাস্ত্রীয় ঘৃণা—
হৃদ্‌-বন্ধু বাদ্‌সার তোমা সবে,
হেন ঘৃণা উচিত নহে তো তাঁর কভু!

মান।　কহ বন্ধুগণ
অপমান নীরবে কি সহিব সকলে?

২য়।　কিবা আজ্ঞা বাদ্‌সার?
করি ঘৃণা আমা সবাকারে,
করেছেন অবজ্ঞা স্বয়ং বাদ্‌সারে।

আক।　তাহা নাহি গণি,
শুন বন্ধুগণ আছিল মনন,
আক্রমণ মিবার না করিব কদাপি
আছিল উদয়সিংহ পিতার বিদ্বেষী।
দুঃসময় যখন পিতার
তাঁরে বন্দী করিবার করেছিল আয়োজন যেই মানদেব,
সেই পিতৃ অরাতি আমার
পেয়েছিল স্থান সে মিবারে

ক্রোধে ধ্বংস করিলাম চিতোর নগরী।
উন্মুখ যৌবন—
মহা রোষে করি বহু ক্ষত্রিয় নিধন
উপজিল অনুতাপ তাহে,
সেই হেতু ভাবিতাম মনে
রাণা রাজ্য আক্রমণ নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু এবে হে অমাত্যগণ,
অপমান তোমা সবাকার
অনুতাপ নাহি মম আর,
এই মাত্র কহিলাম অম্বর অধীপে,
হ'বে বাহিনী সজ্জিত অচিরাৎ
ভাণ্ডার রহিবে মুক্ত দ্বার
প্রতিবিধিৎসার সাধ হয় যদি তোমা সবাকার।
কিবা ইচ্ছা জানাইও প্রাতে,
সোলাপুর বিজয়ে আনন্দ করো সবে,
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন,
রাজোদ্যানে হোক আজি উৎসব ধ্বনিত,
সে উৎসবে আপনি মিলিব,
নরোজা বাজার হতে ফিরি।
চিরপ্রথা বাদ্‌সার জানতো সকলে
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে
হয় মম বাজারে গমন,
এসো বন্ধুগণ হব আমি সুসজ্জিত।
রাজা মান,
ভগ্নি তব দরশন প্রতীক্ষায়,
যাও অন্তঃপুরে।

[আকবর ও মানসিংহের প্রস্থান]।

১ম রাজা। মিথ্যা ইহা নয়
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা নিশ্চয়।

শাস্ত্রে কয় রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে,—
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে,
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার অধীপ,
সমধর্ম্মী মোসবার কভু তিনি নন,
কিসের সম্মান তাঁর ?

পৃথ্বি। সে কথার বৃথা আন্দোলন এই স্থানে,
চল সবে যাই রাজোদ্যানে,
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নয়,
সোলাপুর জয় তাহে নরোজার দিন,
উৎসব করিব সবে বাদ্‌সার সনে।

[সকলের প্রস্থান।

(সেলিম ও আকবরের প্রবেশ)

আক। সেলিম, তোমার মনোসাধ পূর্ণ হবে। তুমি স্বয়ং মিবার জয় করো। মানসিংহ মিবারে স্ব-ইচ্ছায় অতিথি হয়েছিলেন, তুমি আমায় সংবাদ দিয়েছিলে, যদি তিনি মিবারে সম্মানিত হয়ে আস্‌তেন, আমি তাঁরে বিশেষ দণ্ডবিধান কর্‌তেম, কিন্তু তাঁর মিবার গমনে আমার মিবার জয়ের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

সেলিম। সামান্য মিবার জয়ের সুযোগ অসুযোগ কি পিতা ?

আক। তুমি বালক জাননা, সমরে রজপুতদের দেখ নাই, বিশেষ এই প্রতাপ রাণা মহা কর্ম্মক্ষম, সে আপনার রাজ্যের নিম্নভূমি দগ্ধ করে সমস্ত প্রজাগণকে পর্ব্বত প্রদেশে নিয়ে গিয়েছে, সহজে কখনো দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার কর্ব্বে না। বিশেষতঃ সকল রজপুতই মিবার রাণার সম্মান করে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সম্মত হতো না। মিবার আক্রমণে নিশ্চয় রাজস্থানে রাজ-বিপ্লব হতো, রাজপুত রাজাগণ প্রতাপ রাণার পতাকাতলে একত্রিত হতো, সমস্ত রাজস্থান একত্র হলে, তথায় মুসলমান আধিপত্য থাকে না।

সেলিম। পিতা, মার্জ্জনা করুন, রজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে মুসলমান তো কখনো পরাজিত হয় নাই।

আক। বালক, তাহার কারণ হিন্দুর ভেদ-বুদ্ধি, হিন্দুর দম্ভ! হিন্দুদের শাস্ত্র মর্ম্ম আমি বুঝতে পারলুম না! মুসলমান যেরূপ কোরাণ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে, হিন্দুরা সেইরূপ বেদ অভ্রান্ত স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম-যাজকেরা বোধ হয় ঘোরতর স্বার্থ প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্ম-বিরোধ এতদূর প্রবল করেছে, যে তাতে একমত অবলম্বী হিন্দু অপর মত অবলম্বী হিন্দুকে নারকী বলে ঘৃণা করে! যদি হিন্দুস্থানে কখনো কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর দ্বারা এই ভেদ বুদ্ধি দূর হয়, তাহ'লে জানবে যে হিন্দুর সমকক্ষ জাতি সসাগরা পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। হিন্দুর দাঢ্য, হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ অতুলনীয়। আমি চিতোর আক্রমণেব সময়, রাজপুত রমণীগণের জহর ব্রতে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান শুনে, প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি নাই; রাজপুত পুরুষেরা বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিত্যাগ করে পীত-ধড়া আচ্ছাদনে যখন মরণসঙ্কল্পে আক্রমণ করলে, সে দৃশ্য যে না দেখেছে, তার প্রত্যয় হয় না। সেই রজপুত মিবার যুদ্ধে একত্রিত হবার সম্ভাবনা ছিল, এই নিমিত্ত তোমার বার বার উত্তেজনাতেও আমি মিবারের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। এখন সময় উপস্থিত, তুমি যুদ্ধযাত্রা করতে প্রস্তুত হও।

সেলিম। পিতা, এখন সুযোগ উপস্থিত কেন?

আক। রাণার কার্য্যের যতই সংবাদ পাই, ততই আমার রাণাকে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলে ধারণা হয়, আমি যদি রাণার অবস্থাগত হতেম, রাজ্য রক্ষার জন্য রাণা যে যে উপায় অবলম্বন কচ্চে, আমিও ঠিক সেই সকল উপায় অবলম্বন করতেম। কিন্তু একস্থানে রাণার দুর্ব্বলতা দেখছি, সেই দুর্ব্বলতার কারণও রাণার ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মবলে রাণা আমার আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত নয়—সেই ধর্ম্মই তাঁর নিধনের কারণ হবে। তাঁর সহধর্ম্মী হতেই তাঁর সর্ব্বনাশ হবে।

সেলিম। পিতা, আপনি রাজনীতি বিশারদ, সন্তানকে উপদেশ দেন।

আক। মানসিংহ মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করে আপনাকে মর্য্যাদাহীন বিবেচনা করেছিলেন; সমস্ত রজপুত রাজা, যাঁরা ভয়ে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছেন, তাঁরাও মনে মনে এইরূপ হীনতা স্বীকার কর্ত্তেন। মানসিংহ, মিবারের সহিত সৌহার্দ্দ্য ক'রে সেই হীনতা দূর করবার মানস করেছিলেন। যদি তিনি মিবারে আদর পেতেন, দিল্লীতে প্রত্যাগমন মাত্রেই আমি তাঁরে কারাগারে স্থান দিয়ে কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর্ত্তেম; কিন্তু

কি ফল হতো জানি না, হয়তো রজপুতেরা আমাদের প্রতি আরো বিরক্ত হয়ে, রাণার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা করতো। ।৮৬ রাণা মূর্খ, একটী প্রধান সুযোগ পরিত্যাগ করেছে।

সেলিম। পিতা, মহা সুযোগ প্রাপ্তেও রাণা কখনো মুসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হতে পারতো না। স্বর্গীয় বাবর সা গয়াভূমি আক্রমণ করে তা প্রমাণ করেছেন। সমস্ত হিন্দুই তাদের পুণ্যভূমি রক্ষা করবার জন্যে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু চন্দ্র অঙ্কিত মুসলমান-কেতন সে সময়ে তো ভারতবর্ষে প্রবল দম্ভে উড্ডীয়মান ছিল।

আক। বালক, হিন্দুর দম্ভই সে পরাজয়ের কারণ। মূর্খ হিন্দু, বীরদম্ভে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করতে অসম্মত, বাবর সা কামান ব্যবহার করলেন, হিন্দুরা বাহুবলের উপর নির্ভর করলে। চিতোর বিজয়ের সময় বীরবর জয়মল্ল আমার বন্দুকে হত হয়েছিল, বাহু যুদ্ধে সেই বীরশ্রেষ্ঠ কদাচ পরাজিত হতো না, সেই বীরত্বের সম্মানের জন্য আমি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীর সিংহদ্বার পার্শ্বে স্থাপন করেছি।

সেলিম। রাণা প্রতাপের কি কর্ত্তব্য ছিল, আজ্ঞা কচ্চেন?

আক। যদি রাণার অবস্থায় আমি পতিত হতেম, যদি দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু স্থাপিত হতো, আর আরাবলী পর্ব্বত প্রদেশ শুধু আমার অধিকারে থাকতো, সে সময়, যদি ভয়ে অন্য অন্য মুসলমানেরা হিন্দুর বশতাপন্ন হতো, এমন কি হিন্দুর ন্যায় তাদের আচরণ হতো, তাহলেও আমি তাদের হিন্দু বলে ঘৃণা করতেম না, স্বজাতি বলে গ্রহণ করে উচ্চ সম্মান প্রদান করতেম—সকলকে বন্ধু করতেম, তাতে যে পাতক হতো, তাদের সাহায্যে সমস্ত হিন্দু বিজয় করে, রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কায় গিয়ে ফকীর বেশ ধারণ করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেম। কিন্তু রাণা মূর্খ, মানসিংহের অপমান করে কেবল আত্মীয়দের পর করেছে তা নয়, মুসলমান অপেক্ষা প্রবল শত্রু করেছে। তাদের বিদ্বেষ, মুসলমান অপেক্ষা রাণার প্রতি শতগুণে তীব্র হয়েছে। রাজনীতি অনভিজ্ঞ রাণা তার এই দারুণ বুদ্ধি ভ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে, অচিরে মিবার তোমার পদানত হবে।

সেলিম। পিতা, আমায় যুদ্ধে প্রেরণ করে, দাসকে অতিশয় সম্মানিত কচ্চেন। বাদসার চরণে শত শত সেলাম।

আক। বালক, দম্ভ পরিত্যাগ কর। মিবার যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য ক্ষয় করো

না। রজপুত সৈন্যের দ্বারা তোমার কার্য্য সিদ্ধি হবে। পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করো না। যুদ্ধক্ষেত্রে সাবধানে অবস্থান করো, রাণার সম্মুখীন হয়ো না। যাও প্রস্তুত হও।

সেলিম। বাদ্‌সার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সাহানসা,

আক। কি প্রতাপের ভ্রাতা উপস্থিত?

দূত। বাদসাকে সম্মান প্রদানে উৎসুক।

আক। শীঘ্র লয়ে এসো।

(দূতের প্রস্থান)।

মূর্খ হিন্দু, মুসলমানকে ঘৃণা করো আর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ তোমাদের কুল প্রথা! মিবার আমার করে অর্পণ করবার নিমিত্ত স্বয়ং আল্লা প্রতাপের ভাইকে আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। গৃহভেদী শত্রু ভিন্ন হিন্দুকে পরাজয় করা কঠিন, কিন্তু হিন্দুর গৃহভেদী শত্রুর অভাব নাই।

(শক্তসিংহের প্রবেশ)

শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয় হোক।

আক। শিশোদীয় বীরবর!
তব আগমনে সম্মানিত দিল্লীশ্বর!
এ সম্মানে প্রতিদান করিব প্রদান
রাণা সিংহাসনে যোগ্য জন সংস্থাপনে।
নাহি বাদ্‌সার শিশোদীয় রাজ্যের লালসা,
বুঝ' প্রমাণ তাহার,
ভ্রাতা আপনার—
অগ্রজের তব বিদ্বেষ মোগল প্রতি,
তব নির্ব্বাসনে—
যোগ্যজনে বিদ্বেষ প্রমাণ তাঁর!
কিন্তু ফলভোগী বিদ্বেষের হ'ন বা সম্প্রতি।
বাদ্‌সার অনুরোধ মাত্র মহামতি,
আপনি করুন নির্ব্বাসন প্রতিদান
মিবারের রাজছত্র ধরি নিজ শিরে।

শক্ত। অতি সম্মানিত দাস বাদ্‌সার কৃপায়।

আক। অদ্য উৎসবের দিন
মম সনে মিলিবে অমাত্যগণে নরোজা উৎসবে,
তৃপ্ত হব তব দরশনে।

শক্ত অতি সম্মানিত দাস।

আক। বাহুকার্য্যে ব্যস্ত এইক্ষণে,
গুরুভার প্রজার রক্ষণ
লয়ে যাও বীরবরে উৎসব-উদ্যানে।

শক্ত। দিল্লীশ্বরের জয়। [শক্তসিংহের প্রস্থান।

আক। দেখি, আজ নরোজায় কি নূতন রত্নলাভ হয়।
[প্রস্থান।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

নবম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস বেলা নয়টার সময় নলিনাক্ষ বাবু নূতন রাজাকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দরামের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দরামের বাড়ীতে আমি সকালেই উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, রাজা মণিভূষণ অতি সুন্দর সুপুরুষ যুবক; বেশ বলিষ্ঠ, পঞ্জাবে জন্ম, পঞ্জাবে লালিত-পালিত, তিনি প্রায় একজন বলবান্ তেজস্বী শিখে পরিণত হইয়াছেন।

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "ইনিই রাজা মণিভূষণ।"

আগন্তুক উভয়ে বসিলেন। মণিভূষণ বলিলেন, "হাঁ, গোবিন্দরাম বাবু, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের ডাক্তার বাবু আমাকে আপনার কাছে না আনিলে আমি নিজেই আপনার কাছে আসিতাম। আমি শুনিয়াছি, রহস্যোদ্ভেদ করিতে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা। আমার

নিজের সম্বন্ধে আজ সকালে একটা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, আমি এ পর্য্যন্ত তাহার মাথা-মুণ্ড কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “বলুন, আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, আপনি কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্রই একটা কিছু ঘটিয়াছে।”

মণিভূষণ বলিলেন, “বিশেষ গুরুতর কিছু নয়, গোবিন্দরাম বাবু; খুব সম্ভব, কেবল কৌতুক ঠাট্টা বিদ্রূপ—এই চিঠীখানা আজ সকালে আমি পাইয়াছি।”

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিলেন। সাধারণ খাম, উপরে লেখা “রাজা মণিভূষণ—হিন্দু-আশ্রম, শিয়ালদহ।” ডাক ঘরের দাগ বহু বাজার। গত কল্য পত্রখানি ডাকে দেওয়া হইয়াছিল।

গোবিন্দরাম খামখানি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “আপনি যে এই হিন্দু-আশ্রমে থাকিবেন, তাহা কেহ জানিত?”

মণিভূষণ বলিলেন, “কেহ না, আমি হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া এইখানে থাকা স্থির করিয়াছিলাম।”

গোবি। নলিনাক্ষ বাবু নিশ্চয়ই এইখানেই বাসা লইয়াছিলেন।

নলিনাক্ষ বলিলেন, “না, আমি এখানে আসিয়া এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আছি। আমরা যে এই হিন্দু-আশ্রমে থাকিব, তাহা জানিবার কাহারও সম্ভাবনা নাই, কারণ এখানে থাকা পূর্ব্বে স্থির ছিল না।”

গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, “আপনারা কোথায় থাকেন, কি করেন, দেখিতেছি, কেহ সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিয়াছে।”

তিনি খাম হইতে একখানা কাগজ বাহির করিলেন। তিনি কাগজখানি খুলিয়া জানুর উপরে রাখিলেন। এই কাগজের মধ্যস্থলে কেবল এক লাইন মাত্র লেখা আছে, তাহাও কেহ কোন ছাপান কাগজ হইতে অক্ষর কাটিয়া লইয়া কাগজে আটা দিয়া জুড়িয়াছে। লেখাটুকু এই;—

“যদি প্রাণের মায়া থাকে—প্রাণ থাকিতে মাঠে যাইও না।”

রাজা বলিলেন,“গোবিন্দরাম বাবু, এখন বলুন, ইহার মানে কি? আর কে-ই বা আমার জন্য এত চিন্তিত?”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “নলিনাক্ষ বাবু, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন? এ পত্রে যে ভৌতিক কিছু নাই, ইহা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করিবেন।”

নলিনাক্ষ বলিলেন, “ইহাও হইতে পারে যে, রাজার কোন হিতৈষী প্রজা ভূতের কথা বিশ্বাস করিয়াই এরূপ লিখিয়াছে।”

রাজা মহা বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিলেন, "ভূত! ভূত কি! দেখিতেছি, আপনারা আমার বিষয় আমার অপেক্ষা অধিক জানেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমরা যাহা জানি, আপনিও তাহা সমস্ত জানিতে পারিবেন, এখনই সমস্ত শুনিবেন। উপস্থিত এই অদ্ভুত পত্রখানির বিষয় আলোচনা করা যাক্। নিশ্চয়ই ইহা কাল এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, আর কালই ডাকে দেওয়া হইয়াছে।" বলিয়া গোবিন্দরাম আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, ঐখানে এবারকার 'সোম-প্রকাশ'খানা আছে, দাও দেখি।"

আমি কাগজখানা দিবামাত্র তিনি ক্ষণেক নিবিষ্ট মনে দেখিয়া এক স্থান হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পড়িয়া বলিলেন, "বেশ লিখিয়াছে, নয় কি?"

ডাক্তার ও রাজা উভয়েই বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "আমি চিরকাল পঞ্জাবে ছিলাম, এসব বিষয় বড় বুঝি না, তবে আপাততঃ আমার এই পত্রখানার বিষয়ই আমরা আলোচনা করিতেছিলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, তাহা আমি ভুলি নাই, আমিও সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছি। আমার বন্ধু আমার অনুসন্ধান প্রণালী বেশ অবগত আছেন, তবুও দেখিতেছি, তিনিও এখনও কিছু বুঝিতে পারেন নাই।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ঠিকই কথা। তবে 'সোম প্রকাশের' এই প্রবন্ধের সঙ্গে এই পত্রের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, বিশেষ সম্বন্ধ আছে, কারণ এই প্রবন্ধ হইতে কথা কাটিয়া লইয়া এই পত্রখানি প্রস্তুত হইয়াছে। "প্রাণের", "মায়া" "প্রাণ থাকিতে" "মাঠে" সমস্তই এই প্রবন্ধ হইতে কাটিয়া লওয়া।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ঠিক তাহাই ত!"

দশম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়াছিলাম বটে, আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। কোন ছাপান বিষয় হইতে পত্রখানার জন্য কথা কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই জানিতে পারা যায়, কিন্তু কোন্ সংবাদপত্র বা পুস্তক হইতে কথা কাটিয়া লইয়াছে, বলা কঠিন। কি রকম করিয়া আপনি এ কথা বলিলেন?"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সবই চেষ্টার ফল। হাতের লেখা পরীক্ষা করা, ছাপার বিভিন্নতা দেখা আমার প্রধান কাজ, কোন্ প্রেসের কোন্ খবরের কাগজের কিরূপ অক্ষর, এ বিষয়েও আমি একটু দৃষ্টি রাখি। এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে অনেক সময়েই অপরাধীকে ধরা যায় না। প্রথমে অনুমান করিলাম যে, পত্রখানা কাল প্রস্তুত হইয়াছে, সুতরাং এবারকার 'সোমপ্রকাশ' হইতে লওয়া হইয়াছে, অনুমান করা শক্ত নহে।"

রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন যে, কেহ 'সোমপ্রকাশ' কাগজ হইতে কাঁচি দিয়া——"

গো। হাঁ, ছোট কাঁচি।

রাজা। তাহা দেখিতেছি। তাহা হইলে কেহ খুব ছোট কাঁচি দিয়া এই কথাগুলি কাটিয়া, আটা দিয়া——

গো। গঁদের আটা।

রাজা। গঁদের আটা দিয়া এই কাগজ আঁটিয়াছিল। ইহা ছাড়া আর কি জানিতে পারিয়াছেন ?

গো। দুই-একটা বিষয় অনুমান করা যায়। এই দেখুন না কেন, পাছে কোন সূত্র থাকে, এই ভয়ে সে এইরূপ পত্র পাঠাইয়াছে, সে বিশেষ সতর্কতা লইয়াছে। দেখিতেছেন, শিরোনামাটা খুব যেন কোন মূর্খ আনাড়ী লোকের লেখা—এরূপ লোক খবরের কাগজ পড়ে না। ইহাতে অনুমান করা অন্যায় নহে যে, এই পত্র যে পাঠাইয়াছে, সে মূর্খ আনাড়ী নহে, তবে যাহাতে আপনি তাহাকে তাহাই ভাবেন, সে তাহাই চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্য জানা যায় যে, এই পত্রপ্রেরক জানিত যে, আপনি তাহার হাতের লেখা চিনিতে পারিবেন। আর না চিনিতে পারিলেও অপর কেহ তাহার হাতের লেখা চিনিয়া আপনাকে বলিতে পারিবে। তাহাই সে এই ভাবে অক্ষর কাটিয়া পত্রখানা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার পর আর একটা বিষয়, কথাগুলি ঠিক সোজা লাইনে আঁটা হয় নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে, তাড়াতাড়ি আঁটা হইয়াছিল, অথবা যে আঁটিতেছিল, সে সময়ে সে নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, সে খুব তাড়াতাড়ি আঁটিয়া ছিল বলিয়াই এরূপ হইয়াছে ; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, সে এত তাড়াতাড়ি করিয়াছিল কেন ? পত্রপ্রেরক কি ভয় করিতেছিল যে, কেহ আসিয়া পড়িবে ? যদি তাহাই হয়, তবে সে কে ?

নলিনাক্ষ বলিলেন, "এ সমস্তই অনুমানের ব্যাপার হইল।"

গোবিন্দরাম কহিলেন, "ঠিক অনুমান নহে। কোন্‌টা সম্ভব, আর কোন্‌টাই বা অসম্ভব, ইহা তাহার আলোচনা মাত্র। কল্পনা-শক্তির সম্যক্‌ ব্যবহার না করিলে কোন বিষয়ই আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা থাকে না। আপনি অনুমান বলিবেন, কিন্তু নিশ্চিত হইয়াই বলিতেছি যে, এই উপরের ঠিকানাটা কোন ভোঁতা কলমে লেখা, আর দোয়াতেও বড় কালি ছিল না—একি!"

গোবিন্দরাম কাগজখানা আলোকে ধরিয়া বিশেষ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, "না, কাগজে কোন চিহ্ন নাই। বোধ হয়, এ পত্র হইতে যাহা জানা সম্ভব, তাহার সমস্তই আমরা দেখিয়াছি, এখন রাজা মণিভূষণ বাহাদুর, আর কিছু আপনার এখানে পৌঁছিবার পর ঘটিয়াছে?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কই আর কিছু ত দেখিতে পাইতেছি না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কেহ আপনার উপর নজর রাখিতেছে বা আপনার পিছু লইয়াছে, এমন কিছু দেখিয়াছেন?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ দেশে আসিয়া আমি দেখিতেছি, এক গুরুতর উপন্যাসের নায়ক হইয়াছি।"

"আমি যাহা বলিলাম, তাহার উত্তর হইল না।"

"কেন, কে আমার পিছু লইবে?"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, "পরে সে কথা হইতেছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ছাড়া আর কিছু বলিবার আছে?"

রাজা বলিলেন, "আপনি কি শুনিতে চাহেন, বলুন।"

"যাহা প্রত্যহ ঘটে না, এমন যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহাই আমি শুনিতে চাই।"

রাজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি চিরকাল পঞ্জাবে ছিলাম। এ দেশের সব কায়দা-করণ জানি না। তবে একপাটি জুতা হারাইয়া যাওয়া বোধ হয়, মানুষের এ দেশেও সর্ব্বদা ঘটে না।"

"আপনি আপনার একপাটি জুতা হারাইয়াছেন?"

এই কথায় ডাক্তার নলিনাক্ষ কহিলেন, "হয় ত ভুলক্রমে কেহ জুতাটা

কোনখানে রাখিয়া দিয়াছে, আমরা হোটেলে ফিরিয়া গেলেই তাহা পাইব ; সে কথা লইয়া গোবিন্দরাম বাবুকে বিরক্ত করা কেন ?”

রাজা বলিলেন, “যাহা সর্ব্বদা ঘটে না, তাহাই বলিতে উনি আমায় অনুরোধ করিতেছিলেন।”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “হাঁ, তাহাই আমি শুনিতে চাহি। আপনার একখানা জুতা হারাইয়া গিয়াছে ?”

রাজা বলিলেন, “হারাইয়াছে কি না জানি না, অন্ততঃ আমি দেখিতে পাইতেছি না। একজোড়া জুতা কাল আমি এখানে আসিয়াই কিনিয়াছিলাম, তাহা একবারও এ পর্য্যন্ত পায়ে দিই নাই। কি মুস্কিল! আজ সকালে দেখি, তাহার একপাটি নাই।”

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, “তাহা হইলে কাল আপনি আসিয়াই জুতা কিনিতে বাহির হইয়াছিলেন ?”

রাজা বলিলেন, “কেবল জুতা কেন, অনেক জিনিষ কিনিয়াছিলাম। নন্দনপুরে গিয়া রাজার মত থাকিতে হইবে, বুঝিতেই ত পারিতেছেন ?”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “একপাটি জুতা চুরি করিয়া কাহারও লাভ নাই। নলিনাক্ষ বাবু যাহা বলিলেন, আমারও মতে তাহাই লাগিতেছে। হোটেলের কোন চাকর জুতাটা কোথায় রাখিয়া দিয়াছে, আপনারা ফিরিয়া গেলেই পাইবেন।”

রাজা বলিলেন, “আমার যাহা বলিবার ছিল, আমি সকলই বলিলাম, এখন আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করুন। আপনারা কি অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা আমায় বলুন।”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “এ কথা আপনি বলিতে পারেন। নলিনাক্ষ বাবু, আপনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন, ইঁহাকেও সেই সব কথা বলুন। ইঁহার শোনা উচিত ও আবশ্যক।”

তখন নলিনাক্ষ বাবু পকেট হইতে সেই পুঁথি খানি বাহির করিয়া আমাদের যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত রাজাকে বলিলেন। রাজা অতিশয় বিস্ময়ের সহিত সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, আমি খুব একটা মজার জমিদারী পাইয়াছি। এই কুকুরের কথা আমি ছেলেবেলা হইতে শুনিয়াআসিতেছি। আমাদের বংশের সকলের মুখেই এই গল্প শুনিয়াছি, তবে ঠাকুর-মার উপকথার মত শুনিতাম, কিন্তু ইহাতে যে তেমন গুরুতর কিছু আছে, তাহা কখন মনে

করি নাই। তবে জেঠা মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে, সত্যকথা বলিতে কি, আমি ইহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যুর জন্য পুলিস ডাকা উচিত, কি রোজা ডাকা উচিত, এ সম্বন্ধে আপনারা ত এখনও কিছু স্থির করিতে পারেন নাই।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "এই আমি যে পত্রখানা পাইয়াছি—ইহাও কতকটা গল্পের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে।"

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "ইহাতে বোধ হইতেছে যে, মাঠে কি হয়, সে সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহাপেক্ষা অধিক অন্য কেহ জানে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আর কেহ আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী আছে, নতুবা সে পূর্ব্ব হইতে আপনাকে সাবধান করিয়া দিত না।"

রাজা বলিলেন, "হয় ত ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহারা আমায় এই রকম ভয় দেখাইয়া দেশ থেকে দূরে রাখিতে চায়।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, তাহাও যে অসম্ভব, এমন নহে। নলিনাক্ষ বাবু, আপনি যে আমাকে এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি আপনার নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, রাজার নন্দনপুরে যাওয়া উচিত কি অনুচিত?"

রাজা বলিলেন, "আমি আমার বাড়ী যাইব না কেন?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া।"

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই আমাদের বংশের এই ভূতের ভয়ে, না কোন মানুষের ভয়ে?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহাই আমাদের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "ভূতই হউক আর মানুষই হউক, আমি কাহাকেও ডরাই না। আমার নিজের বাড়ীতে নিশ্চয়ই আমি যাইব। এ বিষয়ে আপনি স্থির নিশ্চিত থাকুন।"

মণিভূষণ পঞ্জাবে প্রতিপালিত, সেই দেশের মত তিনি যে একরোখা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমরা বুঝিলাম, তিনি সহজে ভয় পাইবার পাত্র নহেন।

মণিভূষণ বলিলেন, "আপনারা যাহা আমায় বলিলেন, সে বিষয় ভাবিয়া

দেখিবার সময় আমি পাই নাই। হঠাৎ এরূপ বিষয়ে একটা স্থির নিশ্চিত করা সহজ নহে। আমি এখন বাসায় যাইতেছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া বৈকালে সেখানে যান, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাকে বলিতে পারিব।"

গোবিন্দরাম আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ডাক্তার, যাইবে?"

আমি। আপত্তি কি?

রাজা। তবে তাহাই, আপনাদের জন্য আমি একখানা গাড়ী ডাকিয়া দিব?

গো। না, আমরা হাঁটিয়াই যাইব।

রাজা। তাহা হইলে বৈকালে সাক্ষাৎ হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কুচবেহার প্রসঙ্গ।

১৯০১ সনে আমি প্রথম এদেশে পদার্পণ করি। তখন আমার নিকট, এদেশের সবই নূতন। এখানকার উন্মুক্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য, নরনারীগণের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, গৃহাদির নির্ম্মাণ প্রণালী, জিনিষ পত্রের মাপ ওজনের প্রথা, সবই অদ্ভুত রকম বলিয়া মনে হইত। তাহার কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে জীবনের অধিকাংশ অংশই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সকল জনবহুল, অশ্ব শকটাদির গমনাগমন শব্দে নিনাদিত, সুবিস্তৃত রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা সমূহ, এবং প্রচণ্ড 'লু' বাত্যা প্রবাহিত দেশের তুলনায়, এই নিস্তব্ধ, আড়ম্বরবিহীন, হরিদ্বর্ণ তৃণাচ্ছন্ন মাঠের মধ্যে অপ্রশস্ত পথগুলি, সম্মুখে গলিত রজতধারা সন্নিভা ক্ষুদ্র নদী এবং তাহার শিকরস্পর্শে মন্দ মন্দ শীতল বাতাস নিষেবিত ক্ষুদ্র বাঙ্গলোটি আমার অতিশয় রমণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বে এরূপ মনোরম পল্লী দৃশ্যে একান্ত অনভিজ্ঞা ছিলাম। সেইজন্য আমার গৃহস্থালীর কার্য্য শেষ হইলে প্রায়ই অনন্য মনে নদীটির পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, এবং এতদ্দেশীয়া কোন স্ত্রীলোককে পাইলেই

অদম্য কৌতূহলের সহিত এখানকার রীতি নীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। সে তাহার অবোধ্য ভাষায় সব বলিয়া যাইত বটে, আমি কিন্তু কতক বুঝিতাম, কতক বুঝিতাম না। এইরূপে এদেশে প্রায় ৭।৮ বৎসর নানাস্থানে অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আর ভাষা দুর্ব্বোধ্য নাই। রীতিনীতিও যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। এদেশের সামাজিক আচার ব্যবহার প্রসঙ্গে কিছু ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত নির্ভুল ভাবেই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কুচবেহারের সীমা।—পূর্ব্বে আসামের অন্তর্গত ধুবড়ি জেলা, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণে রঙ্গপুর, এবং উত্তরে ভুটানের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূমির পরিমাণ ১৩০৭ বর্গমাইল। আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ এবং সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কোনও পর্ব্বত বা প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি নাই।

লোক সংখ্যা।—১৯০১ সালের সেন্সস মোতাবেক লোক সংখ্যা ৫,৬৬,৯৭৩, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এখানে অধিবাসীবর্গের মধ্যে রাজবংশী ও মুসলমানই অধিক। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্য ও কোচ মেচ গারো সাঁওতাল মোঙ্গড়িয়া প্রভৃতি জাতীয় লোকও অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক অবস্থা।—এখানকার জলবায়ু মোটের উপর মন্দ নহে। শীত বর্ষা ও বসন্ত এখানে এই তিন ঋতুরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত ঋতুর অধিকার। চৈত্র বৈশাখ বসন্তকালের ন্যায় নাতি-শীতোষ্ণ অবস্থা। বৈশাখের শেষ হইতে বর্ষা আরম্ভ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কদাচিৎ অন্যান্য দেশের মত গ্রীষ্মানুভব হয় বটে, কিন্তু দুই চারি দিন গ্রীষ্মাধিক্য হইলেই বারিপাত অবশ্যম্ভাবী। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অতিশয় বর্ষণ হইয়া থাকে, এবং প্রতি বৎসরই এই সময় বন্যার দ্বারা কোননা কোন মহকুমায় লোকের বাড়ী ঘর শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। শুনা যায় এক আসাম প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই এত অধিক বৃষ্টি হয় না।

এখানে দক্ষিণ বায়ু এক প্রকার বিরল, পূর্ব্ব বায়ুই সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। ইহা অতীব অস্বাস্থ্যকর। শীতকালে পশ্চিম বায়ু ও উত্তর বায়ু প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। সে সময় এখানে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে।

নদ নদী।—কুচবেহার রাজ্যে নদ নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বড় বড় নদী ছয়টি, এগুলিতে বারমাসই বেশ জল থাকে। মহাজনি নৌকা ও পারাপারের জন্য মাড় (বৃহৎ খেয়া নৌকা) এগুলিতে সর্ব্বদাই থাকে। ইহাদের নাম. তিস্তা বা ত্রিস্রোতা, সিঙ্গিমারি, কালজানী, তোরসা, গদাধর ও রায়ডাক। ইহার মধ্যে তিস্তার উৎপত্তি—তিব্বত, এতদ্ভিন্ন ৪টী হিমালয় ও একটি ভুটান পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল গুলিই ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এগুলির নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তদ্ব্যতীত মরা নদী বা 'ছড়া' এখানে অনেক। তাহাদের পরিচয়, নাম প্রভৃতি দেওয়া এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

এখানে স্বভাবজাত হ্রদ একটিও নাই, নদীর গতি পরিবর্ত্তনে কোন কোন জায়গায় 'দহ পড়ায়' সে গুলি বিলের মত দেখায়। ইহাতে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। নদীর গর্ভ বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পূর্ণ বলিয়া জল বেশ নির্ম্মল ও শীতল, কিন্তু অধিকাংশ নদীর জল পানে গলগণ্ড ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এজন্য এখানকার লোকে প্রায়ই কূপের জল পানের জন্য ব্যবহার করে। কূপের জল এখানে খুব অনায়াস লভ্য। ১০।১৫ হাত খনন করিলেই এখানে জল পাওয়া যায়।

নদীতে সকল প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। ইলীশ মৎস্যও প্রচুর, তবে গঙ্গার ইলীশ হইতে তাহার স্বাদ কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। তদ্ভিন্ন কুচবেহারে এবং রেলওয়ের নিকট পদ্মার মাছও আমদানি কম হয় না; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও এই দেশীয়দের অত্যধিক মৎস্যাহার প্রিয়তার জন্য মূল্য অতিশয় অধিক বলিয়া মনে হয়। এদেশে কয়েক প্রকার মাছ আছে তাহা আমাদের কলিকাতা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম শিল ঠোকা, পুটিতর ঘড়েয়া বাউস্ ইত্যাদি।

আরণ্য জীব জন্তু।—এ প্রদেশে গভীর অরণ্য বিরল। নল, খাগড়া, কেশে প্রভৃতির বন অত্যন্ত অধিক। বর্ষাকালে সর্ব্বত্র কেশে বন এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হয় যে, হস্তী ব্যতীত অপর কোন যানে সে স্থান অতিক্রম করা সহজ নহে। এই সকল বনের মধ্যে ভল্লুক, গণ্ডার, বন্য মহিষ, শূকর, হরিণ ও নানা জাতীয় ব্যাঘ্রের উপনিবেশ। তাহারা সেই স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ লোকালয়ে আসিয়া গোবৎসাদি এবং ছাগ মেষ প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের উপর দৌরাত্ম্য করে। বাঘে মানুষের অনিষ্ট করিতে বড় বেশী শুনা যায় না; গোবৎসাদি হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে।

রাজ্যের উত্তর সীমায় আসামের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিস্তীর্ণ শালবন আছে, কুচবেহারাধিপতি মহারাজা, শীকার করিবার জন্য তথায় "রিজার্ভ ফরেষ্ট" রাখিয়াছেন। তিনি ঐখানে প্রতি বৎসর শীতকালে বন্ধুবান্ধবসহ মৃগয়া করিয়া থাকেন।

নানা জাতীয় বিষাক্ত ও নির্ব্বিষ সর্প এখানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমাদের দেশের কেঁচো কেন্না প্রভৃতির মত সর্ব্বদাই বেড়াই-তেছে। তবে যে পরিমাণে সর্প আছে তাহার অনুপাতে দংশনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

রাজধানী ও মহকুমা প্রভৃতি।—রাজধানীর নাম কুচবেহার। নগরের তিন দিক নদীর দ্বারা বেষ্টিত। এখানে বহুসংখ্যক ইষ্টকালয়, সুন্দর রাজপথ এবং প্রশস্ত বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট দীর্ঘিকা সকল আছে। তন্মধ্যে 'সাগর-দীঘি' নামক দীর্ঘিকা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহার চতুষ্পার্শে কাছারী বাড়ী সকল, ধনাগার, রাজকীয় পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্র, দেওয়ান খানা, এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত। তদ্ব্যতীত দাতব্য চিকিৎসালয়, শিল্প বিদ্যালয়, কারাগার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। মহারাজা স্বয়ং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও ঠাকুরবাড়ী, ধর্ম্মশালা, অতিথি সেবা প্রভৃতি পূর্ব্বতন মহারাজগণের কীর্ত্তিসকল অক্ষুণ্ণ ভাবে রাখিয়াছেন। নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ কুচবেহারে বৈরাগী দীঘির পার্শ্বে অবস্থিত। সহরের কিঞ্চিৎ দূরে মহারাজার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান। তাহার নাম নীলকুঠি, সে স্থান ইংরাজী রুচি অনুযায়ী নির্জ্জন, সুদৃশ্য বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। কুচবেহারের রাজপ্রাসাদ নগরের উত্তর পশ্চিম কোণে, রাজবাটী অতি সুদৃশ্য এবং আধুনিক রুচিতে সজ্জিত। বৎসরের মধ্যে একদিন মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পুরাতন প্রথা অনুসারে দরবার করিয়া থাকেন। সেদিন যাবতীয় উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এবং প্রধান প্রধান জমীদারগণ মহা-রাজাকে 'নজর' বা উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করেন। মহারাজাও সকলকে 'এমদাদ্' বা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। দরবারের দৃশ্যটি বেশ মনোরম হইয়া থাকে।

নগরের পূর্ব্বোত্তর অংশে রেলওয়ে ষ্টেশন। কুচবেহার ষ্টেট রেলওয়ে আসাম বেঙ্গল লাইনের গীতালদহ ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়া ইংরাজাধিকৃত জয়ন্তী পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ লাইনের উপসত্ব অধিকাংশই মহারাজার। অল্প

পরিমাণে সৈন্য, কয়েকটি কামান ও মহারাজার অনেকগুলি শিক্ষিত উত্তম হস্তী ও অশ্বাদি আছে।

রাজধানী ব্যতীত, শাসনকার্য্যের সুবিধার্থ ইহা চারিটি মহকুমা বা সবডিভিসনে বিভক্ত। মহকুমা গুলির নাম,দীনহাটা,মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ। চারিটি সবডিভিসনের ভার প্রাপ্ত চারি জন অফিসার আছেন। তাঁহারা দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় সকল প্রকার মোকদ্দমা ও ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। ইংরাজী শাসন প্রণালীতে এখানকার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কেবল মৃত্যুদণ্ড ও বেত্রদণ্ড এখানে প্রচলিত নাই। রাজধানীতে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় 'পলিটিকেল এজেণ্ট' নাই, কিম্বা মহারাজা ইংরাজ বাহাদুরকে কোনরূপ কর প্রদান করেন না। একজন মাত্র গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ইংরাজ ষ্টেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখানে আছেন। তিনিও মহারাজার অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন।

গভর্ণমেণ্টের হাইকোর্টের মত এখানে কাউন্সিল সভা আছে, তথায় স্বয়ং মহারাজা ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ সভ্যরূপে সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ উকিল ও মোক্তারের সংখ্যা এখানে যথেষ্ট।

বেশভূষা, আচার ব্যবহার।—রাজবংশীগণের মধ্যে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। স্ত্রীলোকেরা নগ্নমস্তকে হাটবাজার সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের দুই খণ্ড কাপড় পরিতে দেখা যায়। এক খণ্ডে হাঁটু বা কিঞ্চিৎ নিম্ন হইতে কটিদেশে জড়ান। অপরখণ্ডে বক্ষঃস্থল আবৃত করে। এখন বিলাতী কাপড়ের প্রচলন হওয়ায় একখান কাপড়ও উক্তরূপে পরে। কাপড় পরাতে উত্তমরূপে লজ্জাশীলতা রক্ষা হয় না। পুরুষের পরিচ্ছদ আরও খারাপ, মফঃস্বলের লোক যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারাও বাড়ীতে একটু কৌপিন মাত্র পরিয়া থাকে। কোথাও যাইতে আসিতে হইলে বড় কাপড় পরে। ইহাদের বর্ণ প্রায় অধিকাংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখের গঠন পাহাড়িয়াদের মত। নাক মোটা, চোক ছোট এবং ঠোঁট পুরু। স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশ চেহারা লালিত্য বর্জ্জিত। তাহার কারণ ইহাদের পুরুষেরা অতিশয় অলস। এক ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যতীত অন্যান্য সকল পুরুষোচিত কার্য্যই ইহারা করিয়া থাকে। মাথার চুল এলো করিয়া বাঁধা থাকে, বিনাইয়া চুল বাঁধা এবং মাথা ঢাকা দেওয়া, 'পেসাকার' বা বেশ্যার চিহ্ন। মুসলমান রাজবংশীগণেরও মেয়েরা মাথা খোলা রাখে। ইহারা অতিশয় মৎস্য মাংস

প্রিয়,—লোণা মাছ, শুটকি মাছ, কচ্ছপ ও শূকর মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। স্ত্রীপুরুষে উভয়েই পান সুপারী ও সাজা তামাক অত্যধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। কাঁচা সুপারি ইহারা খায়। ছোট বয়স হইতেই ছেলে মেয়েরা এগুলি খাইতে অভ্যাস করে। চিড়া দই ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। হাটে বাজারে যে সকল দধি বিক্রয় হয়, তাহা আমাদের পক্ষে অখাদ্য হইলেও ইহাদের নিকট তাহা উত্তম জিনিষ।

[আগামীবারে সমাপ্য]

শ্রীমতী অনুজা ঘোষ।

প্রতিদান।

(৮)

কারাগারের ঈষন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া জ্যোৎস্নার একটি ক্ষীণ মলিন রেখা দিবাকরের দীন শয্যার উপর পতিত হইয়াছিল। জেলখানার বাহিরে কোন্ দূর পল্লীতে একটা কুক্কুর বিকট রব করিতেছিল, তাহার অস্ফুট শব্দ ঝিল্লী রবের সহিত মিশ্রিত হইয়া হতভাগ্য বন্দীর স্মৃতিপটে বাল্যের স্বগ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ মধুর ছবিখানি প্রতিফলিত করিয়া দিতেছিল। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া, ভাবের পর ভাব আসিয়া ভাবপ্রবণ দিবাকরের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল, শতধা ছিন্ন করিয়া দিতেছিল। তাহার অলক্ষিতে দুই চারি ফোঁটা জল আসিয়া তাহার চক্ষে স্থানাধিকার করিয়াছিল। যুবক ভাবিতেছিল "কি অপমান, কি মনস্তাপ, কি অপযশ। সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, মিথ্যা প্রলোভনে পড়িয়া কি মিথ্যা অপবাদে শাস্তি ভোগ করিতে হইল। ইচ্ছা করিলে বোধ হয় বাঁচিতে পারিতাম, বিচারককে সমস্ত সত্য কথা বিদিত করিলে, গৃহে খুল্লতাতকে সংবাদ পাঠাইলে বোধ হয় এ দুর্গতি ভাগ্যে ঘটিত না। কিন্তু কেমন করিয়াই বা এ জঘন্য কথা লইয়া, আত্মপরিচয় দিয়া মুখে কলঙ্ক কালিমা মাখিয়া জেল হইতে বাঁচিয়া আবার জগত সমক্ষে মুখ দেখাইতে পারিতাম। মৌনাবলম্বন ব্যতীত আমার তো অন্য উপায় ছিল না।"

প্রকৃতপক্ষে দিবাকরের মৌনভাব দর্শন করিয়া এবং তাহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার অপরাধ সম্বন্ধে বিচারকের সন্দেহ হইয়াছিল। ব্যাপারটা

যে রহস্যময় তাহা তিনি কিয়দ্ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াও, চাক্ষুস প্রমাণের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারিলেন না। দিবাকর যদি একবার মুখ ফুটিয়া সরল সত্যটা বিচারকের নিকট বলিয়া ফেলিত তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে?

যখন কারাগারের নির্জ্জনতার মধ্যে দিবাকর পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাগুলি মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখিল তখন যে কেবল ইংরাজ মহিলার কাপট্যকেই সে নিন্দা করিল তাহা নহে। একটা গভীর আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার চিত্তকে শত শত জেলখানার শাস্তি অপেক্ষা অধিক উৎপীড়িত করিতে লাগিল। শিক্ষিত, সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান হইয়া জানিয়া শুনিয়া একটি পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচারের পথে অগ্রসর হইতে যাওয়া যে কিরূপ ঘৃণিত কার্য্য, কিরূপ নারকী আচরণ, ধীরে ধীরে তাহা যুবকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছিল। সে এক একবার ভাবিত—"কেন বলি যে আমার শাস্তি বিনা অপরাধে হইয়াছে। চুরি অপরাধে আমি নির্দ্দোষ হইলেও তদপেক্ষা অধিক পাপাচরণ করিতে কি আমি উদ্যত হই নাই? ভগবানের রাজত্বে ন্যায়বিচারের অভাব আছে এরূপ কথা চিন্তা করা অপেক্ষা বাতুলতা আর কি আছে? বাল্যাবধি কেবল ভাবের উত্তেজনায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, চরিত্র গঠনে কল্পনার যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। একবার স্থির হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখি নাই আরব্ধ কার্য্যগুলার ফল শুভ কি অশুভ। কল্পনা রাজ্যের বনে, উপবনে প্রাসাদে কুটীরে অনেক বিচরণ করিয়াছি তাই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এখন এই নারকী পরিপূর্ণ ঘৃণিত জঘন্য বাস্তব জগতেব কারাগৃহে বাস করিতে হইতেছে।"

(৯)

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কথাটা পুরাতন হইলেও খাঁটি সত্য। সুতরাং দিবাকরের কারাগারের সময়ও অনন্তের পথে ছুটিতে লাগিল। আর সাত দিন পরে দিবাকরের তিন মাস কাল পূর্ণ হইবে, আবার সে আপনার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। জেল হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিবে না, এ সিদ্ধান্তটা দিবাকর অনেক দিন করিয়াছিল। কি জানি তাহার চেষ্টা সত্বেও যদি সত্য কথাটা স্বজনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কিরূপে ভবিষ্যৎ জীবন যাপন করিবে সেই চিন্তাই এখন দিবাকরের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল।

হঠাৎ তাহার পশ্চাতে করমচাঁদ আসিয়া "রাম" "রাম" বলিল। দিবাকর সাধারণতঃ বন্দীদিগের সহিত কোনওরূপ আলাপ করিত না, তথাপি সময় কাটাইবার জন্য দুই একজনের সহিত তাহাকে কথা কহিতে হইত। ইহাদের মধ্যে যুবক করমচাঁদ একজন।

করমচাঁদ বলিল—বাবু আপনার তো সময় হ'য়ে এলো। আমার এখনও পাঁচ বৎসর বিলম্ব আছে।

দিবাকর জোর করিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। একজন ডাকাতের সহিত সুখ দুঃখের কথা কহিতে তাহার এক নূতন বিস্ময়ের ভাব আসিতেছিল।

করমচাঁদ বলিল—বাবু, গোঁসা করিবেন না। একস্থলে আমার প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত আছে। যদি কিছু মনে না করেন তাহা হইলে আপনি বাহির হইয়া সেই অর্থ দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করিবেন। পরে আমি যখন জেল হইতে বাহির হইব তখন আপনার যাহা কিছু সম্পত্তি থাকিবে আমাকে তাহার অর্দ্ধেক অংশ দিবেন প্রতিশ্রুত হউন।

এই তিন মাসের মধ্যে দিবাকরের জীবনে যাহা কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বোধ হয় এইটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। প্রস্তাবটা প্রথমে শুনিয়াই ত দিবাকরের হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিস্ময়,ভয়,বিবেকের চীৎকার,লোভের উল্লাসকর সুমিষ্ট স্বর, সমস্তগুলি এককালে হতভাগ্য যুবকের হৃদয়মধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে ভাবিল—"ছিঃ ছিঃ, শেষে কি চৌর্য্যধন লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সৌধের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে—তা কেন, আমি তো আর চুরি করি নাই, আমি কেবল কর্জ্জ লইতেছি মাত্র—কর্জ্জ লইতেছি তবে এত হৃদয়ের তাণ্ডব নৃত্য কেন?—হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যকে আর প্রাধান্য দিব না।—কিন্তু যদি প্রকাশ পায় আমি অপহৃত ধন আত্মসাৎ করিতেছি, আবার জেলখানা—ওঃ বাবা"—

প্রকাশ্যে দিবাকর বলিল—না আমি তোমার অর্থ চাহি না।

করমচাঁদ নীরবে দিবাকরকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে বুঝিল দিবাকরের অন্তরের মন্ত্রী সভায় তাহার পক্ষীয় স্বরও আছে। সুতরাং সে দিবাকরকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। সে যদি মহাজনের নিকট অর্থ কর্জ্জ লইত তাহা হইলে সে কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত যে মহাজনের অর্থ পাপার্জ্জিত নহে। কে তাহাকে বলিল যে করমচাঁদের গুপ্ত ধন চুরিলব্ধ। যদি তাহার সন্দেহ হয় দান অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্ত কোথায় আছে। দশ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসায়

আরম্ভ করিয়া দিবাকর যদি লক্ষপতি হয়েন তাহা হইলে বিশ সহস্র, ত্রিশ সহস্র দান করিয়া দিলেই তো সকল গোল মিটিয়া যাইবে। দিবাকর যখন গৃহে ফিরিবেন না তখন এ ধন লইতে তাঁহার আপত্তি কি?

জগতে নিত্য যাহা ঘটিতেছে তাহাই হইল। শয়তান জয়ী হইল। দুর্ব্বল নর লোভের মোহিনী শক্তিতে পরাজিত হইয়া তাহার সম্মুখে আত্ম বলিদান দিল। জয়ী করমচাঁদ দিবাকরকে বুঝাইয়া দিল ঠিক কোন স্থলে তাহার গুপ্ত ধন লুক্কায়িত আছে।

(১০)

করমচাঁদ প্রদত্ত দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করাটা দিবাকরের পক্ষে প্রথম প্রথম অবিধেয় বোধ হইলেও পরে সে যখন দেখিল কমলার অনুগ্রহ তাহার উপর অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল তখন বিবেকের সহিত তাহার একটা রফা-রফিয়ত হইয়া গেল। উত্তর পশ্চিমের দুই একটা সহর পরিভ্রমণ করিয়া সে লাহোরে আসিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ব্যবসায় তিন সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়াও সে দেখিল শান্তির নিবাস লাহোর হইতে বহু দূরে। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দিবাকর স্বদেশে ফিরিলেন। তাহার শোকাতুরা মাতার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতে পাপপরিবৃত নশ্বর পৃথিবীতেও কি স্বর্গীয় দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল, তাহার অকস্মাৎ গৃহে প্রত্যাগমন-বার্ত্তা গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইলে কত বিস্মিত নরনারী আসিয়া তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কিরূপ বিব্রত করিয়াছিল, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সমাচারে তাহাদের চিরশত্রু জ্ঞাতিবৃন্দ কিরূপ আত্মীয়তা সহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সে সকল কথা বর্ণনা করিবার স্থান আমাদের এ ক্ষুদ্র ইতিহাসে নাই। সপ্তাহের মধ্যেই দিবাকর মাতাকে লইয়া আবার লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং এই বিংশতি বৎসর তথায় বাস করিতেছিল।

তাহার কারামুক্তির পাঁচ বৎসর পরে দিবাকর একবার করমচাঁদের অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কারাগারেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছিল!

(১১)

দিবাকর যে সময় লাহোরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে তখনকার বাঙ্গালী অধিবাসী এখন কেহও লাহোরে বাস করিত না। বিদেশে আসিয়া যৌবনের অধ্যবসায়ে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুই একজন থাকিলেও

দিবাকর সম্বন্ধে রহস্যটা এক প্রকার প্রকাশিত হইতে পারিত, লাহোরের বাঙ্গালীরা এইরূপ মনে করিত। কিন্তু তাহাদের অবর্ত্ত[illegible] তাহাদিগকে যথেচ্ছা সিদ্ধান্ত করিয়া আপনাপন কৌতূহল নিবারণ করিতে হইত[illegible]।

একদিন আশুঘোষ ভাবিল—"আজ যা' থাকে কপালে দি[illegible]রের পূর্ব্ব পরিচয়টা লইতেই হইবে।" এত বড় দুরূহ কার্য্যটা একেলা সম্পন্ন করা হইতে পারে না ভাবিয়া আশুঘোষ ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া সতীশ বলিল—দেখ, ওরকম হঠাৎ গিয়ে একটা বড় লোককে ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করা একেবারে অবিধেয়। আর সত্য কথা বলতে কি, দিবাকর বাবু যখন তাঁর স্থির ভাবহীন চক্ষু দুটা দিয়ে মুখের দিকে তাকান্, তখন আমার অন্তঃকরণটা অবধি হিম্ হয়ে যায়।

তাহার বৃহৎ গুম্ফের অগ্রভাগ পাকাইয়া আশুঘোষ বলিল—আমায় কি তুমি সে ছেলে পেলে। আমার একটা আইডিয়া আছে।

সতীশ বলিল—কি রকম শুনি ?

আশু বলিল—"আমি বল্‌ব কল্‌কাতার একখানা খবরের কাগজে লাহোরের বিখ্যাত বাঙ্গালীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত চেয়েছে। আমাদের লাহোরের বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে ধনে, মানে, দয়ায়, সহৃদয়তায় দিবাকর বাবুই তো সর্ব্বপ্রধান। আর বাস্তবিক যদি খবরটা পাওয়া যায় তাহ'লে না হয় কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া যাবে।"

সতীশচন্দ্র আশুতোষের বুদ্ধির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া কক্ষান্তরে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিলেন।

(১২)

দিবসের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া আপন সুসজ্জিত গৃহে একাকী বসিয়া দিবাকর বাবু বেহালা বাজাইতেছিলেন। পুরবীর পর গৌরী তাহার পর খাম্বাজ আবার সিন্ধুতে খাম্বাজে মিলাইয়া মনোরম সঙ্গীতসুধায় তিনি আপনিই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। একটা কালো বিড়াল তাঁহার পদতলে পড়িয়া মাঝে মাঝে চক্ষু মেলিয়া প্রভুর মুখের প্রতি চাহিতেছিল আবার নয়ন মুদিতেছিল। বাহিরের বুলবুল বস্তাটা হাঁকিয়া দিবাকরের সঙ্গীতে আপনার সঙ্গীত মিলাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু দুই সঙ্গীতে লয় হইতেছিল না। বুলবুল বস্তার সঙ্গীত আনন্দের রোল, সে সঙ্গীতে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, প্রাণ নাচিয়া

উঠে। দিবাকরের বেহালার স্বর করুণ, মর্ম্মস্পর্শী, তাহাতে হৃদয়কে স্তব্ধ করিয়া দেয়, হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলাকে নীরব করিয়া দেয়। তাই আশু ও সতীশ আনন্দিতচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়াও স্থির হইয়া নিস্তব্ধে সে সঙ্গীত শুনিতে ছিল। দিবাকর তাহা লক্ষ্য করে নাই।

বিড়ালটা প্রভুর গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইবার ভয়ে তাহাদিগকে দেখিয়া কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। দিবাকর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন দুইজন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

অপ্রতিভ দিবাকর তাড়াতাড়ি বেহালা রাখিয়া বলিল—বড় সৌভাগ্য, একেবারে দুইজন যে। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আশু ঘোষ বলিল— আমরা বেশ বাজনা শুন্‌ছিলাম, থাম্‌লেন কেন ?

দিবাকর ঈষৎ হাসিয়া বলিল --ও সময় কাটাবার জন্য।

গল্প হইতে লাগিল। যুবকদ্বয় সাহস করিয়া আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারিল না। সতীশ চুপি চুপি আশুকে বলিল—কাজের কথা কওনা।

আশু বারকতক ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিল। দিবাকর হাসিয়া বলিল—পয়সায় বড় হইলে কি সমাজে বড় হয়। আমাদের আবার জীবনী।

এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একজন ইংরাজ ও একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

কার্য্যগতিকে ইংরাজ পুরুষের সহিত দিবাকরকে মিশিতে হইত কিন্তু সে আজ কুড়ি বৎসর কোনও ইংরাজ রমণীর মুখের প্রতি চাহে নাই। ভৃত্যকে বলিল—সাহেবের আবশ্যক থাকে আসিতে দাও, বল মেমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

আশু ও সতীশ পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল—"মেম সাহেব কিছুতে যাইতে চাহে না, একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেই করিবে।"

দিবাকর মহা সমস্যায় পড়িল। সুবিধা বুঝিয়া আশুঘোষ বলিল—"তা'তে কি ? কি বলে দেখুন না।"

অপর সময় হইলে দিবাকর নিশ্চয়ই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিত না। কিন্তু দুইজন ভদ্রলোকের সম্মুখে অপ্রস্তুত হইয়া অগত্যা তাহাকে মেমকে আনিবার জন্য অনুমতি দিতে হইল। ভদ্রলোক দুইজন উঠিয়া যাইতেছেন

দেখিয়া দিবাকর বলিল—না আশু বাবু, না সতীশ বাবু আপনারা বসুন, ও নারকী মাগীদের সঙ্গে একেলা সাক্ষাৎ করা কিছু না।

সতীশ আশুর গা টিপিল। আশু গুম্ফের প্রান্তভাগ পাকাইয়া সাহেবের কার্ডখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—ফ্লোরেন্স হিল্।

ধীরে ধীরে ফ্লোরেন্স হিল্ গৃহে প্রবেশ করিয়া দিবাকরকে অভিবাদন করিল। তাহার পশ্চাতে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, দেখিলে বোধ হয় যৌবনে রমণীটি অতিশয় সুন্দরী ছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র দিবাকর চমকিয়া উঠিল। দিবাকর ভাবিল, তাইত এযে সেই পাপিষ্ঠা। পিশাচী রাক্ষসী, এখনও সেই সৌন্দর্য্যের কতকটা ইহার শরীরে বিদ্যমান আছে। আবার কি বিপদে পড়িব কি জানি না!

ক্লারা দিবাকরকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। এই কয় বৎসরে তাহার দেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার সুন্দর নবনী কোমল গণ্ডে এখন লম্বা শ্মশ্রু বিদ্যমান ছিল। তাহার কপালে চিন্তার রেখা পড়িয়া গিয়াছিল তাহার চঞ্চল উৎফুল্ল লোচন এখন স্থির, গম্ভীর অথচ একটু চির বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

তাহার সেই পরিচিত কোমল স্বরে ক্লারা বলিল—বাবু বড় বিপদে পড়িয়া আজ স্ত্রীপুরুষে আমরা আপনার দারস্থ হইয়াছি। শুনিয়াছি লাহোর সহরে আপনার মত দাতা নাই, তাই আজ একান্ত বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

বোধ হয় তাহার বক্তৃতার ভূমিকাটায় কিরূপ ফল ফলিল তাহা দেখিবার জন্ম ক্লারা হিল্ একটু স্থির হইল। আশুঘোষ দিবাকরের মুখের প্রতি বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার এরূপ আকৃতি সে কখনও দেখে নাই।

রমণী বলিল—বাবু আমার স্বামী রেলের গার্ড। আমার প্রথম স্বামী মরিবার পর বহু অর্থ পাইয়াছিলাম। বলিতে লজ্জা করে জুয়া খেলিয়া হিল্ সাহেব সেগুলি সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। তাহার পর অমিতব্যয়িতার জন্ম এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছে যে তাহাকে এখন এক পয়সা দিয়া বিশ্বাস করে এমন লোক সমস্ত লাইনে নাই। আপাততঃ একজন লোক পাঁচ শত টাকার জন্য আমার স্বামীকে কাল ধরিয়া কারাগারে দিবে। বাবু এ অপমান অপেক্ষা আপনার ন্যায় মহানুভবের নিকটে ভিক্ষা শ্রেয়ঃ। তাই আসিয়াছি।

হিল্‌পত্নী চুপ করিল। আশুঘোষ দেখিল দিবাকরের সে চাঞ্চল্য ভাব,

সে ভীতি ভাবটা চলিয়া গিয়াছে, তাহার মুখে দৃঢ়তার ভাব আসিয়াছে। দিবাকর আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার স্বামীর সর্ব্বসমেত কত টাকা দেনা ?"

ক্লারা বলিল—সে দুঃখের কথা কি শুনিবেন বাবু। প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা।

তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া দিবাকর চেক বহি বাহির করিয়া হিল্ সাহেবকে তিন সহস্র মুদ্রার একখানি চেক দিল। সকলে বিস্মিত হইল।

হিল্ সাহেব বলিল—বাবু আমি আপনার দয়ার উপযুক্ত নহি। আমি বড় পাপী, এই রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া অনেক পাপ করিয়াছি।

ক্লারার বদনমণ্ডল রক্তহীন হইল। দিবাকর বলিল—ইহাঁর পূর্ব্বের স্বামীর নাম মুর ?

বিস্মিত ক্লারা বলিল—হ্যাঁ।

"মধুপুরে থাকিত ?"

হিল্ বলিল—আপনি জানিলেন কি করিয়া ?

দিবাকর ক্লারাকে বলিল—মেম সাহেব চিনিতে পার ? মিথ্যা অপবাদ দিয়া, নিজের পাপ গোপন করিবার জন্য যাহার সর্ব্বনাশ করিতে সামান্য মাত্রও দুঃখিত হও নাই তাহাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমি অসভ্য হিন্দু, কিন্তু ইহকাল পরকাল মানি। তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার এত দৌলত এত সমৃদ্ধি। তাহারই মূল্য স্বরূপ সামান্য প্রতিদান দিলাম।

দিবাকরের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই ক্লারা অস্ফুট শব্দ করিয়া ভূমে পতিত হইল। দিবাকর গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। হিলের ক্লারার প্রতি বিরক্তিটা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—এ বোঝাটা ঘাড় হইতে নামিলে বাঁচি।

আশু ও সতীশের যত্নে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবার পর ক্লারা যখন চলিয়া গেল, সতীশ বলিল—কিহে ব্যাপারখানা কি ?

আশু ঘোষ গোঁফ পাকাইয়া বলিল—হ্যাঁ দিবাকর বাস্তবিকই কুমার। তবে আমার থিওরিটা একেবারে নির্ভুল নয়। মূলে একটা ইংরাজ বাঙ্গালীর মিশ্র প্রেম আছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

৩১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫ম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

July 1908.

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়" ১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে বঙ্গীয়-সাধনা-সমিতির, সম্পাদক শ্রী[illegible] রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

এডওয়ার্ডস টনিক
য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক।

অর্চ্চনার নিয়মাবলী।

১। অর্চ্চনার মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাকমাশুল লাগে না। মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। অর্চ্চনা প্রতি বাঙ্গালা মাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। কেহ কোন মাসের অর্চ্চনা না পাইলে সেই মাসের সংক্রান্তির মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন, পরে আমরা আর দায়ী থাকিব না।

৩। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইতে হয়।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়,
১৮নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
অর্চ্চনা পোষ্ট, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।
সহকারী সম্পাদক "অর্চ্চনা"

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

বঙ্গীয় নাটকের ক্রমোন্নতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জ্জনের' উপাসকের অভাব না থাকিলেও একথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে যে নাট্যকার বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে যত না জানে, কবিতা ও প্রবন্ধাদির রচয়িতা বলিয়াই অধিক জানে। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিবার উপযোগী ক্ষমতার তিনি যেরূপ অধিকারী, সেরূপ নাটক প্রণয়ণের ক্ষমতা তাঁহার নাই। কিম্বা থাকিলেও সে ক্ষমতার পরিচয় কিন্তু অদ্যাবধি আমরা তাঁহার কোন নাটকে দেখি নাই। যাহা দেখি নাই, তাহা তাঁহার অন্ধ ভক্তগণের মত কেমন করিয়া দেখাইব? কিন্তু সকলের স্মরণ রাখা উচিত, যে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি লেখা এক শক্তির কার্য্য; আর প্রকৃত নাটক লেখা অপর এক শক্তির কার্য্য। নাটক লিখিতে হইলে শুধু কল্পনা কিম্বা পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নহে। তাহার উপর "রুচি, সুবিচার শক্তি, সূক্ষ্মদর্শন ও দূরদর্শন, মানব প্রকৃতিতে গভীর জ্ঞান,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী প্রবৃত্তির প্রতি সমান সহানুভূতি;—ভাস্কর যেমন প্রস্তরে অবয়ব নির্ম্মাণ করেন, নাট্যকার তেমনি শূন্য সেঁকিয়া চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি শক্তি কি সাধারণ?" তাহার উপর, আবার কথোপকথনের মধ্য দিয়া ঐ সৃষ্ট পদার্থকে সজীব, সমুজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান করিয়া তুলা কি সাধারণ লেখকের সাধ্যায়ত্ত? 'রাজা ও রাণী'তে যে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন শক্তিসমূহ পদে পদে পদদলিত হইয়াছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার উপাসক সম্প্রদায় যে কেন 'রাজা ও রাণী'র অসাধারণ নাটকত্ব প্রমাণ করিতে বসিয়া প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন,—আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাঁহার গীতি-কবিতা ও আধুনিক প্রবন্ধাদি তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতেই তিনি বাঁচিবার যোগ্য। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দোহাই দিয়া নাট্যাংশে 'রাজা ও রাণী'কে 'ভ্রান্তি' কিম্বা 'মুকুল মুঞ্জরার' সহিত তুলনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে তুলনায় কি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিতান্ত হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না? পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করিলে, একথা বলিতে ই হইবে যে বঙ্গীয় নাট্য

জগতে গিরীশচন্দ্রের তুলনা গিরীশচন্দ্র—এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মে নাই। আর এখন বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যে যে যুগ বর্ত্তমান আছে, তাহা গিরীশচন্দ্রেরই যুগ। কারণ, তাঁহার পরবর্ত্তী প্রায় সকল নাট্যকারগণের উপরেই স্বল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে দুই একজন নাট্যকার স্বীয় ঋণ গোপন প্রয়াসে সুবিধামত তাঁহার রচনা প্রণালীকে ও নাটককে আক্রমণ করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু,—

"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে!"

তাহাব প্রমাণ সেক্সপীয়রের নাটকাদি। জন্‌সনের মত শ্রেষ্ঠ সমালোচকের তীব্র সমালোচনাতেও সেক্সপীয়রের নাটকের গৌরব বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। আর আমাদের দেশে 'মেঘনাদবধ কাব্য! রবীন্দ্র নাথের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্বেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, গিরীশচন্দ্রের নিকট তাঁহার পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ রচনা প্রণালী ও চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে কে কত পরিমাণে ঋণী, তাহা অপর প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। এখন দেখা যাউক, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে প্রকৃত নাটক রচনায় কে কতদূব কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন।

এই যুগে যে দুই চারিজন নাট্যকার দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষীরোদ চন্দ্রের নাট্য-প্রতিভাই সমধিক সমুজ্জ্বল। কারণ, তিনি আমাদের একেবারে নিরাশ করেন নাই। প্রকৃত নাটক তাঁহার নিকট হইতে আমরা একখানি পাইয়াছি। সেই একমাত্র নাটক—প্রতাপাদিত্য। যদিও তিনি অনেক নাটক লিখিয়াছেন এবং এখনও লিখিতেছেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্য সত্বেও প্রকৃত সমালোচনার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ সহ্য করিতে পারে, এরূপ নাটক তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য' ব্যতীত দ্বিতীয় নাটক নাই। তাঁহার অন্যান্য নাটকাভিধেয় পুস্তক গুলিতে লিপি নৈপুণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু 'প্রতাপাদিত্যে' তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, যে 'প্রতাপাদিত্য' তাঁহার নাটকীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এই নাটকে যে শুধু নাট্যসঙ্গত লিপি কৌশল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহাতে

একটি আধটি চরিত্র সৃষ্টিও আছে। এই নাটকে তিনি একটি 'তেজমাধুর্য্যময়ী' বঙ্গ-ব্রাহ্মণীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই রমণী—কল্যাণী। সাধ্বী ব্রাহ্মণীর দিগন্ত প্রসারিণী প্রভায় তাঁহার স্বামী শঙ্করের চরিত্র কিরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—এই নাটকে তাহা অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। তাই বলিয়া যে ইহাতে দোষ নাই, এমন নহে। পুস্তক খানি দুই একস্থলে অসঙ্গতি ও অসম্ভাবিত দোষে দূষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। মোটের উপর, পুস্তকখানি যখন চিত্তাকর্ষক ও নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত হইয়াছে, তখন এমন দুই চারিটা দোষ উপেক্ষা ও মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

এই সময় বঙ্গীয়-নাট্য-সাহিত্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক দেখা দিয়াছেন। তাঁহার নাম—দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের যশভাগ্য কিছু উজ্জ্বল। প্রশংসা-বাদের পৌনঃপৌনিক ঢক্কা-নাদে তিনি এখন বঙ্গসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া পরিগণিত। আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালা সাপ্তাহিক গুলার সম্পাদকগণ বিনামূল্যে থিয়েটার দেখিবার অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য যে নির্জ্জলা খোসামুদী করিয়া থাকেন, তাহার কথা বলিতেছি না। এমন কি 'নব্যভারত' ও 'প্রবাসী'র মত উচ্চ শ্রেণীর কাগজেও মধ্যে মধ্যে সমালোচনার ব্যভিচার দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। একবার 'প্রবাসী'র সমালোচক লিখিয়াছিলেন,—"নাট্যমঞ্চ ও সাহিত্যের তুল্য উপযোগী নাটক দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র লাল ভিন্ন আর কাহারো আছে কিনা জানি না।" ইহা সমালোচনা কি বিকট বিজ্ঞাপন ঘোষণা, কিম্বা বিড়ম্বনা, তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ ব্যাপার! যে সমা-লোচক বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্য হইতে নাট্যকারদের শিরোমণি গিরীশচন্দ্রের এবং সুবিখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল ও ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রতিভা বাদ দিতে চাহেন, তাঁহার যে শুধু বিন্দুমাত্র সমালোচনা শক্তি নাই, তাহা নহে। বিনা অধ্যাপনায় তাঁহার সমালোচক হইবার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এখন দেখা যাউক, দ্বিজেন্দ্রলালের তথা কথিত 'মহানাটক গুলি' (?) প্রকৃত নাটক নামের উপযুক্ত কি না। তাঁহার নাটকাভিধেয় পুস্তক গুলির পাঠাবসানে মনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভাব নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না। তাহার কারণ, তাঁহার পুস্তক গুলিতে মনুষ্য চরিত্রের বড় একটা বিশদ চিত্র নাই। চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকার নিতান্ত অপটু। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থ গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত 'দুর্গাদাস' গ্রন্থের আলোচনা করিলেই সে কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

গ্রন্থকার 'দুর্গাদাসের' ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—"আমি ঔরংজীবকে সরল ধার্ম্মিক মুসলমান রূপে কল্পনা করিয়াছি।" কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাকে যেরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন. তাহাতে 'ঔরংজীব' সরল ও ধার্ম্মিক হওয়াত দূরের কথা ;—একটি আস্ত জীবন্ত মানুষই হয় নাই। আমরা যখন 'দুর্গাদাস' গ্রন্থে দেখি, যে "সরল ধার্ম্মিক মুসলমান সম্রাট ঔরংজীব" স্বীয় সম্রাজ্ঞী গুল্‌নেয়ারের আব্দার অনুযায়ী তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ যশোবন্তসিংহকে কাবুলে প্রেরণ করিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করিয়াছেন, যশোবন্তসিংহের নিরীহ পুত্র পৃথ্বীসিংহকে 'বিষাক্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া' তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন এবং যশোবন্তের বিধবাপত্নী ও 'সদ্যোজাত শিশু পুত্রকে' বধ করিবার মানসে তাঁহার 'গৃহ অবরোধ' করিতে আদেশ দিলেন ; তখন মনে হয়, যে ইহাতে 'ঔরংজীবের' সরলতা ও ধার্ম্মিকত্ব ত প্রকাশ পাওয়া দূরের কথা, বরং নীচাশয়তা —বুঝি বুদ্ধিহীনতাও প্রকাশ পায়। গ্রন্থকার স্বীয় উক্তি সমর্থনের জন্য 'দুর্গাদাস' এবং 'সমরসিংহের' মুখ হইতে দুই একবার জোর করিয়া বলাইয়াছেন বটে যে, "ঔরংজীব সরল গোঁয়ার ধার্ম্মিক মুসলমান।" কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে ঐ কথার কোনই সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কারণ, ইহাতে 'ঔরংজীবের প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক কথায় নীচাশয়তা ও আহাম্মকি দেদীপ্যমান। শুধু ইহাই নহে। যাহা কেহ করেন নাই, গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন— 'ঔরংজীবকে' মেষের অধম করিয়া গড়িয়াছেন। গুল্‌নেয়ার যেন 'ঔরংজীবের' গুরুমশায়! প্রত্যেক কথায় গুল্‌নেয়ার তাঁহাকে ধমক দিয়া ও তাচ্ছিল্য করিয়া কথা কহিয়া থাকে। আর ঔরংজীবের মত "গোঁয়ার সরল মুসলমানকে" মেষের মত তাহা সহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গুল্‌নেয়ারের আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হইতে দেখা যায়। এক আধটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। ৩১ পৃষ্ঠা—

গুল। যশোবন্তের রাণী এখন কোথায়?

ঔরং। সম্ভবতঃ তিনি রাণা রাজসিংহের আশ্রয়ে—মেবারে।

গুল। মেবার আক্রমণ কর—আমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার পুত্রকে চাই।

ঔরং। গুল্‌নেয়ার! এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

গুল। বিবেচনা? বেগম গুল্‌নেয়ারের ইচ্ছাই সম্রাট ঔরংজীবের কাছে যথেষ্ট নয় কি?—বিবেচনা?—শোন, আমার কথা শোন ;—আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই-ই। সে স্বর্গে থাকুক, মর্ত্ত্যে থাকুক, পাতালে থাকুক, আমি তাকে চাই!—মেবার আক্রমণ কর!

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। চুপ। শুন্তে চাই না। মেবার আক্রমণ কর!—এই বলিয়া সম্রাজ্ঞী কক্ষত্যাগ করিলেন। ইহার একটী দৃশ্য পরেই দেখি 'ঔরংজীব' সম্রাজ্ঞীর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"গুল্‌নেয়ার! তোমার অনুরোধে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি।" এই 'ঔরংজীব' কি ইতিহাসের দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাট ঔরংজীব? তবে ঔরংজীবের চরিত্র কিস্তুতকিমাকার হইলেও নিতান্ত অসহনীয় নয়, কিন্তু গুল্‌নেয়ারের চিত্রের জন্য লেখককে মার্জ্জনা করা যায় না। গুল্‌নেয়ার ইতিহাসের উদিপুরী বেগম। যাঁহার প্রশংসা, সতীত্বানুরাগ, পবিত্রতা আজও ইতিহাসে কীর্ত্তিত। সেই ভারত ধন্যা রমণীর 'চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত' করিয়া লেখক যে কেবল ইতিহাস ভঙ্গ দোষে দোষী হইয়াছেন, তাহা নহে। চিত্রটি আগাগোড়া অস্বাভাবিক। রমণী যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন,—তথাপি সে রমণী। নারীর নারীত্বটুকু পরিবর্জ্জন করা অসাধ্য—বুঝি বা অসম্ভব। কিন্তু গুল্‌নেয়ার দুর্গাদাসের সম্মুখে যে ভাষায় প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, স্বামীর নিকটে আপনার জঘন্য ইতিহাস যেরূপ অসঙ্কোচে বলিতেছেন - কোন স্ত্রীলোক সেরূপ পারে কিনা আমাদের ধারণাতীত। সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে এরূপ লেখে কিনা, জানি না। গুল্‌নেয়ার কারাগারে আসিয়া 'শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাসকে' দুই একটা কথার পর বলিলেন,—

"আমি তোমায় মুক্ত করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি আমার প্রাণেশ্বর!"

দুর্গা। একি পরিহাস?

গুল। তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে?—যে আমি স্বয়ং ভারত সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার; আর তুমি একজন রাজপুত সেনাপতি মাত্র; আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে' ডাকছি! হাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না। সম্রাজ্ঞী হয়ে একজন সামান্য সেনাপতিকে "তুমি আমার প্রাণেশ্বর" এই কথা এই ভাবে আমি ছাড়া জগতে আর কেউ বল্‌তে পার্ত্ত? কিন্তু অদ্ভুতেই আমার প্রবৃত্তি। সামান্য, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় না। অসীমের—উচ্ছৃঙ্খলের রাজত্বে তার বাস!"

এই কথোপকথন শুনিয়া গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। সত্য বলিতে কি, ঐস্থানে গুলনেয়ারের নাম স্বাক্ষরিত না থাকিলে, উহা দ্বিজেনবাবুর উক্তি কি গুলনেয়ারের উক্তি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। লেখকের জানা উচিত, নায়িকাকে পুরুষ করিলেই তাহার

চরম উন্নতি হয় না। স্ত্রীলোকের স্ত্রীভাব থাকা বিশেষ আবশ্যক। পুরুষ বেশ স্ত্রীজাতিকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলে মাত্র। রূপকথায় যদি বা শোভা পায়—কিন্তু উপন্যাস কিম্বা নাটকে তাহা হাস্যজনক হয় মাত্র। কথা দ্বারা মানব চরিত্রের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। মানব চরিত্রে বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই, কথা কহায় বৈচিত্র্য আছে। সেইজন্য, নাটকে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে যাহার মুখে যেরূপ ভাষা শোভা পায়, তাহার মুখে ঠিক সেইরূপ ভাষা দেওয়া উচিত। কারণ নাট্যকারগণ ঔপন্যাসিকদের মত ওকালতী করিবার অবসর পান না। তাঁহাদিগকে কথোপকথনের মধ্য দিয়া স্পষ্ট চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর কবিত্ব সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,—"দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না?—সবটুকু দিতে হবে।" গিরীশচন্দ্রের নাটকাদিতেও একথার কোথাও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলালের সে ক্ষমতার একান্ত অভাব। তাই আমরা তাঁহার নিকট হইতে ছেঁড়া দুর্গাদাস, কাটা প্রতাপ, ভাঙ্গা ঔরংজীব পাইয়াছি। দুই একস্থলে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যেমন কাশিমের মুখ দিয়া একস্থানে বলাইতেছেন যে, "রাণা! মুই এঁদের পুরাণো চাকর। মহারাণা একবার মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মুই সেই থেকে এঁদেরই ঘরে খায়ে মানুষ।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, শুধু "মুই" এবং "মোরে" দিয়া কথা কহিলেই ইতর ভাষা হয় না। শুধু অনুস্বার ও বিসর্গ যোগ করিয়া কে কবে সংস্কৃত ভাষা রচনা করিয়াছে?

কেবলমাত্র যে ইহাই হইয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার কোন পুস্তকেই নাটকীয় সুসংলগ্নতা নাই। কার্য্য-কারণ বলিয়া যে একটা নিয়ম আছে, তাহা তাঁহার পুস্তকে প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে অনেক অকারণ অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হয়, এবং নায়ক নায়িকাগণের উক্তিও স্থানে স্থানে গায়ে পড়া গোছের হইয়া থাকে। 'দুর্গাদাস' গ্রন্থের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য ও 'প্রতাপসিংহ' গ্রন্থের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রভৃতির যে কি আবশ্যক উপলক্ষে সাক্ষাৎকার সৌভাগ্যলাভ করিলাম বলিতে পারি না!

কেবল, আধুনিক কবিদের চিত্রাঙ্কণে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক যে প্রতাপসিংহ গ্রন্থে এই সুদীর্ঘ অনাবশ্যক দৃশ্যটি অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।

'দুর্গাদাস' গ্রন্থের প্রথম দৃশ্যটি নিতান্ত অস্বাভাবিক। 'দিল্লীর প্রাসাদ ভবনে ঔরংজীবের দরবার কক্ষে' ঔরংজীব দুর্গাদাসকে লক্ষ্য করিয়া তাহবর খাঁকে বলিলেন, "বন্দী কর।" 'তাহবর অগ্রসর হইলে দুর্গাদাস সহসা তরবারি খুলিয়া বলিলেন "খবর্দ্দার!—এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি সম্রাট"—এই বলিয়া দুর্গাদাস কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন। মুহূর্ত্তে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল।' তারপর দুর্গাদাস বলিলেন,—"এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট!—আর এক তুরী ধ্বনিতে পাঁচশ সৈনিক দরবার কক্ষে প্রবেশ কর্ব্বে—বুঝে কাজ কর্ব্বেন।" ঔরংজীব অমনি বলিলেন,—"যাও।" 'সসৈনিক দুর্গাদাস চলিয়া গেলেন।' স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, এই কবিত্বোচ্ছ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। 'প্রহরাধিক প্রভাতে,' দিল্লীর রাজপ্রাসাদে. ঔরংজীবের সম্মুখে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে কিনা,—বোধ হয় আরব্যোপন্যাস লেখকও এরূপ লিখিতে ইতস্ততঃ করিত। লেখকের জানা উচিত, যে অপরের চিত্তরঞ্জন করিতে হইলে, নিজের চিত্ত সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির বিকাশ প্রয়োজনীয়। এমন কল্পনার ব্যভিচার, তাঁহার গ্রন্থগুলিতে আরও অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত সকল দেখাইয়া দেওয়া অসম্ভব, কেননা, তাহা হইলে একখানি পুস্তক লিখিতে হয়।

দ্বিজেনবাবু তাঁহার 'দুর্গাদাসের' জন্য বঙ্গীয় পাঠকের উপর দাবী করিতে ছাড়েন নাই। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"নাটক যেরূপই হোক না কেন—বিষয় মহৎ। ইহাই বঙ্গীয় পাঠকের উপর আমার 'দুর্গাদাসের' প্রধান দাবী।" কিন্তু আমরা জানি, বহুমূল্য দ্রব্যও নৌকার দোষে ঘাট ছাড়িয়াই ডুবিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, যে তাঁহার তথাকথিত মহা নাটকগুলি (?) প্রকৃত নাটক হওয়া দূরের কথা, উপন্যাসই হয় নাই—হইয়াছে ভাবোদ্দীপনী গল্প মাত্র।

এই যুগে আরও জনকয়েক নবীন নাট্যকার দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নামই উল্লেখযোগ্য। প্রথম—'রিজিয়া' প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়। দ্বিতীয়—'সংসার' ও 'সমাজ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী। তৃতীয়—'কাল পরিণয়' প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন জনেই গিরীশচন্দ্রের অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের গ্রন্থগুলি—

নাটকীয় শরীরধারী মাত্র। নাটকীয় দেহে—কাব্যাদির আত্মমুক্ত উৎকৃষ্ট রচনা, তাহাতে শক্তি ও সৌন্দর্য্য, এ সবই বিদ্যমান; অবিদ্যমান কেবল নাটকীয় আত্মা। কিন্তু সেজন্য আক্ষেপের বিশেষ কারণ দেখি না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি শত বৎসরে একজন জন্মে কিনা সন্দেহ।

এইবারে দুইটি শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথম—মহাকবি হেমচন্দ্র। দ্বিতীয়—সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক জ্যোতিরিন্দ্র নাথ। ইঁহারা উভয়েই নাটকের অনুবাদক। হেমচন্দ্র সেক্সপীয়রের দুই খানি নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই দুইখানি নাটকেই ভাবানুবাদের আধিক্যই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। আর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সংস্কৃত নাটকগুলিরই বেশ অনুবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইংরাজী নাটকের যে অনুবাদ করেন—তাহা দুরধিগম্য। মূলের সহিত মিলাইয়া না পড়িলে উহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা যায় না। নাটক অনুবাদ সম্বন্ধেও গিরীশচন্দ্রকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি। যদিও তিনি ম্যাক্‌বেথ (Macbeth) নামক একখানি মাত্র নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই একখানি পুস্তকই বঙ্গীয় নাট্যাকাশে 'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি' স্বরূপ বিরাজ করিবে। তাই বলিতেছিলাম, গিরীশচন্দ্রের স্থান বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের সিংহাসনে। তিনি নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। যে মস্তিষ্কের 'মিণ্ট্' হইতে শিবাজী, মীরকাশিম, সিরাজদ্দৌলা, প্রফুল্ল, বলিদান, বিল্বমঙ্গল, কালাপাহাড়, মুকুলমুঞ্জরা, সৎনাম ও ভ্রান্তি প্রভৃতি নির্গত হইয়াছে, সেটি যে নাট্যরসের 'রয়াল মিণ্ট্' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

---

* বঙ্গীয় সাধনা সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই প্রবন্ধটী লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

রাণা প্রতাপ।

দ্বিতীয় দৃশ্য। *

প্রাসাদ কক্ষ।

পৃথ্বিরাজ, রাজপুতরাজগণ, সংযুক্তা, আকবর ও মন্ত্রী।

পৃথ্বিরাজ। রাণা-পদে অভিষিক্ত বীরেন্দ্র প্রতাপ,
কিন্তু বাদসার কৃতদাস আমরা সকলে!
প্রকাশ্য সম্মান দান করিলে রাণায়,
হব সবে বাদ্‌সার বিদ্বেষ ভাজন
জন্মিয়া রজপুত কুলে এহেন দুর্দ্দশা!

বিজ ২য়। ধনমান, কুলশীল বিক্রীত সকলি,
আত্মভেদ একমাত্র হীনতা কারণ
রহিতাম বদ্ধ যদি একতা-বন্ধনে,
রাজস্থান পদানত হ'ত কি তুর্কীর?
বিফল শোচনা!
পত্রলিপি সঙ্গোপনে করিয়া প্রেরণ,
রাণায় সম্মান দান অবশ্য উচিত।

৩য়। কিন্তু রাণা অতীব দাম্ভিক।
স্বজাতিরে ক'রে ঘৃণা!
না করে বিচার, উপায় বিহনে—
পরিহার মাগিয়াছি বাদ্‌সার স্থানে।

(সংযুক্তার প্রবেশ)

পৃথ্বি। একি—কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন?
অনিয়ম কার্য্য আজি কিহেতু সুন্দরী?
রমণীর আগমন পুরুষ-সমাজে
রীতি-বিপর্য্যয়-ন্যাষ্য কভু নয়,
অবৈধিক কার্য্য তবে কি হেতু ললনে,

---

* আষাঢ় মাসের অর্চ্চনা ১৩৪ পৃষ্ঠায় 'রাণা প্রতাপ' প্রথম দৃশ্যের স্থানে ভ্রমক্রমে চতুর্থ দৃশ্য মুদ্রিত হইয়াছিল।—সম্পাদক।

রজপুত কুলের নারী
অনিয়ম কার্য্য তব নহে সুশোভন।

সংযুক্তা। অনিয়ম! নিয়ম কাহার?
হের সুসজ্জিত বাদ্‌সার নিয়ম অনুসারে,—
রাজপুত রমণী—যেতে হবে ন'রোজা বাজারে
নরোজা বাজার সখের বিপনী বাদ্‌সার
সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুহাসিনী, সুভাষিণী
হাবভাব সঞ্চালিনী রমণী মণ্ডলী—
সখের বাজারে—ক্রেতা বিক্রেতার কেলী,
রমণীর হাট, রমণীর ঠাট
ক্রয় বিক্রয় বিলাস যথা,
বাদ্‌সার সখ, বাদ্‌সা নায়ক
নব তুর্কী শ্যাম নব হিন্দু অঙ্গনার মাঝে।
হেথা কোথা রজপুত নিয়ম,
তুর্কী রাজধানী মাঝে
নিয়ম নিয়ন্তা তুর্কী যথা,
এ কি—
হেথা কেন এ হেন বিভ্রম!
কিহেতু বিস্মৃত প্রভু!
দিল্লী ইহা—নহে রাজস্থান।
হেতা বিজাতীয় নিয়ম চলিত
রবি শশী তারকা না হেরিয়াছে যারে,
ব্যবসায়ী-বাজারে রজপুত-কুল-নারী!
আসিয়া স্বজাতি মাঝে কহ মহাশয়—
কি নিয়ম ভঙ্গ আজি করিল কিঙ্করী?

২য়। সত্য অপমান-অগ্নি প্রজ্বলিত হৃদিস্থলে

সং। নাহি কি উপায় কিছু অনল নির্ব্বাণে?
শোণিত-সলিলে অগ্নি হয় কি নির্ব্বাণ?
স্বাধীনতা ধ্বজা আজো উড্ডীন মিবারে,
সন্তপ্ত ক্ষত্রিয় তথা পায় না কি স্থান?

২য়। 　　বিফল গঞ্জনা সুলোচনা—
কে করিবে প্রতিরোধ সম্রাট প্রভাব ?
বার বার পরীক্ষায় জানে রাজস্থান,—
দুর্দ্দম তুর্কীয় চমু,
তাহে ভেদমন্ত্র সিদ্ধ দিল্লীশ্বর,
অগোচর কিছু তব নহে কৃশোদরী !
ভেদ মন্ত্রবলে ক্ষত্রিয় মণ্ডলে
বিচ্ছিন্ন একতা ডুরি।
লো সুন্দরী, বৃথা কেন কর' উত্তেজনা ?

সং। 　　কহ মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
আত্মভেদ কিহেতু এ হিন্দুস্থানে ?
করি স্বার্থ পরিহার,
স্বধর্ম্মী ভ্রাতার
অধীনতা অঙ্গীকারে লজ্জা কি অধিক—
বিধর্ম্মীর পদানত হ'তে।
বিধর্ম্মীরে কন্যা ভগ্নী দান—
তাহে বাড়ে মান,
কুলনারী প্রেরিয়া বাজারে,
একি শ্লাঘা জ্ঞান ?
শত্রু যদি অজেয় এমন—অসম্ভব রণ,
অসম্ভব নহে ছার প্রাণ বিসর্জ্জন
তুচ্ছ করো বিজাতীয় কপট সম্মান,
রাজস্থান হউক শ্মশান,
ক্ষত্র কীর্ত্তি রহুক অটল,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যসম প্রবল প্রতাপ ;
মিবারের সিংহাসনে আরূঢ় প্রতাপ,
সাহায্যে তাহার করি অসি উন্মোচন,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম কেন না হয় প্রচার !
রাণার সম্মান দান সাধ যদি হয়,
হে বীর নিচয়, পত্র দেহ দাসী করে

আমি হ'বো বাহক সবার
বীর-ইচ্ছা করিব প্রচার—
মিবার হইবে উল্লাসিত।
যাই এবে নরোজা বাজারে,
যে হয় বিধান, মতিমান, ক'র সবে মিলে।
মহাকার্য্যে কিঙ্করী প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

২য়। কি হীনতা, রাজপুতের কুলনারী ন'রোজা বাজারে!

পৃথ্বি। একি বাদ্‌সার মন্ত্রীর কিহেতু আগমন,
হিন্দুর মন্ত্রণা-স্থান নাহি এ দিল্লীতে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

স্বাগত, হে মন্ত্রীবর,

মন্ত্রী। সোলাপুর হ'য়েছে বিজয়,
এইহেতু ইচ্ছা বাদ্‌সার
হোক্ মহা আনন্দ তাঁর পুরে,
বিশেষতঃ নরোজার দিন আজি,
আনন্দের দিন এ নগরে,
তাহে এই বিজয় সংবাদ,
সেই হেতু বাদ্‌সার সাধ—
হ'বেন উৎসবরত অমাত্য লইয়ে,
আজ্ঞা মম প্রতি—জনে জনে দিতে নিমন্ত্রণ,
শুভ আগমন হোক, সভায় সবার।

রাজাগণ। সৌভাগ্য সবার, উৎসব বাদ্‌সা সনে,
এ হ'তে সম্মান কিবা আছে হিন্দুস্থানে!

(আকবরের প্রবেশ)

সকলে। সাহানসা অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আক। আপনি এসেছি শুভ সংবাদ প্রদানে,
দূত আসি দিল সমাচার—
জয়ী মহারাজা মান সোলাপুর রণে।
তোমা সবে বলবীর্য্য ভরসা আমার,

বাদ্‌সাই আসন স্থাপিত ক্ষত্র বলে।
যথোচিত ভারতের হিত সাধিতে বাদ্‌সা ব্রতী
হিন্দু মুসলমান সমান উভয় কুল।
ভারতের হিত চিন্তা মম দিবানিশি
তোমা সবে যোগ্য সহকারী—
ভারতের কল্যাণ সাধন
অবশ্য সাধিত হবে সাহায্যে সবার।
সোলাপুর বিজয়ে আনন্দ করো সবে—
বিশেষ নরোজা আজি আনন্দের দিন
রাজপুরে হোক আজ উৎসব ধ্বনিত—
সে উৎসবে আপনি মিলিব
ন'রোজা বাজার হ'তে ফিরি'।
চিরপ্রথা বাদ্‌সার জানতো সকলে
ছদ্মবেশে সমাচার গ্রহণ কারণ
প্রজার অভাব কিবা স্বকর্ণে শুনিতে
বাজারে গমন মম
হ'য়েছে সময় যাই বন্ধুগণ।

সকলে। জয় দিল্লীশ্বরের জয়।

[আকবর ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

১ম। মিথ্যা ইহা নয়,
দাম্ভিক প্রতাপ রাণা এ কথা নিশ্চয়।
শাস্ত্রে কয় রাজ্যেশ্বর ধর্ম্ম অবতার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধরাধামে
কুটুম্বিতা স্থাপনে সে রাজ্যেশ্বর সনে
পতিত কদাচ নহি মোরা।
বিধর্ম্মী কহেন যদি মিবার অধীপ,
সমধর্ম্মী কভু তিনি নন।

পৃথ্বি। সে কথার বৃথা আন্দোলন এই স্থলে।
হই সবে প্রস্তুত যাইতে রাজপুরে,
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নহে।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কুচবেহার প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সামাজিক রীতিনীতি।—ইহারা আপনাদিগকে রাজবংশ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কেহ কেহ বলে, আমরা শিব বংশী। কিন্তু একজন শিক্ষিত রাজবংশী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া তাহাতে কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রথমোক্ত মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এখানকার আদিম নিবাসী কোচগণের সংশ্রবে রাজবংশীগণ এরূপ হীনাচার বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক অনার্য্য সম্মত বহুতর কুপ্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কন্যার বিবাহে পণ বা শুল্ক গ্রহণ, বিধবার বিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ, অন্যের পরিত্যক্ত পত্নী গ্রহণ, 'দাসী রাখা' (উপপত্নীর নামান্তর) প্রভৃতি ইহাদের সমাজে অবাধে চলিতেছে। বিবাহ করিবার সময় পাত্রীকে বরের বাড়ী আনিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহ ব্যতীত আর কোনও শাস্ত্রীয় সংস্কার ইহাদের নাই। বিবাহিতা-গণ সধবার চিহ্ন শাঁখা ও সিন্দুর ধারণ করে। বিধবা পুনরায় বিবাহিত হইলে এ সকল পরিতে পায় না। জন্ম ও মৃত্যুতে একমাস অশৌচ গ্রহণ করে। মৃতদেহ দাহ করা, জলে ভাসান বা মৃত্তিকাসাৎ করা তিন প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রচলিত আছে। দাহ করাই মুখ্যপ্রথা, অপর দুইটি অভাব পক্ষে। শ্মশানে শব দাহ করিবার পর চিতার উপর চারিটি বাঁশ পুতিয়া একটি শ্বেত বস্ত্রের চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। পরে সেই স্থানে পুরুষ হইলে একজোড়া খড়ম, সাজা তামাকু এবং তাহার জীবিতাবস্থার কোন প্রিয়শয্যা পরিচ্ছদাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোক হইলে খড়মের পরিবর্ত্তে শাঁখা তামাক পান সুপারী ইত্যাদি রক্ষিত হয়। মাসান্তে ইহাদের নিয়মমত শ্রাদ্ধ ও পানভোজনাদি হইয়া থাকে। জননী শৌচে প্রসূতি একমাস রন্ধনাদি কার্য্য করিতে পায় না। কিন্তু সমর্থ হইলে অন্যান্য যে কোন কষ্ট বা সহজসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। সন্তান পালনে ইহাদের অতিশয় অনভিজ্ঞতা দৃষ্ট হয়। অবস্থাপন্ন লোকেরাও শৈশব হইতে যা, তা খাওয়াইয়া শিশুগুলিকে পেট মোটা কদাকার চেহারা বিশিষ্ট করিয়া ফেলে। শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এখানে অধিক।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাট পচানর সময়, এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে এখানে কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। তখন ইহারা ঔষধপত্র দেওয়া অপেক্ষা ওঝা আনিয়া ঝাড়ান বেশী ফলপ্রদ মনে করে। ফলে বাড়ীকে বাড়ী উজাড় হইয়া যায়। তখন আমাদের দেশের রক্ষাকালী পূজার মত ভিক্ষা করিয়া মহাদেবের বা রোগের সৃষ্টিকারক 'হালা চালার' পূজা করে, এবং কখন কখন গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে গিয়া বাস করে।

বিবাহের নিয়ম।—বিবাহের নিয়ম বেশ কৌতুকপ্রদ। বিবাহের জন্য পণ লাগে বলিয়া বিবাহ হওয়াটা পুরুষের পক্ষে পরম ভাগ্যের কথা। মেয়ে যত বড় হয় তত পণ বেশী লাগে। ঘটক বা 'আগুয়ান' প্রথমে বর বা কন্যার সংবাদ আনিলে তিন দিন তার 'পথশুবা' দেখা হয়। এদিনের মধ্যে যদি বাড়ীতে কোনরূপ কলহ বিবাদ, জিনিষ পত্র, গরু বাছুর হারাণ প্রভৃতি অসুখকর কারণ না জন্মায় তবে পাত্রপাত্রী শুভলক্ষণ যুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। অন্যথায় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তারপর 'রাশগণ' খাওয়ান, বা কোষ্ঠি বিচার করিয়া ব্রাহ্মণে দিনস্থির করিয়া দেয়। তখন "গুয়া পাণ কাটা" বা পাণপত্র হইয়া থাকে। সেদিন পণের টাকা অর্দ্ধাংশ পান সুপারী দই চিড়া মৎস্য প্রভৃতি কন্যার বাড়ী পাঠান হয়। তথায় গান বাজনা পান ভোজনাদি হয়। তারপর বিবাহের দিন বাজনা পাল্কী, পনের টাকা কন্যার জন্য গহনা কাপড় প্রভৃতি লইয়া পাত্রী আনিতে যায়। তখন মেয়ের বাপ মা বর-যাত্রদের কিছু খাওয়ায়, গান বাজনা হয়। তারপর মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পালকিতে তুলিয়া দেয়। এই সময় গহনা পছন্দ না হইলে (আমাদের দেশের রত্নগর্ভা ছেলের মায়েদের মত) মেয়ের মা বরকর্ত্তার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। ছেলের বাপ বেচারী তখন কোন প্রকারে চণ্ডিকে শান্ত করিয়া কন্যার কোনও অভিভাবকসহ কন্যা লইয়া নিজ বাটীতে যায়। তথায় একটী বেদী করিয়া পুরোহিত ঠাকুর হোম করেন। বর কন্যা নূতন ধুতি চাদর প্রভৃতি পরিয়া বেদীর চারিদিকে সাতপাক ঘোরে। তারপর কন্যার অভিভাবক কন্যা দান করে। বিবাহ স্থানে একজন আত্মীয় একটী নূতন কলসে গামচা ঢাকা দিয়া জল লইয়া বসিয়া থাকে, বিবাহের পর সেই কলসের জল বরকন্যার মাথায় ছিটান হয়। তার নাম মিতর (মিত্র ?) কলস, উক্ত জল অভিসিঞ্চনের জন্য তিনি কিছু নগদ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপে দুটি সধবা স্ত্রীলোকে দুইখানা বাঁশের চালনে প্রদীপ ও কতকগুলি কলা রাখিয়া

মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে 'চালন দীপ' বলে। তারাও কিছু পায়। আবার যাহারা ওর মধ্যে কিছু অভিজাত বলিয়া গণ্য তাহারা বিবাহ স্থানে উপস্থিত থাকিলে 'রাত কাটানি' অর্থাৎ কুলমর্য্যাদার মত নগদ টাকা পাইয়া থাকে। এ সকল ব্যয়ই বরের বাপের। তারপর বরকন্তা ভোজনাদি করিয়া, বয়স্থ হইলে উভয়ে, নচেৎ কোন তামাসার সম্পর্কীয় লোকের সহিত 'বাসর যাপন' করে।

আট দিন পরে বর কন্যা জোড়ে কনের বাড়ী ভাত খাইতে যায়। আবার সেই দিনই জোড়ে বরের বাড়ী আসে, তারপর যাওয়া আসা চলিতে থাকে।

বিধবার বিবাহে এ সকল হাঙ্গামা নাই। বয়স্থা স্ত্রীলোক স্বইচ্ছায় বিবাহ করিলে কোন কথা নাই, কিন্তু অল্প বয়স্কা হইলে বাপ মা কিম্বা যে কোন অভিভাবক থাকে সে আবার টাকা লইয়া থাকে। তবে কুমারী অপেক্ষা বিধবার দর কম। দশ জন জ্ঞাতি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া দিলেই বিধবা পত্নী মঞ্জুর হইয়া যায়। তাহার গর্ভজাত সন্তান আইন অনুসারে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। তবে কোন গোলমাল না হইলে প্রায়ই ভোগ দখল করিয়া থাকে। কেহ যদি ইচ্ছা করে তবে ইচ্ছামত অর্থ লইয়া নিজ পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহাকে অন্য ব্যক্তি বিবাহ করিলে দাতা বা গৃহীতা কেহই বিশেষ নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীলোকের অসতীত্ব, দৈবাৎ বা স্বেচ্ছায় এক আধবার সমাজে মার্জ্জনীয় হয়। বাড়াবাড়ি হইলে একটু নিন্দার বিষয় হয়।

যাহার পণ দিবার ক্ষমতা নাই সে ২। ৩ বৎসর কন্যার পিতার নিকট বিনা পারিশ্রমিকে খাটিলে বিবাহ করিতে পায়। তাহাকে 'ঘর জাই' বা ঘর জামাই বলে। তাহার অঙ্গীকৃত সময় উত্তীর্ণ হইলে সে স্বাধীনভাবে সংসার ধর্ম্ম করিতে পারে। পণের লোভে অনেক সময় বাপ মা একটা মেয়ের দুইবারও বিবাহ দেয়। তারপর আদালতে দুই স্বামীতে স্ত্রীর স্বত্ব সাব্যস্থ করে। এরূপ মোকর্দ্দমা এখানে বিরল নহে।

পর্ব্বউৎসবাদি।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজবংশীরা শাক্তধর্ম্মী, বলিদান না হইলে ইহাদের পূজা সাবস্থ্য নয়। চিরনিরামিষাশী মহাদেবেরও এখানে খাসী পায়রা প্রভৃতি না হইলে পূজা হয় না। বিষহরা বা মনসা পূজা, ধর্ম্মরাজ বুড়া ঠাকুর মদনকাম, এবং নানাবিধ ভূত প্রেতের পূজা এখানে প্রচলিত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, ধানকাটার সময় ধর্ম্মপূজা ও চৈত্রমাসের মদনত্রয়োদশীতে মদন-

কামের পূজা হয়। এই এখানকার প্রধান উৎসব; ৪। ৫ দিন আগে মদনকামের নামে বাঁশ তুলিয়া সেই অবধি প্রায় সপ্তাহ কালব্যাপী উৎসব ও পূজা হইয়া থাকে। কেবল এই পূজায় বলিদান নাই। মালদহ জেলার গম্ভীরার মত এই পর্ব্বে উৎসবকারীরা নানা প্রকার সাজে সজ্জিত হইয়া অসভ্য ভাষায় গান ও পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। এই সময়ে ইহাদের দেখিলে বোধ হয় না যে ইহারা কোনরূপ সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্য ও বাণিজ্য।—এ দেশের অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষিজীবি। বালুকা মিশ্রিত কোমল মৃত্তিকা ও পর্জ্জন্যদেবের কৃপায় কিছু ক্ষেত খামার বাড়ীর কাছে গোটাকত ফল মূল ও কলাগাছ, এবং ২।১ ঝাড় বাঁশ থাকিলেই এখানকার লোকের স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মাটিতে কোদাল দিয়া বারকতক লাঙ্গল দিলেই মাটী তৈয়ার হইয়া যায়। তাহাতে বীজ ছড়াইয়া বারকতক 'নিড়ান' দিলেই সোনা ফলিয়া যায়। বৃষ্টির অভাব হইলেও নদী কূপ প্রভৃতি জলাশয়ের প্রাচুর্য্য বশতঃ শস্য নষ্ট হইতে পারে না। রপ্তানি না হইলে এখানকার উৎপন্ন শস্যের মূল্য অতিশয় সুলভ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু মারওয়ারী মহাজনগণের আড়ত, নদী পথে নৌকা যাতায়াতের সুবিধা এবং ষ্টেট রেলওয়ে হওয়াতে, অত্যধিক রপ্তানির জন্য অন্যান্য দেশের মত এখানেও জিনিষ পত্র দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে।

নানা প্রকার ধান্য, সর্ষপ, পাট ও তামাকু এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। গোধূম, মটর প্রভৃতি রবি শস্য এখানে এসকল দ্রব্যের হিসাবে অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তামাকু এ প্রদেশের বিখ্যাত। শুনা যায় মগ ব্যবসায়িগণ এখান হইতে চুরুট প্রস্তুতের জন্য তামাকু কিনিয়া ব্রহ্মদেশে চালান দিয়া থাকে। মহারাজা নিজ ব্যয়ে আদর্শ তামাকু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া উন্নত প্রণালীর দ্বারা তামাকুর আরও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এতদর্থে একজন রাজকর্ম্মচারী সরকারী ব্যয়ে ব্রহ্মদেশ হইতে তামাকের চাষ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এবং একজন রাজকুমার আমেরিকা মহাদেশে ইহার চাষ এবং চুরুট প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে গিয়াছেন।

ধান্য সর্ষপ পাট প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে বস্ত্র, বাসন, লবণ ও মসলা প্রভৃতি এদেশে আমদানি হইয়া থাকে। বাণিজ্য স্থান নিজ কুচবেহার, দীনহাটা, মাথাভাঙ্গা, হল্‌দিবাড়ী, বলরামপুর, ভইসখুচি প্রভৃতি প্রধান।

শিল্পজাত দ্রব্য।—শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের বিশেষ বিখ্যাত কিছুই নাই। কুচবেহারবাসিগণের বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। আবহমান-কাল হইতে যে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তদ্ব্যতীত নূতন কোন কার্য্য করিতে তাহারা অগ্রসর হইতে চায় না। সম্প্রতি জাপানি ধরণের হস্তচালিত তাঁতের প্রচলন হওয়ায় মহারাজা সরকারী ব্যয়ে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া অনেক-গুলি লোককে শিক্ষাদান ও বিনামূল্যে তাঁত পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া আছে। সামান্যরূপ এণ্ডি কাপড় ও মোটা চটের মত মেখলি নামক এক প্রকার গাত্রাবরণী বস্ত্র ইহারা তৈয়ার করিয়া থাকে। কেবল বাঁশের কাজে ইহাদের কিছু নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। নানা প্রকারের বাঁশ এদেশে উৎপন্ন হয়। মাথলা নামক একরকম অত্যন্ত নমনীয় বাঁশ এদেশে আছে, তাহাতে ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনা দড়িতে ইহারা বেড়া প্রাচীর প্রভৃতি তৈয়ার করে। তদ্ভিন্ন গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় সকল প্রকার জিনিষই ইহাদের বাঁশের তৈয়ারী।

রাজস্ব।—ভূমির রাজস্বের পরিমাণ বাৎসরিক ১৩৭৪৫০০৲ তের লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচ শত টাকা। রাজ্যের প্রায় একতৃতীয়াংশ এখনও খাস মহলে পতিত আছে, সে সকলের কতকাংশে বন্দোবস্তের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এ সকলের কার্য্য শেষ হইলে রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। শ্রীযুত কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল এখানে দেওয়ানের কার্য্যে থাকিয়া রাজ্যের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় রাজস্ব অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মহারাজার দারজিলিং, চাকলাজাত, পাঙ্গা এবং বোদা নামে চারিটি জমিদারি তালুক বা ষ্টেট আছে। তাহার আয় স্বতন্ত্র, তথায় প্রত্যেক তালুকে দস্তুর মত একজন করিয়া ম্যানেজার ও কাছারী প্রভৃতি আছে।

আবকারি।—আবকারী বিভাগের আয় বাৎসরিক (গত বর্ষের) একলক্ষ তের হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা। বৎসর বৎসর আয় বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে বোধ হয় এতদ্দেশীয়গণ ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে নেসা করিতে অভ্যস্থ হইতেছে। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মোহরার আছে। এবং সব-ডিভিসনাল অফিসারই এ বিভাগেরও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। এ সকল আয় ব্যতীত সায়রাত মহল,পারঘাট,হাট এবং মেলা প্রভৃতিতেও বৎসর বৎসর অনেক টাকা আয় হইয়া থাকে। সে আয়ের কোন প্রকার স্থিরতা নাই কখনও হ্রাস কখনও বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিক্ষা বিভাগ।—শিক্ষা বিভাগের বন্দোবস্ত এখানে উত্তম। কুচবেহার ভিক্টোরিয়া কলেজ, জেঙ্কিন্স স্কুল, মাইনর ও মডেল স্কুল, ছাত্রাবাস ও মেয়েদের জন্য সুনীতি কলেজ আছে। সর্ব্বত্রই সুবিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপকগণ এবং শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। পরীক্ষার ফলও প্রতি বৎসর সন্তোষজনক হইয়া থাকে। প্রত্যেক মহকুমায় হাইস্কুল, এবং একটী মহকুমায় মাইনর স্কুল আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বদ্ধিষ্ণু গ্রামেই মাইনর, নিম্নপ্রাইমারি এবং প্রাথমিক পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত আছে। শিক্ষার ঈদৃশ সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও কোচবেহারবাসিগণের শিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না। এখানে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এত অল্প যে অঙ্গুলী পর্ব্বে গণনা করিতে পারা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাইনর পর্য্যন্ত পড়া হইলেই ইহাদের ছেলে কৃতবিদ্য হইল মনে করে। উচ্চ শ্রেণীতে অধিকাংশই বিদেশী ছাত্র। রাজবংশীগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা আদৌ প্রচলিত নাই।

চিকিৎসা বিভাগ।—রাজধানীতে এবং প্রত্যেক সব ডিভিসনে মহারাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কোচবেহারে ১ জন সিবিল সার্জ্জন, ২ জন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং কয়েক জন হাঁসপাতাল এসিষ্টেণ্ট ১ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী আছে। শ্রীযুক্ত মোহিত লাল সেন ১ম এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অতি সুবিজ্ঞ ও সহৃদয় চিকিৎসক। তাঁহার গুণে এখানকার অধিবাসিগণ সকলেই কৃতজ্ঞ। রাজ কর্ম্মচারিগণ উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলেই বিনামূল্যে ঔষধ, চিকিৎসক এবং ধাত্রী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মফঃস্বলে ধাত্রীর অত্যন্ত অভাব। এতদ্দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই ধাত্রীর কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞা, তাহাদের অনবধানতায় সুদূর মফঃস্বলের মধ্যবিৎ ও দরিদ্র অবস্থার লোকের বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমহারাণীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে সে অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

দেবসেবা ও দেবালয়।—রাজধানীতে বৈরাগী দিঘীর উপর রাজকীয় প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺ মদনমোহন জিউ, কালীমাতা, তারাদেবী, ভৈরব ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি স্থাপিত আছেন। ইঁহাদের নিত্যভোগ বৈকালী এবং শক্তির নিকট প্রত্যহ দুইটি ছাগ এবং অমাবস্যা চতুর্দ্দশী প্রভৃতিতে মহিষ বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাগরদিঘির পশ্চিম ধারে দেবী বাড়ী নামক স্থানে মহাসমারোহে ৺ দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। এই পূজা সরকারী ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হয়। রাস পূর্ণিমায় মদনমোহন ঠাকুরের রাসোৎসব একটি দেখিবার

জিনিষ। সে সময় বহুব্যয়ে সুন্দর সুন্দর পুত্তলিকা সকল গঠন করিয়া এবং পত্র পুষ্প প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতির দ্বারা পর্ব্বত বন ও কুঞ্জ সকল রচনা করিয়া, অতি মনোরমভাবে সাজান এবং যাত্রা গান বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদের আয়োজন করা হয়। মহকুমাগুলিতে, মদনমোহন, গিরিধারী, বলরাম ও রাধাবিনোদ, নামে অভিহিত কৃষ্ণমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের নিত্য পূজাদির ব্যয় সরকার হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোচবেহারের ৺ মদনমোহন ঠাকুরের ভোগের পর কতকগুলি দরিদ্র ভোজন হইয়া থাকে। কুচবেহার হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে সিংগিমারি নদীর তীরে কুচবেহারের প্রতিষ্ঠাতা কান্তেশ্বর ভূপতির রাজধানী কামতাপুর। অধুনা তথায় কুচবেহারের অধিষ্ঠাত্রী গোসানি দেবীর মন্দির সংস্থাপিতা, এবং উক্ত দেবীর নামানুসারে কামতাপুরের পরিবর্ত্তে গোসানিমারি বলিয়া উক্ত গ্রামের নামকরণ করা হইয়াছে। দেবীর মূর্ত্তি অদৃশ্য, কিন্তু পূজা প্রভৃতি যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যহ ১টি ছাগ বলি হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমি সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সমারোহ সহকারে পূজা এবং অধিক পরিমাণে বলি প্রদত্ত হয়। এই সকল দেবার্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বহুতর দেবত্র সম্পত্তি আছে; এবং ব্যবস্থা সহকারে কার্য্য চালাইবার জন্য দ্বার আফিস নামক একটি স্বতন্ত্র আফিস এবং কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছেন। এখানে পূর্ব্বতন রাজগণের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে সমভাবে মতি ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ উভয় দেবতাই সমভাবে পূজিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু উপস্থিত রাজবংশীগণের মধ্যে শাক্ত ধর্ম্মেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সমাপ্ত।

শ্রীমতী অম্বুজা ঘোষ।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহারা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র গোবিন্দরাম সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "শীঘ্র, ডাক্তার, শীঘ্র—এস—এস।"

আমরা দুই জনে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। গোবিন্দরাম পথের দুই দিকেই চাহিলেন। আমরা দেখিলাম, রাজা ও নলিনাক্ষ বাবু দূরে দুই জনে যাইতেছেন।

আমি বলিলাম, "আমি ছুটিয়া গিয়া কি উহাদের ডাকিব ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "না—না—তুমি সঙ্গে থাকিলেই কাজ হইবে, এস।"

তিনি দ্রুতপদে চলিলেন, আমরা রাজা ও নলিনাক্ষ বাবুর আরও নিকটস্থ হইলাম, তখন গোবিন্দরাম তাঁহার সেই দ্রুতগতি কিছু হ্রাস করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

এক স্থানে রাজা একটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দোকানটা দেখিতে লাগিলেন, তিনি অগ্রসর হইলে গোবিন্দরামও সেইখানে গিয়া তাঁহার ন্যায় দোকানটা দেখিলেন। সহসা তিনি একটা অর্দ্ধস্ফুট শব্দ করিলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টিপথ মিলাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী রাস্তার অপর দিকে আসিয়াছিল, এক্ষণে আবার ধীরে ধীরে যাইতেছে।

গোবিন্দরাম সবলে আমার হাত টিপিয়া গাড়ীখানার ভিতর যে লোকটা বসিয়াছিল, তাহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ আমাদের লোক, ডাক্তার। এস, লোকটাকে উপস্থিত ভাল করিয়া দেখিতে হইল।"

আমি দেখিলাম, লোকটার মুখে খুব বড় নিবিড় কাল দাড়ী, আর তাহার চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতেছে। সে তাহার সেই চক্ষুর্দ্বয় দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিতেছিল।

সহসা সে মুখ বাহির করিয়া কোচ্‌ম্যানকে কি বলিল। কোচম্যান সবলে ঘোড়াকে দুই ঘা চাবুক লাগাইল। তাহার পর গাড়ী তীরবেগে ছুটিল। গোবিন্দরাম একবার রাস্তার চারিদিকে চাহিলেন, নিকটে খালি গাড়ী ছিল না, তিনি ভিড় ঠেলিয়া সেই গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিলেন। আমিও যথাসাধ্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম; কিন্তু সে গাড়ী শীঘ্রই দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

তখন গোবিন্দরাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাঁড়াইলেন। বিরক্তভাবে বলিলেন, "কি অন্যায়, কি মূর্খতা, ডাক্তার আমার মূর্খতার এ দৃষ্টান্তটাও জন সাধারণে তোমার প্রকাশ করা উচিত।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "লোকটা কে ?"

"কে, কেমন করিয়া বলিব ?"

"গুপ্তচর কোন ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এটা স্থির যে, এই নূতন রাজা কলিকাতায় আসা পর্য্যন্ত কেহ না কেহ তাঁহার পিছু লইয়াছে; নতুবা তিনি যে হিন্দু-আশ্রমে থাকিবেন, তাহা অপরে কিরূপে জানিতে পারিবে ? যদি প্রথম দিন তাঁহার পিছু

লইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় দিনও নিশ্চয়ই লইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। বোধ হয়, তুমি লক্ষ্য কর নাই যে, যখন রাজা ও নলিনাক্ষ বাবু আমার ঘরে ছিলেন, তখন আমি দুই-তিনবার জানালার দিকে গিয়াছিলাম। আমার বাড়ীর কাছে কেহ ঘুরিতেছে কিনা, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম।"

"কাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"

"না, আমাদের খুব চালাক লোক লইয়াই কাজ করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তবে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী কি কোন অনিষ্টকারী এই রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে আছে, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। তবে কেহ যে এই রাজার অনুসরণ করিতেছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তাহাই সে কি জানিবার জন্য আমি ইহাদের দুই জনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলাম। লোকটা এত চালাক যে, হাঁটিয়া যায় নাই, গাড়ী করিয়া যাইতেছিল। ইহাতে রাজার অনুসরণ করা সহজ, আর প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরুদ্দেশ হওয়াও সহজ। রাজা হাঁটিয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিবে। গাড়ী করিয়া গেলেও সেই গাড়ীর সঙ্গে যাইবে, তবে ইহাতে একটা অসুবিধা ছিল।"

"অসুবিধা এই যে লোকটাকে কোচ্ম্যানের উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়।"

"ঠিক, তাহাই।"

"কি দুঃখের বিষয় যে, গাড়ীর নম্বরটা আমরা দেখিয়া লইলাম না।"

"ডাক্তার, গোড়ায় একটু গলদ্ হইয়াছিল বটে, তবে ভাবিও না যে আমি এত বড় প্রকাণ্ড গাধা; নম্বরটা ঠিক দেখিয়া লইয়াছি। গাড়ীর নম্বর ৩৭২, সেকেণ্ড ক্লাস। তবে উপস্থিত তাহাতে আমাদের কোনই কাজ হইবে না।"

"ইহা ছাড়া উপস্থিত আমরা আর কি করিতে পারিতাম?"

গোবিন্দরাম ভ্রূ ও ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি করিতে পারিতাম! এই গাড়ীখানা দেখিবামাত্র আমার উচিত ছিল, ফিরিয়া গিয়া আর একখানা গাড়ী ভাড়া করা। তখন আমরা অনায়াসে তাহার গাড়ীর পিছু লইতে পারিতাম, অথবা আমরা আগে হইতে হিন্দু-আশ্রমের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম। তাহা হইলে লোকটা রাজার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-আশ্রমে গেলে, আমরা আবার তাহার খেলাই খেলিতে পারিতাম—আমরা তখন তাহার পিছু লইয়া দেখিতাম যে, সে কোথায় যায়। তাহা না করিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া

পড়ায় লোকটার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমরা ধরা পড়িলাম, সে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইল।''

আমরা এখন খুব ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম, সেজন্য পূর্ব্বেই রাজা ও নলিনাক্ষ বাবু আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দরাম বলিলেন, "আর ইহাদের সঙ্গে গিয়া লাভ নাই—যাক্, ফিরিয়া যাই, তাহার পর কি করা উচিত বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। ডাক্তার, লোকটার মুখখানা মনে পড়ে?"

"দাড়ীটা বেশ মনে পড়ে।"

"হাঁ, তাহাতেই আমার মনে হয় যে, দাড়ীটা জাল দাড়ী। চালাক লোক মাত্রেই এ সকল কাজে একটু ছদ্মবেশ ধরিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, এস ডাক্তার।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে আমরা দুইজনে হিন্দু-আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। নিম্নতলে এক ব্যক্তিকে রাজার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে সিঁড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "উপরে যান।"

গোবিন্দরাম তাঁহাকে বলিলেন, "আপনাকে এখানকার ম্যানেজার বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তিনি। আজ্ঞে, হাঁ।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "খুব বড় বাড়ী লইয়াছেন দেখিতেছি। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ,—আবশ্যক বুঝিয়াই এরূপ করিতে হইয়াছে; বিশেষতঃ মফঃস্বলের জমীদার বড় লোকেরা কোন কাজে কলিকাতায় আসিলে প্রায়ই আমাদের এখানে বাসা লইয়া থাকেন, তাহাতে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে চলিবে কেন?"

"রাজা ছাড়া এখন আর কে এখানে আছেন?"

"আর দুজন ভদ্রলোক আছেন—একজন অতি বৃদ্ধ, কাশী যাইবেন, সঙ্গে তাহার একটি আত্মীয় আছেন—উপস্থিত আর কেহ নাই।"

"এইদিকে সিঁড়ী?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

সিঁড়ীতে উঠিতে উঠিতে গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার দেখা গেল,

আমাদের এই রাজাকে লইয়া যাহারা ব্যস্ত আছে, তাহারা অন্ততঃ এক স্থানে বাসা লয় নাই। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা যেমন রাজার উপর নজর রাখিতে ব্যস্ত—তেমনই তাহাদের উপর কেহ নজর রাখিতে না পায়, সেজন্যও তাহারা বিশেষ সাবধান। তবে এখন কথা হইতেছে—(চকিতভাবে) এ কি ব্যাপার !"

আমরা উপরে উঠিবামাত্র প্রায় রাজার সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠুকি হইয়াছিল, তিনিও সবেগে নীচের দিকে আসিতেছিলেন। রাগে তাঁহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে—তিনি এতই ব্যস্ত হইয়াছেন যে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। যখন কথা কহিলেন, তখন তাহাও ভাঙ্গা বাঙ্গালা,—অর্দ্ধেক হিন্দী।

তিনি বলিলেন, "দেখিতেছি, এই হোটেলের লোকেরা আমাকে কামধেনু মনে করেছে। শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে যে, তারা পাথর কামড়াবে, ম্যানেজার যদি আমার জুতা বার ক'রতে না পার, তাহলে একটা অনর্থ কাণ্ড হবে। গোবিন্দরাম বাবু, আমি এখানে মজা কর্‌তে আসিনে যে, সকলেই আমার সঙ্গে কৌতুক কর্‌বে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি হইয়াছে, জুতা পান নাই ?"

রাজা মণিভূষণ বলিলেন, "না—যাতে পাই তাই এখনই কর্‌ছি।"

গোবি। এখন আপনার হাতে দেখিতেছি একপাটি পুরাণ জুতা, আপনি না বলিয়াছিলেন যে আপনার নূতন জুতা হারাইয়াছে ?"

ম। হাঁ, এবার এই পুরাণ জোড়ার একপাটি।

গোবি। কি ?—আবার আর একপাটি——

ম। "হাঁ, মশায় ! হাঁ, আর একপাটি। আমি পঞ্জাব থেকে দু'জোড়া পুরাণ জুতা এনেছিলাম, একজোড়া পায়ে দিয়ে বার হই, আর এই জোড়া এখানে ছিল, ফিরে এসে দেখি, তারই একপাটি নাই।"

এই সময়ে একজন বেহারা তথায় আসিল, রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "পেয়েছিস জুতো, শীঘ্র বল্—"

সে ভয়ে বলিল, "না হুজুর, সমস্ত বাড়ীটা খুঁজে দেখ্‌লেম, কোথাও পেলেম না।"

রাজা। বটে ? ঠাট্টা—এখনই জুতা চাই—না হলে এই চল্‌লেম, পুলিশে এখনই খবর দিচ্ছি।

ভৃত্য। হুজুর, একখানা জুতো কে নেবে—এখনই পাওয়া যাবে।

স্বর সপ্তমে তুলিয়া রাজা মণিভূষণ কহিলেন, "আমি কোন কথা শুন্‌তে চাইনে, এখনই জুতো চাই।"

তাহার পর তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া স্বর সাধ্যানুসারে নামাইয়া বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, এই সামান্য বিষয়টা লইয়া এত গোল করিতেছি——"

গোবিন্দরাম তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, সামান্য বিষয় নয়।"

রাজা। সে কি ? সামান্য বিষয় নয় কেন ?

গোবি। এরূপ একখানা জুতা চুরি করিবার উদ্দেশ্য কি ? ইহার কি কারণ আপনি মনে করেন ?

রাজা। কি কারণ ? আমি ইহার কোনই কারণ দেখিতেছি না। কোন পাগলের কাজ, না হইলে একপাটি জুতা চুরি করিয়া তাহার লাভ কি ?

গোবি। কতকটা তাহাই !

রাজা। আপনি এ সম্বন্ধে কি মনে করেন ?

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখনও এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আপনার এই ব্যাপার সহজ নহে, বিশেষ জটিল, আমি অনেক রহস্য ভেদ করিয়াছি, অনেক কাণ্ড দেখিয়াছি, আপনার জেঠামহাশয়ের মৃত্যু এখন তাহাপেক্ষাও জটিল বলিয়া মনে হইতেছে। তবে কতক সূত্র পাইয়াছি, খুব সম্ভব, এই সকল সূত্র ধরিয়া আমি এ রহস্যভেদ করিতে পারিব। সত্য মিথ্যাও নির্দ্ধারিত হইবে। খুব সম্ভব, ভুল পথে গিয়া আমাদের সময় অনর্থক নষ্ট হইবে—তবে আজ হউক, কাল হউক, আমরা একদিন সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

শেরসাহ সুর।

শেরসাহের সমরনীতি যাহাই হউক, তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী অত্যন্ত উচ্চদরের ছিল। আপনার পৈতৃক ক্ষুদ্র জায়গীরে উন্নত হইয়া

বেহারের একটি সামান্য পরগণার আধিপত্য পাইয়া এবং জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সুবিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাট পদে সমাসীন হইয়া শেরসাহ সমভাবে সহৃদয়তা ও উচ্চ আদর্শের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিসে প্রজাবৃন্দ সুখে থাকিবে, কি উপায়ে, এমন কি সমরকালেও দরিদ্র শ্রমজীবি কৃষকের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি রক্ষা পাইবে, কি উপায় উদ্ভাবন করিলে সবলের হস্তে দুর্ব্বলের নিগ্রহ বন্ধ হইবে, এ সকল চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তমধ্যে বর্ত্তমান থাকিত। তারিখে শেরসাহি * নামক ইতিবৃত্তকার আব্বাস খাঁ বলেন—"তিনি কখনও অত্যাচারীকে অনুগ্রহ করিতেন না—অত্যাচারী তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বই হউক, তাঁহার প্রিয় পুত্রই হউক, তাঁহার প্রসিদ্ধ ওমরাহ হউক বা তাঁহার স্বজাতিই হউক। অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদান করিতে তিনি কখনও বিলম্ব করিতেন না বা দয়া প্রকাশ করিতেন না।"

শেরসাহের আদর্শস্বরূপ আব্বাস খাঁ তাঁহার আপনার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেরসাহ বলিতেন—"যাহাতে তাঁহার ভৃত্য ও প্রজাবৃন্দ ধর্ম্মনিষ্ঠ হয় তজ্জন্য রাজার কর্ত্তব্য আপনার ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধর্ম্মের অক্ষরে লিখিত করা। পুরোহিতগণ বা প্রজাবৃন্দ যত ভজন পূজন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, রাজা সে সকলের অংশীদার। পাপ এবং অত্যাচার সমৃদ্ধির অন্তরায়। ভগবান অসংখ্য ব্যক্তিকে তাঁহার প্রজারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া রাজার কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞ থাকা। সুতরাং তাঁহার পক্ষে জগদীশ্বরের আদেশবাণী অমান্য করা অবিধেয়।"

সুতরাং যুদ্ধের সময় বা সেনা পরিচালনার সময় দরিদ্র কৃষকের শস্য রক্ষা করা শেরসাহের একটি বিশেষ চেষ্টা ছিল। তাঁহার আজ্ঞা ছিল কেহও শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবে না বা শস্য ক্ষতি করিতে পারিবে না। যাহাতে কোনও সৈনিক শস্য চুরি করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি স্বয়ং প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে যাহারা অপরাধ করিত তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শাস্তি দিতেন। আব্বাস খাঁ বলেন—"তিনি যদি দেখিতেন কোনও ব্যক্তি ফসল নষ্ট করিতেছে তাহা হইলে তিনি নিজ হস্তে তাহার কর্ণচ্ছেদ করিয়া তাহা দ্বারা হৃত শস্যের একটি গুচ্ছ তাহার কণ্ঠে বাঁধিয়া পথে পথে তাহাকে ঘুরাইয়া বেড়াইতেন।" ওয়াকিয়াতে মুস্তাফি ও তারিখি

---

* ৪র্থ বর্ষের নবনূরে এই ইতিবৃত্তখানির বিশেষ বিবরণ দিয়াছি—লেখক।

দাউদী নামক গ্রন্থদ্বয়ে একটি উষ্ট্রচালকের শাস্তির কথা লিপিবদ্ধ আছে। মালবের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উষ্ট্রচালকটি পথসন্নিকটস্থ একটি ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি মটর উৎপাটিত করিয়াছিল। শেরসাহ জানিতে পারিয়া তাহার নাসিকায় ছিদ্র করিয়া দেন এবং তাহার পদদ্বয় বন্ধন করিয়া, নীচের দিকে মুখ করাইয়া তাহাকে সমস্ত পথ লইয়া আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর আর কেহও শস্যক্ষেত্রে কোনও প্রকার উপদ্রব করিত না।

শত্রুর দেশ জয় করিয়া শেরসাহ কখনও কৃষকদিগকে উৎপীড়িত করিতেন না বা তাহাদিগকে বন্দী করিতেন না। তিনি বলিতেন—"কৃষকেরা নিরপরাধ। যে যখন গদীতে বসিবে উহারা তখন তাহার সেবা করিবে। আমি যদি উহাদিগের প্রতি অত্যাচার করি তাহা হইলে উহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিবে এবং দেশটা পুনরায় শ্রীসম্পন্ন হইতে বহুদিন বিলম্ব হইবে।"

শেরসাহ অত্যন্ত স্বজাতিবৎসল ছিলেন। দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াও তিনি আপনার স্বজাতি আফগানদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। যখন নূতন সৈনিকদল নিযুক্ত হইত তখন শেরসাহ তাহাদিগের সহিত আফগান ভাষায় কথা কহিতেন। যদি কেহ তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ আফগান ভাষায় তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিত তাহা হইলে শেরসাহ বলিতেন—"আফগান ভাষা আমার বন্ধুর ভাষা"। তখন তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে বাণ নিক্ষেপ করিতে বলিতেন। সৈনিক যদি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইত তাহা হইলে তিনি তাহাকে অপর সৈনিক অপেক্ষা অধিক বেতন দিতেন। প্রত্যেক আফগান সৈনিকেরই কিছু অধিক বেতন ছিল।

শেরসাহের নিকট কোনও দরিদ্র অথচ ধার্ম্মিক আফগান আসিলেই তিনি তাহাকে আশাতীত অর্থ প্রদান করিয়া বলিতেন—"হিন্দুস্থান রাজ্য আমার হস্তে পতিত হইয়াছে। ইহার মুনাফার তোমার অংশ তুমি গ্রহণ কর।" কথিত আছে তাঁহার রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানে বা রোহ্‌তে কোনও আফগানের অর্থাভাব ছিল না। তিনি, রোহ্‌তে যত আফগান ছিল প্রত্যেকের জন্য হিসাব করিয়া

ভারতের রাজ কোষাগার হইতে অর্থ পাঠাইয়া দিয়া আপনার স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় দিতেন।

—তারিখে শেরসাহী।

সমস্ত রাজকার্য্য শেরসাহ স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। যেরূপ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার বলে তিনি সামান্য জাইগীরদারের পদ হইতে দিল্লি সিংহাসনে উঠিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, শেরসাহ সুন্দরী-পরিবৃত হইয়া আমোদ আহ্লাদে বিলাস হর্ম্ম্যে দিন কাটাইবার পাত্র ছিলেন না। তারিখে শেরসাহী প্রণেতা আব্বাস খাঁ বলেন, রজনীর দুই প্রহর অবশিষ্ট থাকিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন। স্নানান্তর প্রার্থনা বন্দনাদি শেষ করিয়া এক প্রহর অতিবাহিত হইলেই শেষ প্রহর নিশায় তিনি ফকির-দিগের সহিত রাজকার্য্য আলোচনা করিতেন, তাহাদের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যেককে যথাযথ আজ্ঞা প্রদান করিতেন। রজনী প্রভাত হইলে তিনি আবার বন্দনাদি করিয়া রাজসভায় উপবেশন করিতেন। তথায় যত জায়গীরদার, জমীদার, সেনানায়ক, যোদ্ধা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাত করিতেন। এই সভা হইতে দরিদ্র ব্যক্তি বহিষ্কৃত হইত না, কাহারও কোনও অভিযোগ থাকিলে সম্রাট্ স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যাচারীর উচিত দণ্ডের বিধান করিতেন।

প্রাতঃকালে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টাকাল এইরূপে প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাত করিয়া তিনি উলেমাদিগের সহিত প্রাতঃভোজন করিতেন। তাহার পর আবার দ্বিপ্রহর অবধি রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতেন। পুনরায় অপরাহ্নে তিনি নানা প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

রাজ্য শাসনের যে সকল সুপ্রণালীর জন্য আমরা সাধারণতঃ সম্রাট আকবর সাহকে প্রশংসা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রণালী শেরসাহ্ সুরের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগেরই শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি নানা প্রকার বিধান করিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার অকৃতী বংশধরদিগের অকর্ম্মণ্যতার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে মুসলমান ভূপতিগণ প্রত্যেক সেনানায়কের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য গঠন করিবার ও ভরণ পোষণ করিবার ভার অর্পণ করিতেন, এবং আবশ্যক মত অর্থ দিতেন। সেনা-

নায়কগণ সম্রাটকে দেখাইবার জন্য লোকজন ভাড়া করিয়া, সংখ্যামত অশ্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সে গুলি সম্রাটকে দেখাইত এবং কার্য্য সাধিত হইলে তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিয়া, তাহাদের ভরণ পোষণের অর্থে আপনার বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। বহুদর্শী শেরসাহের নিকট একথা অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি নিয়ম করিলেন যে সৈন্যদিগের তালিকা প্রভৃতি উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক সেনানায়কের অধীনস্থ অশ্ব গুলির গাত্রে সঙ্কেত চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইবে। সেনানায়কগণ আর সেই সকল "দাগা" অশ্ব বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে পারিত না। রাজকোষের অর্থ যথা কার্য্যে নিযুক্তও হইত এবং তদ্দ্বারা সৈন্য সংখ্যা পুষ্ট ও সৈনিকবৃন্দ যথেষ্ট কার্য্যক্ষম হইত। সম্রাট শেরসাহের অধীনে সাধারণতঃ দেড় লক্ষ অশ্বারোহী ও পঁচিশ হাজার পদাতী সৈন্য নিযুক্ত থাকিত।

রাজস্ব আদায়ের জন্য শেরসাহ সমস্ত সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক পরগণায় একজন আমীর, একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ শিকদার, একজন খাজাঞ্চী এবং একজন হিন্দী ও একজন ফারসী লিখিবার কারকুণ নিযুক্ত করিতেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সরকার বা কতিপয় পরগণার সমষ্টিতে একজন মুন্‌সেফ এবং একজন প্রধান শিকদার নিযুক্ত করিতেন। প্রজার সহিত কোনও রাজকর্ম্মচারীর রাজস্ব সম্বন্ধে কোনও বিবাদ হইলে উঁহারা তাহার বিচার করিত।

এক বৎসর, দুই বৎসর অন্তর শেরসাহ প্রায়ই আমলা বদলাইতেন, তিনি বলিতেন—"রাজস্ব আদায় করা লাভের কার্য্য, সুতরাং যাহাতে আমার সকল বিশ্বাসী ভৃত্যই কিছু কিছু লাভ করিতে পারে আমার পক্ষে তদনুরূপ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।"

শেরসাহের রন্ধনশালা অত্যন্ত বিশাল ছিল। তথায় নিয়মিতরূপে হাজার হাজার অশ্বারোহী ও রাজভৃত্য ভোজন করিত। ইহা ব্যতীত সম্রাটের আজ্ঞা ছিল যে কোনও ফকীর বা যোদ্ধা বা কৃষক আসিয়া তাঁহার রন্ধনশালায় উপস্থিত হইবে সেই তথায় আহার করিতে পাইবে। দরিদ্র এবং আতুর লোককে অন্ন বিতরণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। দীন দরিদ্রের উপর শেরসাহের দয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আব্বাস খাঁ বলেন—"তাঁহার সমস্ত পরগণাতেই শান্তি ও

সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। তাঁহার রাজত্বে শস্য অত্যন্ত সুলভ ছিল এবং দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে প্রজারা তাহা জানিত না।"

শেরসাহের রাজত্বকাল পূর্ত্তকার্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজিও আমরা তাঁহার কার্য্যের উপকারিতা কিয়দ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের বিলাসপ্রিয় ধনীগণ যখন মটরকারে চড়িয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া নিরীহ গ্রাম্য কৃষকের পুত্র-কন্যার জীবন শঙ্কট করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া যান, তখন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্মরণ করেন যে কোন্ মহাপুরুষ এই সকল রাজপথ প্রথম নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শেরসাহের বীরত্ব, তাঁহার শাসন প্রণালী প্রভৃতির কথা সকলই হয়ত বিস্মৃত হইতে পারিবে কিন্তু তাঁহার যত্ন নির্ম্মিত ভারতীয় রাজপথ-গুলি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপ চির বিরাজ করিবে। তিনি নিম্নলিখিত রাজপথ-গুলি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

প্রথমটী, পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশের সুন্দর গাঁও পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়টী, আগ্রা হইতে দাক্ষিণাত্য অবধি।

তৃতীয়টি, আগ্রা হইতে যোধপুর এবং চিতোর অবধি।

চতুর্থটী, লাহোর হইতে মুলতান অবধি।

কেবল রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। যাহাতে রাজপথ গুলি দস্যু তস্করের হস্ত হইতে নিরাপদ হয়, যাহাতে পথশ্রান্ত পথিকবর্গ ক্লান্তির সময় বিশ্রাম করিবার অবসর পায়, যাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান পথিকগণ পথে প্রার্থনা করিবার সুবিধা পায়, তিনি এ সকলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পথি মধ্যে তিনি দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি সরাই বা পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত কয়টি পথে সর্ব্বসমেত সতের শত পান্থনিবাস ছিল। প্রত্যেক পান্থনিবাস দুই ভাগে বিভক্ত হইত। এক অংশে হিন্দু পরিব্রাজকগণ এবং অপর অংশে মুসলমানগণ বিশ্রাম করিত। হিন্দু সরাইগুলিতে এক একটি ব্রাহ্মণ থাকিত, সে পথিকদিগের পানাহার কার্য্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিত। প্রত্যেক সরাইয়ে তিনি কুপ খনন করাইয়াছিলেন এবং এক একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সরাইয়ের চতুর্দ্দিকে গ্রাম বসাইবার চেষ্টা করা হইত। রাজপথের উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ মহীরুহ রাজি রোপিত হইত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

স্বর্গের পথে।

দয়া।

বিজন দুর্গমপথে পন্থাহারা জন
দামিনী ঝলকে তার শরীর শিহরে
আসন্ন বিপদ জানি অবসন্ন মন
চারিদিকে করে দৃষ্টি সভয় অন্তরে!
সহায় সম্বল হীন—হায় নিরাশ্রয়—
বুঝিবা ত্যজিতে হয় সাধের জীবন
কেহ নাই, কিছু নাই, জন লোকালয়—
হে বিভো! কোথায় তুমি দুঃখের মরণ!
পশ্চিমে জলদ জাল অপসরি যায়—
উজলি আঁধার দিঠি কনক আভায়
ধীরে কহে দেববালা বচন অমিয়া—
"না কর সন্ত্রাস পান্থ—দেখ নিরখিয়া!
তোমার ঈপ্সিত বস্তু। জননীর সম
রক্ষিব এ পথে তোরে 'দয়া' নাম মম।"

ভক্তি।

সম্ভ্রমে ভয়ার্ত্ত পান্থ করিলা প্রণাম
"বুঝি পিতা প্রেরিলেন তোমায় জননি!
করুণা শতধা বয় নিলে তাঁর নাম।
অয়ি দেবি দয়ারূপা সন্ত্রাস দলনি!
আমারে করগো পার এ ঘোর দুস্তরে—
কুটিল এ বক্রপথে থরে বিথরে
ভয় ভ্রান্তি রাশি রাশি। দুর্ব্বল মানব
চরণ স্মরণে যেন অবহেলে সব।"
হাসিয়া আশীষ ভাবে কহে বরাননী
লহ সাথে 'ভক্তি' নামে সখিরে আমার
বিপদ সুদূরে যাবে, বিদূরিবে ধনী
বাধা বিঘ্ন তব পথে। হৃদয়ে তোমার
শত মত্ত যুথবল হবে সঞ্চারণ
ভক্তিভরে বিভুনামে একান্ত শরণ।

মতি।

চলে পান্থ 'ভক্তি'সনে। বর্ষণের পরে
নীরব বনানী ধৌত জলদ ধারায়
লতাপুঞ্জে বিহঙ্গম কভু তরুপরে
অশ্রান্ত মোহনসুরে ডাকে উভরায়
উপরে নীলিম স্বর্গ নিম্নে ধরাতল
ব্যবধানে শত গান উছলে অম্বর।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে পান্থ কেবা শিখাইল?
তাঁরি পদে ছুটে যেন কলকণ্ঠ স্বর!
কহে দেবী " 'মতি' নামে ভগিনী আমার
এসেছি তাঁহারি দ্বারে। অমরার পথে
লহ দীক্ষা তার পাশে। মহিমা অপার
বিরাজে অভয়দাত্রী ভক্ত মনোরথে
নির্বিকারা অবিচলা নির্ভর, শকতি
ত্রিদিবের উপকূলে চির শুদ্ধ মতি!"

প্রীতি।

"এস বৎস লহ দীক্ষা তাঁর পুণ্য নামে
সৃজনে সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ—দেখ নিরখিয়া
তারাময়ী ছায়াপথ—হের পুণ্যধামে
সুমধুর কলস্বর কৌমুদী অমিয়া
মোহন মহিমা খেলা ব্যাপ্ত চরাচর—
মানব হৃদয়ে দেখ পুণ্যের সম্ভার
দয়া, প্রেম, ভালবাসা অভিন্ন বিচার
তাঁহারি রচিত সর্ব্ব মহান সুন্দর!"
এত কহি মতিদেবী দিলা পান্থ সনে
প্রীতি নামে সহচরী। দেবী অনুপমা
ভাব বিভোরাময়ী! বদনে নয়নে
পরিব্যাপ্ত ভূমানন্দ। কহে যেন রমা
কত আলো, কত গান কত প্রীতি আশা
অনন্ত সৃজনে দেখ কত পুণ্য ভাষা।

শান্তি।

আনন্দে অধীর পান্থ কহে 'প্রীতি' প্রতি
স্নিগ্ধ শান্ত কোন দেশে আইলাম মোরা!
কাহার প্রভাবে পুণ্য ত্রিদিবমূরতি
ছায়াময়ী এই ধাম। চৌদিক বিভোরা
পুষ্প গন্ধ ফলে ফুলে। সমীর পরশে
অমিয়া সিঞ্চিত যেন সর্ব্ব কলেবরে—
এই বুঝি স্বর্গপুরী? অব্যক্ত হরষে
উথলে হৃদয় মোর যেন দেববরে!
"শান্তির আশ্রিত এবে তুমি পুণ্যবান
হিংসা রোষ ভয়হীন প্রশান্ত উদার
অকুণ্ঠিত বিরাজিছে ব্যাপি চারিধার—
প্রকৃতি আলাপে হেথা কি গীত মহান্
সে সুরে আকাঙ্ক্ষা নাই নিরাশা সন্ত্রাস
আনন্দ মূর্চ্ছনা শুধু আনন্দ প্রকাশ!

মুক্তি।

মন্দাকিনী কূলে পান্থ প্রশান্ত বদন—
গভীর সমাধি মাঝে মগ্ন যোগিবর—
ভাবাহীন প্রেমানন্দে উথলে নয়ন—
মনপটে প্রতিভাত বিশ্ব চরাচর!
বাঞ্ছাহীন, জ্বালাহীন প্রশান্ত উদার
বিভুপদে সমর্পিত সর্ব্ব কর্ম্ম ভার—
বিরাজে নিশ্চিন্ত মনে এবে নির্ব্বিকার
বিমুক্ত জীবনালোকে দীপ্ত চারিধার!
কহিছে আশীষভাবে দেববালাগণ
"সমাসীন থাক বৎস! চির ধ্রুব স্থির—
দেবতা বাঞ্ছিত তব অর্জ্জিত আসন!
দেখ দূরে কাঁদিতেছে ম্লান নতশির—
বাসনা কামনা আশা রুদ্র অহঙ্কার—
পরাজিত, বিতাড়িত নষ্ট অধিকার।

শ্রীউমাচরণ ধর।

সান্ত্বনা।

(অর্চ্চনায় 'ভগ্নপ্রাণ' শীর্ষক কবিতা পাঠে)

বলো না নির্ম্মম হায়! অকরুণ ভগবান।
এ বিশ্বে নাহিক প্রীতি, নাহি প্রেম প্রতিদান॥
সকল (ই) হেথায় আছে;
সবে সব (ই) করে ভোগ।
যেমন সবল কায়, তেমন (ই) ব্যাধির যোগ॥
হেথায় ধরম আছে ধরমের আছে জয়।
অঙ্কুর, উন্নতি, স্ফূর্ত্তি, আছে স্থিতি আছে লয়॥
মুখের গরাস যেই কেড়ে লয় দুর্ব্বলের।
যদিও তাহার জয় যড় সেই সকলের॥
তবুও কি নিদারুণ, কি ভীষণ মনস্তাপ!
যখন স্মরণে আসে আত্মকৃত মহাপাপ॥
সে সময় রাজ্য, ধন, সম্পদ কি অভিমান।
ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে তারে করেনাক' শান্তিদান॥
পাপের করাল ছায়া করি কর প্রসারিত।
প্রতিপলে করে তারে উত্তেজিত জর্জ্জরিত॥
হউক তাহার জয়, ধন, যশঃ, বহুমান।
বলুক না লোকে তারে বিদ্যা-বুদ্ধি-ভাগ্যবান॥
লোকমুখে উচ্চারিত হোক্ নাম শতবার।
মুহূর্ত্তের তরে তবু সুখ নাই মনে তার॥
প্রিয়জন-বিয়োগের যাতনা যে জানে নাই।
দয়া-ধর্ম্ম-কোমলতা কে পেয়েছে তার ঠাঁই?
করুণার শৈত্যবারি যে হৃদে না বহিয়াছে।
ছুটিয়াছে কবে কোন্ পিপাসিত তার কাছে?
মরুমাঝে মরীচিকা-তুল্য সে শরীরে হায়!
দলিত-পতিত; কত-তৃষিত-কোমল-কায়॥

এ হেন নিরর্থ প্রাণ শুধু জড়দেহ ভার।
কে পেয়েছে শান্তি বারি?
কাছে কবে গিয়ে তার॥
পাপ-পুণ্য মিথ্যা নহে। করুণার অবতার,—
বিধাতার সম্ভবে কি অনাচার অবিচার?
তাঁর কাছে শত্রু মিত্র, পক্ষাপক্ষ ভেদ নাই।
তুল্যপ্রেম ভালবাসা সমভাব সর্ব্ব ঠাঁই॥
এ রহস্য কি জটিল! কে পারে করিতে ভেদ।
কি ভাবে অতীত কোন্ জীবনের পরিচ্ছেদ॥
কর্ম্ম হেথা বলবান্ কর্ম্মময় এ সংসার।
অক্ষুণ্ণ সংস্কার, দেহ হইলেও ছারখার॥
কর তারে ভস্ম, কিম্বা মৃত্তিকায় পরিণত।
সংস্কার স্বভাবে পুনঃ হবে তাহা সুসংযত॥
চিরপুণ্যময় কর্ম্ম সংস্কারের বশে নর।
শান্তিপূর্ণ পূর্ণসুখ ভোগ করে নিরন্তর॥
তার কাছে ধন, রত্ন, যশঃ, মান, অভিমান।
অতি তুচ্ছ অতি হীন; চাহে না সে প্রতিদান॥
ভালবাসা-স্নেহ-প্রীতি-শান্তি-সুধা-করুণার।
কোমলতা-দয়া-ধর্ম্ম বিরাজিত হৃদে যার॥
চিরস্নিগ্ধ প্রীতিপূর্ণ সে লাবণ্য সন্তোষের;—
শীতল সৌরভে হৃদি শান্ত করে সকলের।
অধর্ম্মে উন্নতি যার দুর্ব্বলপীড়নে সুখ।
স্থির কথা এ জগতে ধাতা তার পরাঙ্মুখ॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

৩।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরে আমরা সকলে রাজার ঘরে গিয়া বসিলাম। বসিয়াই গোবিন্দরাম রাজাকে বলিলেন, "এখন কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

রাজা বলিলেন, "নিজের জমিদারীতে যাইব, সেইজন্যই পঞ্জাব হইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, "কবে যাইবেন?"

রাজা কহিলেন, "দুই-এক দিনের মধ্যেই।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন, দেখিতেছি, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত। আপনার পিছনে যে লোক লাগিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমি পাইয়াছি। তবে তাহারা কে, আর তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। এত বড় সহরে হঠাৎ কাহারও উদ্দেশ্য স্থির করা সম্ভব নহে। যদি তাহাদের অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায় থাকে—এ সহরে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া সহজ হইবে না। আজ সকালে একজন লোক আপনাদের অনুসরণ করিতেছিল।"

রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "কে সে—কে সে?"

গোবিন্দরাম কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব?" (নলিনাক্ষ বাবুর প্রতি) "নলিনাক্ষ বাবু, আপনাদের নন্দনপুরে কালো, ঘন লম্বা দাড়ীযুক্ত কোন লোক আছে?"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বলিলেন, "কই—না—হাঁ—হাঁ—রাজার পুরান চাকর অনুপের এই রকম দাড়ী আছে—তারকেশ্বরের দাড়ী——"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, "সে এখন কোথায়?"

ডাক্তার বলিলেন, "সে নন্দনপুরের গড়ে আছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমাদের প্রথম দেখা উচিত, অনুপ যথার্থই সেখানে আছে, না কোন কারণে কলিকাতায় আসিয়াছে।"

নলিনাক্ষ। ইহা কিরূপে জানিতে পারিবেন?

গোবিন্দ। নন্দনপুরে টেলিগ্রাফ-আফিস আছে?

নলিনাক্ষ। না—দেবগ্রামে আছে।

গোবিন্দ। বেশ ভাল, অনুপকে একখানা টেলিগ্রাম করুন। আর একখানা দেবগ্রামের টেলিগ্রাফ আফিসে পাঠাইতে হইবে, তাহাতে লিখুন, অনুপের নামের টেলিগ্রামখানা যেন অনুপেরই হাতে দেওয়া হয়। আর যদি অনুপ গড়ে না থাকে, তবে টেলিগ্রাম যেন এইখানে ফেরৎ দেওয়া হয়। ইহাতেই আমরা জানিতে পারিব যে, অনুপ গড়ে আছে কি না।

রাজা বলিলেন, "হাঁ, এ বেশ কথা। নলিনাক্ষ বাবু—এই অনুপ কে?"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "অনুপের বাপ আপনাদের বংশের পুরাতন ভৃত্য ছিল; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে অনুপ গড়ের ভার পাইয়াছে। ইহারা বহুকাল হইতে আপনাদের চাকরী করিতেছে। অনুপ তাহার স্ত্রীকে লইয়া গড়ে থাকে, যতদূর আমি জানি, তাহাতে বলিতে পারি, তাহারা দুইজনই বড় ভাল লোক।"

রাজা বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে দেখিতেছি, যতদিন এই গড়ে কেহ মালিক না থাকে, ততদিন ইহারা এইখানে রাজার হালে মালিক হইয়া বাস করে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এ কথা ঠিক।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত রাজা অহিভূষণের উইলে এই অনুপ আর তাহার স্ত্রী কিছু পাইয়াছে?"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, পাইয়াছে বই কি। রাজা তাহাদের এক হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।"

গোবিন্দ। তাহারা যে এই টাকা পাইবে, তাহা কি তাহারা জানিত?

নলিনাক্ষ। হাঁ, রাজা অহিভূষণ তাহার উইলের কথা সকলকেই বলিয়াছিলেন।

গো। বটে—এটা প্রয়োজনীয় কথা বটে।

ন। যাহারা রাজা অহিভূষণের উইলের টাকা পাইয়াছে, আশা করি, আপনি তাহাদের সকলকেই সন্দেহ করেন না। আমাকেও রাজা পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

গো। বটে? আর কাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন?

ন। আর জনকত গরীব প্রজাকে কিছু কিছু দিয়া গিয়াছেন, বাকী সমস্তই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাইবেন।

গো। সে কত টাকা হইবে?

ন। প্রায় দুই লক্ষ টাকা নগদ, তাহা ছাড়া জমিদারী আছে।

গোবিন্দরাম একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "এত টাকা মনে করি নাই।"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, আমরাও জানিতাম না যে, তাঁহার এত টাকা ছিল, তবে তাঁহার স্ত্রী-পরিবার ছিল না, কাজেই খরচ কিছু ছিল না—সমস্ত টাকাই জমিত।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "যখন এত টাকা লইয়া কথা, তখন একজন যে ইহা পাইবার জন্য এরূপ অসমসাহসিকের কাজ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিছু মনে করিবেন না—মহাশয়, আবশ্যক সময় কিছু কিছু অন্যায়ও হয়; আর একটা কথা, যদি আমাদের এই নূতন রাজার কোন ভাল-মন্দ হয়, তাহা হইলে এ টাকা আর সম্পত্তি কে পাইবে?"

নলিনাক্ষ। রাজা অহিভূষণের ছোট ভাইএর সন্তানাদি নাই, তাহা হইলে নবীন বাবু বলিয়া তাহার একজন দূর-সম্পর্কীয় লোক আইনানুসারে উত্তরাধিকারী হইবেন।

গোবিন্দ। সমস্ত বিষয়ই জানা উচিত। আপনি এই নবীন বাবুকে কখনও দেখিয়াছেন?

ন। হাঁ, তিনি একবার রাজা অহিভূষণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়াই কাল কাটান। রাজা অহিভূষণ তাঁহাকে কিছু মাসহারা দিতে চাহিয়াছিলেন. কিন্তু তিনি তাহা লইতে সম্মত হন নাই; বলেন, তাঁহার কোনই অভাব নাই।

গো। তাহা হইলে এই ধার্ম্মিক বৃদ্ধই এই সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন।

ন। তিনি জমিদারের উত্তরাধিকারী সত্বে পাইবেন। তবে নগদ টাকা, রাজা মণিভূষণ তাহা কাহাকে যদি না দিয়া যান, তবে তিনিই পাইবেন; কারণ রাজা মণিভূষণ টাকা সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

গোবিন্দরাম মণিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন উইল করিয়াছেন?"

মণিভূষণ বলিলেন, "না, এই ত সম্প্রতি শুনিলাম যে, বিষয় পাইয়াছি। কখন উইল করিব? তবে যাহাই হউক, আমার মতে জমিদারী যে পাইবে, টাকাও তাহার পাওয়া উচিত, না হইলে জমিদারের মান-সম্ভ্রম বজায় করা কঠিন।"

গোবিন্দ। নন্দনপুরে টেলিগ্রাফ-আফিস আছে?

নলিনাক্ষ। না—দেবগ্রামে আছে।

গোবিন্দ। বেশ ভাল, অনুপকে একখানা টেলিগ্রাম করুন। আর একখানা দেবগ্রামের টেলিগ্রাফ আফিসে পাঠাইতে হইবে, তাহাতে লিখুন, অনুপের নামের টেলিগ্রামখানা যেন অনুপেরই হাতে দেওয়া হয়। আর যদি অনুপ গড়ে না থাকে, তবে টেলিগ্রাম যেন এইখানে ফেরৎ দেওয়া হয়। ইহাতেই আমরা জানিতে পারিব যে, অনুপ গড়ে আছে কি না।

রাজা বলিলেন, "হাঁ, এ বেশ কথা। নলিনাক্ষ বাবু—এই অনুপ কে?"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "অনুপের বাপ আপনাদের বংশের পুরাতন ভৃত্য ছিল; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে অনুপ গড়ের ভার পাইয়াছে। ইহারা বহুকাল হইতে আপনাদের চাকরী করিতেছে। অনুপ তাহার স্ত্রীকে লইয়া গড়ে থাকে, যতদূর আমি জানি, তাহাতে বলিতে পারি, তাহারা দুইজনই বড় ভাল লোক।"

রাজা বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে দেখিতেছি, যতদিন এই গড়ে কেহ মালিক না থাকে, ততদিন ইহারা এইখানে রাজার হালে মালিক হইয়া বাস করে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এ কথা ঠিক।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত রাজা অহিভূষণের উইলে এই অনুপ আর তাহার স্ত্রী কিছু পাইয়াছে?"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, পাইয়াছে বই কি। রাজা তাহাদের এক হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।"

গোবিন্দ। তাহারা যে এই টাকা পাইবে, তাহা কি তাহারা জানিত?

নলিনাক্ষ। হাঁ, রাজা অহিভূষণ তাহার উইলের কথা সকলকেই বলিয়াছিলেন।

গো। বটে—এটা প্রয়োজনীয় কথা বটে।

ন। যাহারা রাজা অহিভূষণের উইলের টাকা পাইয়াছে, আশা করি, আপনি তাহাদের সকলকেই সন্দেহ করেন না। আমাকেও রাজা পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

গো। বটে? আর কাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন?

ন। আর জনকত গরীব প্রজাকে কিছু কিছু দিয়া গিয়াছেন, বাকী সমস্তই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাইবেন।

গো। সে কত টাকা হইবে ?

ন। প্রায় দুই লক্ষ টাকা নগদ, তাহা ছাড়া জমিদারী আছে।

গোবিন্দরাম একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "এত টাকা মনে করি নাই।"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "হাঁ, আমরাও জানিতাম না যে, তাঁহার এত টাকা ছিল ; তবে তাঁহার স্ত্রী-পরিবার ছিল না ; কাজেই খরচ কিছু ছিল না—সমস্ত টাকাই জমিত।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "যখন এত টাকা লইয়া কথা, তখন একজন যে ইহা পাইবার জন্য এরূপ অসমসাহসিকের কাজ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? কিছু মনে করিবেন না—মহাশয়, আবশ্যক সময় কিছু কিছু অন্যায়ও হয় ; আর একটা কথা, যদি আমাদের এই নূতন রাজার কোন ভাল-মন্দ হয়, তাহা হইলে এ টাকা আর সম্পত্তি কে পাইবে ?"

নলিনাক্ষ। রাজা অহিভূষণের ছোট ভাইএর সন্তানাদি নাই, তাহা হইলে নবীন বাবু বলিয়া তাহার একজন দূর-সম্পর্কীয় লোক আইনানুসারে উত্তরাধিকারী হইবেন।

গোবিন্দ। সমস্ত বিষয়ই জানা উচিত। আপনি এই নবীন বাবুকে কখনও দেখিয়াছেন ?

ন। হাঁ, তিনি একবার রাজা অহিভূষণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়াই কাল কাটান। রাজা অহিভূষণ তাঁহাকে কিছু মাসহারা দিতে চাহিয়াছিলেন. কিন্তু তিনি তাহা লইতে সম্মত হন নাই ; বলেন, তাঁহার কোনই অভাব নাই।

গো। তাহা হইলে এই ধার্ম্মিক বৃদ্ধই এই সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন।

ন। তিনি জমিদারের উত্তরাধিকারী সত্বে পাইবেন। তবে নগদ টাকা, রাজা মণিভূষণ তাহা কাহাকে যদি না দিয়া যান, তবে তিনিই পাইবেন ; কারণ রাজা মণিভূষণ টাকা সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

গোবিন্দরাম মণিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন উইল করিয়াছেন ?"

মণিভূষণ বলিলেন, "না, এই ত সম্প্রতি শুনিলাম যে, বিষয় পাইয়াছি। কখন উইল করিব ? তবে যাহাই হউক, আমার মতে জমিদারী যে পাইবে, টাকাও তাহার পাওয়া উচিত, না হইলে জমিদারের মান-সম্ভ্রম বাজায় করা কঠিন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এ কথা ঠিক, এখন আমারও মত যে, আপনি নন্দনপুরে যান,—ইহাতে আর দেরী করা কোনমতে উচিত নয়; তবে একটা কথা বলিতে চাই, আপনার সেখানে কোনমতে একা যাওয়া উচিত নয়।"

মণিভূষণ বলিলেন, "ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু আমার সঙ্গে যাইতেছেন।"

গোবিন্দ। ডাক্তার বাবুর রোগী দেখা চাই; আর তাঁহার বাড়ীও আপনার গড় হইতে অনেক দূরে; তিনি শত চেষ্টা করিলেও হয় ত আবশ্যক মত সময়ে আপনার সাহায্য করিতে পারিবেন না। এমন কোন বিশেষ বিশ্বাসী লোককে আপনার সঙ্গে লওয়া উচিত, যে লোক সর্ব্বদা আপনার পাশে-পাশে থাকিতে পারিবে।

মণি। তাহা হইলে আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে যান।

গোবি। যদি তেমন-তেমন হয়, আমি নিশ্চয়ই আপনার দেশে যাইয়া উপস্থিত হইব; তবে আপনি ত বুঝিতেই পারেন যে, আমার হাতে সর্ব্বদাই কাজ থাকে—আমার সময় বড় অল্প; বিশেষতঃ এ সময়ে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার আমার কোন উপায় নাই।

মণি। তাহা হইলে কে আমার সঙ্গে যাইবে?

গোবিন্দরাম আমার পৃষ্ঠে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার পরম বন্ধু ডাক্তার সম্মত হন, তাহা হইলে সব চেয়ে ভালই হয়। আপনার সঙ্গে আমার থাকাও যাহা, আর ইঁহার থাকাও তাহাই। ইনি সঙ্গে থাকিলে আপনার বিপদের আশঙ্কা কম।"

সহসা এই প্রস্তাবে আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাজা মণিভূষণ আমার দুই হাত ধরিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে আমাকে চির-ঋণে আবদ্ধ করিবেন। আপনি ত আমার অবস্থা বুঝিতেই পারিতেছেন। যদি এ গোলযোগ কাটাইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে আপনার ঋণ কখনও ভুলিব না।"

আমার হাতে উপস্থিত কোনই কাজ ছিল না, আমি সম্মত হইলাম; বলিলাম, "যখন গোবিন্দরাম বাবু বলিতেছেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, সেখানে যাহা যাহা ঘটে, সমস্তই আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়ো। গুরুতর কিছু ঘটিলে তখন কি করিবে, তাহা আমি লিখিয়া পাঠাইব। কালই বোধ হয়, রওনা হইতে পারিবে।"

রাজা বলিলেন, "আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। এখন ডাক্তার বাবু প্রস্তুত হইলেই হয়।"

আমি বলিলাম, "আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে কাল রাত্রের গাড়ীতে রওনা হইব।"

আমরা বিদায় লইয়া দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এই সময়ে মণিভূষণ একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিলেন। আমরা ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি ঘরের কোণে একটা আলমারীর পাশ হইতে একটা জুতা টানিয়া বাহির করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, এই আমার সেই হারাণ জুতা।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান্ করুন, এইরূপ সহজেই আমাদের সমস্ত গোলযোগ কাটিয়া যাক্।"

ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি এই ঘর আগে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কিন্তু তখন জুতাটা পাই নাই।"

রাজাও বলিলেন, "আমি ত এ ঘর খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম।"

নলিনাক্ষ বলিলেন, "সে সময়ে নিশ্চয়ই জুতা ঘরে ছিল না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাদের খুঁজিবার পর বোধ হয়, কোন চাকর জুতা এখানে রাখিয়া গিয়াছে।"

রাজা ভৃত্যকে ডাকিলেন, কিন্তু ভৃত্য বলিতে পারিল না যে, কে এই জুতা এইখানে রাখিয়া গিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আর কিছু জানিবার নাই দেখিয়া আমরা দুইজনে বিদায় হইলাম। এই সকল রহস্যের গোপনীয় কোন অর্থই ভাবিয়া পাইলাম না। রাজা অহিভূষণের হঠাৎ মৃত্যু ব্যাপারটা বাদ দিলেও, আমরা এমন কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাইলাম—যাহার একটীরও অর্থ আমি ভাবিয়া পাইলাম না; প্রথম—সেই অদ্ভুত অক্ষরে আঁটা চিঠী, দ্বিতীয়—দাড়ীওয়ালা লোকটা, তৃতীয়—রাজার নূতন জুতার একখানা চুরি, চতুর্থ—তাহার পুরাতন জুতার একখানা চুরি, পঞ্চম—আবার নূতন জুতাখানা ফেরৎ পাওয়া—এ সকলের উদ্দেশ্য ও অর্থ কি, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গোবিন্দরামও এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। তিনি চিন্তিতমনে চলিলেন।

সেদিন সমস্ত দিনই তিনি নীরবে তাম্রকূট ধ্বংস করিলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি মনে মনে এই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন।

সন্ধ্যার সময় রাজার এক পত্র আসিল, তিনি লিখিয়াছেন ;—"এই মাত্র টেলিগ্রাম পাইলাম, অনুপ গড়েই আছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, যে সূত্রটা ধরিয়াছিলাম, তাহা ত ফস্কাইয়া গেল। তবে যখন ব্যাপারটা বিপরীত দিকে যায়, তখন সেই ব্যাপারটা লইয়া কাজ করিতেই অধিক উৎসাহ জন্মে। যাক, এখন আমাদের অন্য কোন সূত্রের চেষ্টায় থাকিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "এখনও আমাদের সেই কোচ্ম্যান্টা আছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহার গাড়ীর নম্বর মিউনিসিপ্যাল আফিসে লিখিয়া পাঠাইয়াছি ; বোধ হয়, এই একজন লোক আসিতেছে ; খুব সম্ভব আমার চিঠীর উত্তর।"

গোবিন্দরামের কথা শেষ হইতে-না-হইতে একজন লোক আমাদের সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পোষাক দেখিয়াই বুঝিলাম, সে কোচ্ম্যান। সে বলিল, "ট্যাক্স আফিস থেকে আমায় এই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল, এখানে কে আমায় না কি খুঁজেছে। এই দশ বৎসর গাড়ী হাঁকাচ্ছি, এ পর্য্যন্ত কেউ কিছু বল্‌তে পারেনি, তোমাদের কি বল্‌বার আছে, মশাই বল—আমার অনেক কাজ আছে।"

গোবিন্দরাম অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই ; বরং তোমাকে দুই-একটা টাকা দিতে আমি প্রস্তুত। আমার দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

টাকার কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত্তে লোকটার অত্যন্ত বিরস মুখ অত্যন্ত সরস হইল। লোকটা আকর্ণ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবু, কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাও ?"

গোবিন্দরাম প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কোথায় থাক ?"

কোচম্যান্ উত্তর করিল, "তালতলায় কাদের মোল্লার আস্তাবলে।"

প্রশ্ন। যে লোকটা কাল সকালে তোমার গাড়ীতে আমাদের এই বাড়ীর কাছে এসেছিল, তার পর এখান থেকে যে দুজন ভদ্র লোক বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের পিছনে তোমাকে যে গাড়ী নিয়ে যেতে বলেছিল, সে লোকটা কে ?

লোকটা এই কথায় বিস্মিতভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণপরে বলিল, "দেখ্‌ছি, তার বিষয় আমি যা জানি, তুমিও তা জান, মশাই !

সে বলেছিল, সে পুলিশের গোয়েন্দা, তার বিষয় কাকেও বল্‌তে আমায় বারণ করে দিয়েছিল।"

গোবিন্দরাম অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর, তুমি কিছু গোপন করিলে বিষম গোলে পড়িবে জানিও, লোকটা তোমায় বলিয়াছিল যে, সে একজন গোয়েন্দা?"

কোচম্যান্ উত্তর করিল, "হাঁ—এই কথাই সে আমায় বলে; তা' না হ'লে মশাই, আমি কি করে জান্‌ব?"

প্রশ্ন। কখন এ কথা তোমায় বলেছিল?

উত্তর। যখন সে গাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

প্রশ্ন। আর কিছু বলেছিল?

উত্তর। হাঁ, তার নামটা কি, তাও বলেছিল।

প্রশ্ন। ওঃ—নামও বলেছিল! তাই ত দেখ্‌ছি, লোকটা অসমসাহাসিক। কি নাম বলেছিল, বাপু?

উত্তর। বলেছিল, তার নাম গোবিন্দরাম।

সহসা ললাট, ভ্রূ, গণ্ড, ওষ্ঠ, নাসিকা কুঞ্চিত হওয়ায় গোবিন্দরামের মুখমণ্ডল এক অপরূপ ভঙ্গি পরিগ্রহ করিল। গোবিন্দরামকে আর কখনও এরূপ ভাব ধারণ করিতে দেখি নাই। কোচ্‌ম্যানের কথা শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ ভয়ানক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ডাক্তার, আমার উপরেও আছে—আছে থাক্"—(কোচম্যানের প্রতি) "কি বলেছিল, যে তার নাম গোবিন্দরাম?"

কোচম্যান্ উত্তর করিল, "হাঁ মশাই, এই নাম বলেছিল।"

প্রশ্ন। খুব ভাল, কোথায় সে তোমার গাড়ী ভাড়া করেছিল?

উত্তর। গোলদীঘীর ধারে, সে আমাকে বলে, সে যেমন যেমন বল্‌বে, ঠিক তেমনই গাড়ী যদি আমি নিয়ে যাই, তবে সে আমাকে পাঁচ টাকা দেবে, পাঁচ টাকার লোভ বড় লোভ, কি করি মশাই, আমি রাজি হলেম। তার পর তার কথা মত সেয়ালদার হোটেলে যাই, সেখানে হোটেল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে গাড়ী ভাড়া কর্‌লে, আমরা সেই গাড়ীর পিছনে পিছনে এখানে আসি।

প্রশ্ন। তারপর?

উত্তর। তারপর তারা এই বাড়ী থেকে নেমে এলে আমরা তাদের পিছু পিছু যাই।

প্র। তা জানি, তারপর?

উ। তারপর সেই লোক হঠাৎ বল্‌লে গাড়ী খুব হাঁকিয়ে হাবড়া ষ্টেশনে যা, আমি তখনই ঘোড়াকে চাবুক মেরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেম, তার পর হাবড়া ষ্টেশনে এসে সে আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে ষ্টেশনে যাবার সময় বল্‌লে, "তুই জানিস না, তোর গাড়ীতে আজ কে উঠেছিল, আমার নাম সেই সবজান্তা গোয়েন্দা—গোবিন্দরাম।"

প্র। বটে? তারপর আর তাকে দেখ নাই?

উ। না, ষ্টেশনে সে চলে গেলে আমিও হাবড়া থেকে চলে আসি।

প্র। তার চেহারা কেমন?

উ। চেহারা কেমন—তা ঠিক বল্‌তে পারি না; তবে বয়স বোধ হয়, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, মুখে খুব কালো দাড়ীর ঝোপ আছে।

প্র। এ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না?

উ। না, আর তত ভাল করে দেখিনি।

গোবিন্দরাম দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নাও, তোমার দুটা টাকা, আর যদি এই লোকটার কোন খবর পাও, দিয়ে যেয়ো, আরও কিছু পাবে।"

কোচম্যান্ গোবিন্দরামের প্রদত্ত টাকা দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলির নখাগ্রে বাজাইয়া পকেটে ফেলিল; পরে সেলাম করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ]

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

প্রয়াণ *।

মৃদুলগামিনী ধীরা মন্থরা তটিনী
উল্লসিয়া দুইকূল ঝঙ্কারি বহিছে—
সমীর নাচায় তীরে শ্যামল অঙ্গিনী
হসিতা ভূষিতা ধরা। আজিকে চলিছে
উন্মত্তা মরালী গাহি এ কোন রাগিণী?
এই সে মরণ গীতি? মুর্চ্ছনা ভাসিছে—
সমীরে সমীরে মরি আকুলিয়া দিশি।
নিভিতে কি চিরতরে এপুন্য জাগিছে!
তেমতি কি পুণ্যময়ি! অমিয়া পশরা
বিলাইয়া দুই হাতে আত্ম পরিজনে
চারিদিকে হাসিমুখ শান্তিময়ী ধরা
পুণ্যের আলোক মাঝে চলিলি মরণে?
অন্তিমে মরালী কণ্ঠে রাগিণী সমান
এত শান্তি, এত প্রীতি হ'তে অবসান!

শ্রীউমাচরণ ধর।

* বিগত ৬ই শ্রাবণ আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীমান্ চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। কবিতাটী তদুপলক্ষে বিরচিত।

রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়"।

মনীষার অধিকারী হইয়া সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকার অভিনয় করা চলিতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে হইলে কেবলমাত্র মনীষাই যথেষ্ট নহে। অপরের হৃদয়কে জয় করিতে হইলে আপনার হৃদয় এবং মুখ এককরা চাই। অপরের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে চলিবে না—আত্মবিশ্বাসী হওয়া চাই। শিবাজী ও ম্যাট্‌সিনী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এই কথার অনন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। অসাধারণ মনীষা এবং প্রগাঢ় প্রেম যাঁহাতে একত্রে মিলিত হইয়াছে, তিনিই কেবলমাত্র রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার অধিকারী। আর যিনি আত্মনিগ্রহের বিন্দুমাত্র উত্তাপ সহ্য করিতে ভীত, যিনি আপনাকে বাঁচাইয়া ত্যাগের দৃষ্টান্তের জন্য অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন,—তিনি যত বড়ই মনীষি হউন না কেন, তাঁহার এ পথে 'প্রবেশ নিষেধ'। কারণ, যেখানে আন্তরিকতার অভাব, সেখানে লঘুতাই প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যেখানে এই লঘুতা আশ্রয় লইয়াছে, সেখানে মতের প্রায়ই স্থিরতা দেখা যায় না—মত কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং এরূপ মনীষীর মতানুসারে কার্য্য করিতে গেলে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই অধিক।

আজ আমরা সেই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিয়াই রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়" নামক প্রবন্ধের আলোচনা করিতে বসিয়াছি। ইহাতে বোধ করি আমার কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হইবে না। কারণ তিনিই শিখাইয়াছেন,—

"অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

যে সকল উপকরণ করতালির অনুকূল, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ গুলিতে সে সকল উপকরণের অভাব নাই। তাহাতে ভাষার ঝঙ্কার, ভাবের ঘনঘটা, রাশি রাশি উপমা, এ সকলই আছে। এক একটি প্রবন্ধকে শব্দরঞ্জিত চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহাতে রাজনৈতিক রচনার যাহা প্রাণ—যুক্তি ও প্রাঞ্জলতা—তাহারই কিছু অভাব!

উপমা জিনিষটা কামধেনু,—তাহার দোহাই দিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী মতকে সমর্থন করা কঠিন ব্যাপার নহে। রবীন্দ্রনাথ এই উপমার মন্ত্র সিদ্ধ। তিনি যখন যে মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, তখন সেই মতকে

সমর্থন করিবার জন্য যুক্তির পরিবর্ত্তে রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়া পাঠক-বর্গকে মুগ্ধ করিয়া দেন। এবং সাধারণ পাঠকগণও তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, তাঁহার পূর্ব্বরচিত প্রবন্ধাবলীর বক্তব্য বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান প্রসূত মতগুলির ঐক্য কত দূর আছে, অত ভাবিবার অবকাশ পায় না। তাহারা তাঁহার উক্তিকে যুক্তিপূর্ণ অকাট্য সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে গেলে জলাশয়ের পরিবর্ত্তে মরীচিকাই অদৃষ্টে জুটিয়া থাকে। এবং আমরাও ঐ অহিতের আশঙ্কা করিয়াই দেখাইতে বসিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ যে শাখায় উপবেশন করিয়া থাকেন, সেই শাখারও কতবার মূলোচ্ছেদন করিয়াছেন।

মনে পড়ে আজ সে প্রায় আট নয় বৎসরের কথা—লর্ড ক্রসের বিলের আন্দোলন কালে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন,—"স্বার্থই যদি ইংরাজ ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা হইত যে, ক্রন্দন করিবার অবকাশও থাকিত না।" এই প্রবন্ধ পাঠের কিছুকাল পরে, লোকে বলে, তিনি যখন পুরীতে ফিরিঙ্গীটোলায় বাটী করিতে গিয়া ভগ্নাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়াছিল; সেই সময়ের অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব মত বিস্মৃত হইয়া "অত্যুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে ইংরাজের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ কালকার সাম্রাজ্য মদমত্ততার দিনে, ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত; আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। একথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে। তাই ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন প্রায়,......ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারতবর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানা প্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে,—আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্য ঘট যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ করিতেছে।" শুধু এই "অত্যুক্তি" প্রবন্ধ পড়িয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই। ইংরাজের প্রতি তাঁহার এই 'কড়িসুর' উত্তরোত্তর চড়িতেছিল। ইহার পর হইতে—"স্বার্থই যে ইংরাজের ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য" এই কথা তাঁহার প্রায় সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধে আবার সেই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"একটা জাতিকে, যে কোনো দিকেই হোক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্যমৈত্রী

স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই। ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে।.....ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশ বিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীর জাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না।......অ্যাংলোস্যাক্সন্ যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে ——অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিবরের এই 'কড়ি সুর' ক্রমশঃই সপ্তমে চড়িয়াছিল। 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'তে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও এই সুর অব্যাহত আছে। কিন্তু তাহার পর হইতেই সে সুর অন্তর্হিত হইয়াছে। ঘৃতাহুতি পাইয়া যে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই জ্বলন্ত আগুনে এক গণ্ডুষ জল পড়িবা মাত্র, তাহা নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলিতে হইবে কি সেই এক গণ্ডুষ জল—কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জাতীয় বিদ্যালয়" নামক প্রবন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকার্য্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না।..... আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য এবং কর্ম্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতে হইবে।"—সেই রবীন্দ্রনাথই জাতীয় বিদ্যালয়ের নিকট কতটুকু 'পূজা আহরণ' করিয়াছেন বলিতে পারি না; কিন্তু আজ দেখিতেছি, তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পূজা আহরণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। যে দিন হইতে তাঁহার দুই একখানি পুস্তক কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে দিন

হইতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন; সেই দিন হইতে তাঁহার 'কড়িস্বর' কোমলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই 'কোমল সুর' তাঁহার "ব্যাধি ও প্রতীকার" নামক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথম ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাহার পর, আমরা তাঁহার নিকট হইতে "পথ ও পাথেয়," "সমস্যা" এবং "সদুপায়" নামক তিনটি ভাবের স্রোতে ভাসমান প্রবন্ধ পাইয়াছি। এই তিনটি প্রবন্ধই পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই প্রবন্ধত্রয়ের উক্তির সহিত তাঁহার পূর্ব্বরচিত প্রবন্ধাবলীর উক্তির কোনই সামঞ্জস্য নাই। এক্ষণে তাঁহার শেষোক্ত 'সদুপায়' নামক প্রবন্ধটির আলোচনা করিলেই সে কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুবিধা অসুবিধা বিচার মাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার সাধনের কাছে আর কোনো ভাল মন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।......আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের (দেশের সাধারণ লোকের) কাছে যাই নাই যে, "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে, এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, "ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

"কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহা-দিগকে ভাই বলিয়া ডাক পড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।.....পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালাবাসা বশতঃই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে।" কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই আর একদিন—বড় অধিক দিনের কথা নহে— পাবনা সম্মিলনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন;—"যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না।

তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ **অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।**"

"আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদান প্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কংগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, **আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা,** এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলেও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।..."

"এমন সময় লর্ড কর্জ্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।"..."বাংলাকে যেমনি দুই খানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—**আমরা যে বাঙ্গালী, আমরা যে এক!** বাঙ্গালী কখন্ যে বাঙ্গালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে, তাহাত পূর্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

"আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া পড়িল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোন গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।"

"কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্ত ভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, **আমরা বিলাতি পণ্য-দ্রব্য ব্যবহার করিব না।**"

"আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা

ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি! এ যে সম্পদ! ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার।”

“শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জ্জন ব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।”

রবীন্দ্রবাবুর এই উক্তি এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ে, সম্পূর্ণ বিপরীত। একের প্রত্যেক লাইন অপরের প্রত্যেক লাইনের প্রতিবাদ করিতেছে, এক্ষণে আমাদের এই জিজ্ঞাসা যে তাঁহার কোন কথাটা সত্য? তিনি একবার বলিতেছেন যে ‘বিদেশী বর্জ্জন ব্যাপার অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। এ যে শক্তি! এ যে সম্পদ।” আবার এক্ষণে বলিতেছেন, “ইংরাজকে জব্দ করিব বলিয়াই দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।” এক্ষণে তাঁহার কোন্ উক্তিটা যথার্থ তাহাই আমরা জানিতে চাহি!

আগামীবারে সমাপ্য।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মিলনে বিচ্ছেদ।

(১)

কমলপুরের বিখ্যাত জমিদার দীনবন্ধু বাবু আজ গভীর চিন্তামগ্ন। তাঁহার এত প্রতাপ, গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা যেন সবই ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রোধ, বিস্ময়, স্নেহ প্রভৃতি তাঁহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া দিতেছিল। তাঁহার ঈদৃশ মানসিক অবস্থা দর্শনে কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছিল না। তাঁহার দেওয়ান গোবিন্দরাম তাঁহার আশৈশব বন্ধু। দীনবন্ধু বাবু তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহাকে জমিদারীর সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ক্রোধের সময় একমাত্র গোবিন্দরাম ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। দীনবন্ধুর এইরূপ ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দরাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"তোমাকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? ব্যাপার কি?" দীনবন্ধু বাবু কোন উত্তর না দিয়া গোবিন্দরামের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন; পাঠ করিবার জন্য গোবিন্দরাম পত্রখানি গ্রহণ করিল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"শ্রীচরণেষু—

আমার বিলাত যাইবার বাসনা বিশেষ বলবতী হওয়ায় বেনারস যাইবার নাম করিয়া আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়া অদ্য জাহাজে বিলাতযাত্রা করিতেছি। আপনার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই কাজটা করা যে আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে তাহা আমি বুঝি তত্রাচ আমি চিত্ত দমনে অসমর্থ হইয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। আমার এই কার্য্যের নিমিত্ত হয়ত সমাজে আপনাকে অপদস্থ হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় আপনি শঙ্কিত হইয়াছেন,—আমি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই পাপের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে আসিব। আপনার নামে এই শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, বিলাতে গিয়া হিন্দুসমাজ বিগর্হিত কোন কার্য্যই আমি করিব না—যতদূর সম্ভব হিন্দুয়ানি বজায় রাখিয়া চলিব। প্রত্যাগমন করিয়া আবার আপনার শ্রীচরণ সেবা করিব। অবাধ্য পুত্রকে মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ।"

পত্র পাঠান্তে গোবিন্দরাম বলিল—"তাইত বড়ই মুস্কিলের কথা দেখিতেছি!—যাক, ও কথা আর ভাববার দরকার নাই। উপেন্দ্রনাথ কিছু বালক নহে।"

দীনবন্ধু। "সে বালক নহে বটে কিন্তু আমার কাছে সে শিশুমাত্র। যখন আমার পত্নী বিয়োগ হয় তখন উপেন্দ্রের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। তার মুখ চেয়েই আমি আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করে উহাকে মানুষ করিলাম। পনের বৎসর বয়সে উহার বিবাহ দিলাম। পাছে উপেন্দ্রের নিকট তাহার নিরক্ষরা পত্নী 'কণিকা' অবজ্ঞাত হয়, এই ভাবিয়া আমি তাহাকে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুশিক্ষিতা করিলাম। হায়! হায়! আমার এত যত্নের এই ফল হইল!" এই কথা বলিতে বলিতে দীনবন্ধুর

দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দীনবন্ধুর কুল-পুরোহিত রঘুনন্দন শাস্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বিলাতযাত্রার বিপক্ষে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকসম্বলিত অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিলেন। ইন্ধনে ঘৃতাহুতি পড়িল। দীনবন্ধু বাবুর হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল. তিনি একমাত্র পুত্র উপেন্দ্রনাথকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া স্বয়ং তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। অন্দরের মধ্যে কণিকাও খুব কাঁদিতেছিল। সে ভাবিতেছিল "হে ঈশ্বর কি করিলে! কি পাপে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ হইল!!" আবার যখন তাহার মনে হইতেছিল যে উপেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে একটা মেম বিবাহ করিয়া আনিবে, তখন তাহার হৃদয় যেন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল।

(২)

পুত্রের অবাধ্যতায় দীনবন্ধু বাবুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল, সংসার তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত কণিকার নামে উইল করিয়া দিয়া কাশীবাস করিবেন স্থির করিলেন এবং উইলে স্বাক্ষর করিবার জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইলে রঘুনন্দন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন "যে বিলাত যাত্রা করিয়াছে, সে আর হিন্দু রহিবে কেমন করিয়া ? সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে কি ?" অপরাপর অনেকেই দীনবন্ধু বাবুর সঙ্কল্পের প্রতিকূলে মত দিলেন এবং কালীপ্রসন্ন নামক একজন বলিলেন,—উপেন্দ্রনাথের বিলাত গমন শাস্ত্রসঙ্গত কি অসঙ্গত, সে বিচার আমরা করিতে বসি নাই, আমরা সমাজকে কেবল মাত্র এই কথা বলিতে চাই যে ভারতের সুসন্তান বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, সিবিলিয়ন, ডাক্তার প্রভৃতিকে সমাজ হইতে বর্জ্জন করিলে সমাজ কি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না ? সমাজ কি কেবলমাত্র উকীল মোক্তার ও নির্জ্জীব কেরাণীকুল সমষ্টিতে গঠিত হইবে ?

রঘু। তবে কি আপনি বলিতে চান যে কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মূর্খ লোকে বসতি করে ? ব্যারিষ্টার না হইলে কি আমাদের চলিত না ? আমাদের দেশে কিসের অভাব ছিল ?

কালী। তাঁহারা মূর্খ একথা আমি বলি না——তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং আছেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের কি পরিমাণ উন্নতি করিতেছেন তাহাত কাহারও অজ্ঞাত নাই।

আমাদের কেবলমাত্র গৌরব আমাদের কিসের অভাব "ছিল"। এই "ছিল" র গর্ব্ব না কমাইলে আমরা মানুষ হইতে পারিব না——"

তাঁহাকে বাধা দিয়া একটী ভদ্রলোক মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহাশয় চুপ করুন, এ তর্কের সময় নহে, আসুন যাহাতে দীনবন্ধু বাবু উপেন্দ্র নাথকে বিষয় হইতে বঞ্চিত না করেন সেই বিষয়েই চেষ্টা করা যাক।" তখন সকলেই আসল কাজের কথা পাড়িলেন এবং উপেন্দ্রনাথকে বিষয় হইতে বঞ্চিত না করিবার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে অনুরোধ করিলেন। দীনবন্ধু বাবু বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন——"মহাশয় অবাধ্য পুত্রকে গৃহে স্থান দিব না ইহা আমার পণ, আমাকে বৃথা অনুরোধ করিবেন না।" এবং সকলের সমক্ষে উইল বাহির করিলেন।

উইলের মর্ম্ম—(১) উপেন্দ্রনাথ দীনবন্ধু বাবুর বিষয় হইতে বঞ্চিত হইল (২) উপেন্দ্রনাথ দীনবন্ধু বাবুর বাটিতে প্রবেশাধিকার পাইবে না (৩) বিষয় সমস্তই কণিকার হইবে, উপেন্দ্র তাহা হইতে কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না (৪) তাঁহার বৃদ্ধ দেওয়ান বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। আরও ছোট খাট অনেকগুলি সর্ত্ত ছিল। উইল যথারীতি স্বাক্ষরিত হইল!

কণিকা শত অনুরোধেও দীনবন্ধু বাবুর মন টলাইতে পারিল না। দীনবন্ধু বাবু কাশীবাসী হইলেন, কণিকা কাঁদিতে লাগিল।

(৩)

উপেন্দ্রনাথ যথাসময়ে একটি হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন এবং ২।১ দিন সঙ্কল্পমত কার্য্যও করিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্যে হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী বিস্মিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার কন্যা মেরী উভয়েই তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিলে তাহার অনর্থক সময় ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হইবে। পরন্তু তাহার এরূপ জাতিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া তাহার উপর দুই একটা বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতেও কৃপণতা করিলেন না। মেরী উপেন্দ্রকে হোটেলে আহার করিতে অনুরোধ করিল। উপেন্দ্রনাথ মেরীর কথা ঠেলিতে সাহস করিল না। একে মেরী সুন্দরী, তাহার উপর মিষ্টভাষী বিনয়ী ও বিদুষী। সে কেমন করিয়া তাহার অনুরোধ ঠেলিবে?

প্রথম হইতে দেখিয়াই মেরী উপেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিল (?)। কিন্তু যখন সে পরিচয়ে জানিতে পারিল উপেন্দ্রনাথ একজন ধনীর সন্তান, তখন তাহার

তরল ভালবাসাটা জমাট বাঁধিবার মত হইয়াছিল। সে তিন চারিটা কোর্টশিপ করিয়াছে কিন্তু এমন মনের মত মানুষ সে পায় নাই। সে ছায়ারূপে উপেন্দ্রের সঙ্গিনী হইল। উপেন্দ্র তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না অথবা পারিলেও সে সে বিষয়ে মাথা ঘামাইত না।

উপেন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌছিয়াই তাহার পিতাকে ও পত্নীকে দুই খানি পত্র লিখিল। সে তাহার পিতার নিকট কোন উত্তর পায় নাই, কেবল কণিকার পত্রে সে তাহার পিতার উইলের কথা ও তাঁহার দেশত্যাগের সংবাদ সমস্তই জানিতে পারিয়াছিল। তাহার পিতার দেশত্যাগ সংবাদে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। মনে মনে স্থির করিল দেশে প্রত্যাগমন করিয়াই সে তাহার পিতার পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিবে। তাহার পর উপেন্দ্রনাথ প্রতিমেলে পত্র লিখিত, কণিকাও প্রতিমেলে তাহার উত্তর দিত। পত্র লেখাটা ইংরেজীতেই চলিত। কণিকার ভয় হইত কি জানি বাঙ্গালায় পত্র লিখিলে যদি তাহার স্বামী বিরক্ত হন। এইরূপে ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইল। তখন মেরীর ভালবাসাটা জমাট বাঁধিতেছে। এই সময়ে কণিকার লিখিত একখানি পত্র মেরীর হাতে পড়ে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মেরী গোপনে সেই পত্র উন্মোচন করিয়া উহা পাঠ করিল এবং বুঝিতে পারিল যে পত্রখানি উপেন্দ্রের পত্নী লিখিয়াছে। মেরীর হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সে দেখিল তাহার এতদিনের আশা বুঝি বা বিফল হয়! কিন্তু সে ইংরাজ মহিলা। সহজে হটিবার পাত্রী নহে। সে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল।

(৪)

দুষ্টের কৌশলের অভাব হয় না। মেরী তদবধি কণিকা ও উপেন্দ্রনাথ উভয়ের সমস্ত পত্রই হস্তগত করিত ও গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিত। উপেন্দ্রনাথের পরিচারককে গোপনে হুকুম দিয়াছিল যে উপেন্দ্র তাহাকে যে কোন পত্র বা কাগজ ডাকঘরে ফেলিবার জন্য প্রদান করিবে সে যেন উহা তাহার হস্তে প্রদান করে। কণিকার পত্র হস্তগত করিতে তাহাকে বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় নাই। হোটেলে একটী চিঠির বাক্স ছিল, তাহার চাবি মেরীর হস্তে। হোটেলের কাহারও নামে কোন পত্র থাকিলে ডাকপিয়ন সেই বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিত, মেরী সেই পত্রগুলি বাহির করিয়া যাহার যে পত্র তাহাকে তাহা প্রদান করিত।

মেরীর এই কৌশলে উপেন্দ্রনাথ দুই মাসকাল কণিকার নিকট কোন পত্র পায় নাই। রেজিষ্টারি করিয়া পত্র লিখিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না তখন উপেন্দ্র বিশেষ ভাবিত হইল। বাটীর সংবাদ অবগত হইবার জন্য সে গোবিন্দরামের নামে টেলিগ্রাম করিল। মেরী সেই টেলিগ্রামের ফরম্‌টা নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে লিখিয়া দিল—"হঠাৎ উপেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার শবদেহটি তোমাদের নিকট পাঠাইব, না এই স্থানেই সৎকার করা হইবে?" উত্তর আসিল—"মৃতদেহ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, সেইখানেই সৎকার করা হউক।" মেরী সেই টেলিগ্রামটী নষ্ট করিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্ত্তে সে নিজে উপেন্দ্রকে একখানি টেলিগ্রাম করিল; তাহার ভাবার্থ—"তোমার পত্নী প্রায় দেড়মাস রোগে ভুগিতেছিল, এক সপ্তাহ হইল তাহাব মৃত্যু হইয়াছে"—উপেন্দ্র দেখিল গোবিন্দরাম টেলিগ্রাম করিতেছে কিন্তু কোন স্থান হইতে উহা আসিতেছে সে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই চক্ষু মুদিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল।

এই ঘটনার পর উপেন্দ্রনাথ আর বাটী ফিরিবে না এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ লণ্ডনে অতিবাহিত করিবে এইরূপ স্থির করিল। একদিন কথায় কথায় উপেন্দ্রনাথ এই ভাবের কথা মেরীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল।

মেরীর আর আনন্দ ধরে না। তাহার কৌশল ফলবতী হইয়াছে। সে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। সে বুঝিল এই উপযুক্ত অবসর; এই সময় উপেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে পারিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যদি উপেন্দ্রনাথ কখনও ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে তখন মেরী তাহার সহিত গমন করিবে এবং যখন সে দেখিবে তাহার পত্নী জীবিত রহিয়াছে তখন আমাকে প্রভূত অর্থদানে তুষ্ট করিতে বাধ্য হইবে। শয়তানী মেরী ভবিষ্যৎ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল।

(৫)

এই ঘটনার পর প্রায় ছয় মাসকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এখন পড়াশুনায় উপেন্দ্রনাথের আর মন নাই। সে একদিন একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া গভীর চিন্তা মগ্ন। দেশে প্রত্যাগমন করিবে কি না এই তাহার চিন্তা; যখন তাহার মনে হইল যে তাহার পিতা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সংসারে ছিল এবং সে স্বয়ং তাঁহার সংসার ত্যাগের কারণ—যখন তাহার মনে হইল তাহার কণিকা তাহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই

রোগে কষ্টে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে—তখন একবার বাড়ী যাইতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল, না আর দেশে ফিরিব না—দেশে গিয়া কি দেখিব! দেখিব গৃহ শ্মশান ভূমি। আবার ভাবিল না দেশে ফিরিতে হইবে তাহার পর দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পিতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বিরোধে ইচ্ছাই জয়ী হইল। সুতরাং উপেন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাগমনই স্থির করিল।

মেরী এই কয়েক মাস কাল উপেন্দ্রনাথকে চোখে চোখে রাখিয়াছিল—অদ্যও সে তাহার বিশেষ ভাব বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিতেছিল। সে হঠাৎ একেবারে উপেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল, উপেন্দ্রনাথ তাহাকে কোনরূপ অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র সজল নয়নে উদাসভাবে মেরীর মুখের দিকে চাহিল। মেরী তখন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উপেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল—আপনার কামরায় আপনার বিনানুমতিতে আসিয়াছি, মাপ করিবেন।

উপেন্দ্রনাথ অমনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া কহিল—মিস্ মেরী কোন অপরাধ লইবেন না আমি একটা বিষয়ে বড়ই চিন্তামগ্ন ছিলাম; অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উপবেশন করুন।

মেরী। আপনাকে ধন্যবাদ! এক্ষণে, মিঃ রায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি আপনাকে আজ এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কোন পারিবারিক অমঙ্গল সংবাদ নাই তো?

উপেন। আমার আর মঙ্গল অমঙ্গল কি মিস্ মেরী! পৃথিবীতে আমার আপনার বলিবার কেহ নাই, অদৃষ্টদোষে এখন প্রকৃতপক্ষে আমি পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজনবর্জ্জিত, নির্ব্বাসিত—

মেরী। আমি আপনার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনাকে সান্ত্বনা দিবার কি কেহ নাই?

"না—" এই বলিয়া উপেন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। মেরী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল——"যখন আপনার কষ্ট হইতেছে তখন আর উহা বলিবার আবশ্যক নাই।"

উপেন। আমার আবার কষ্ট কিসের মিস্ মেরী—আমি স্বেচ্ছায় সব বিসর্জ্জন দিয়েছি এখন আর কষ্ট বোধ করিলে চলিবে কেন! উপস্থিত আমি মনে করেছি এই মেলেই দেশে ফিরিব—

মেরী বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিল—কি এই মেলেই! এত শীঘ্র!

উপেন। হাঁ, আমাকে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে!

মেরী। কেন তাহা হইলে আপনার পরীক্ষার কি কর্‌বেন?

উপেন। আর কিসের জন্য পড়ব—পড়ে কি করব।

মেরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শয়তানী ভাবিতে লাগিল, এ কি হইল! তাহার এত কৌশল এত আশা সবই নিমেষে ভাসিয়া গেল! তত্রাচ সে আশা একবারে ত্যাগ করিতে না পারিয়া উপেন্দ্রকে কহিল—আপনার যদি দেশে যাওয়াই একান্ত স্থির হয় তা'হ'লে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন না কেন, অনেকদিন হইতে আমার ভারতবর্ষ দেখিবার বড় সাধ আছে।

উপেন্দ্র। অন্য সময় হইলে আপনার কথা আমি সাদরে গ্রহণ করিতাম কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এক্ষণে আমার সে সময় নহে। সেখানে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই বলিলেও চলে তাহার উপর আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিব—ঈশ্বর যদি দিন দেন তাহা হইলে আপনাকে আমি আসিয়া সমাদরে লইয়া যাইব। উপস্থিত আমাকে ক্ষমা করুন।

উপেন্দ্রের কথায় শয়তানী মেরীরও কষ্ট হইল। সে এইবার তাহার ক্ষীণ আশাটুকু ত্যাগ করিয়া বিমর্ষভাবে সজলনেত্রে কহিল—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

(৬)

যথাসময়ে উপেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে যাত্রা করিল। জাহাজও সমুদ্রবক্ষে চলিতে লাগিল, সেও চিন্তাসাগরে ভাসমান হইল। একে একে তাহার পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যদি সে ব্যারিষ্টার হইবার চেষ্টা না করিত তাহা হইলে কি সে তাহার পিতার অতুল সম্পত্তিতে দেশের কোন উপকার করিতে পারিত না? তাহার পর ভাবিতে লাগিল তাহারই ব্যবহারে তাহার পিতা দেশত্যাগী, পত্নী পরলোকগতা। এই সমস্ত চিন্তায় তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার মত হইল। ১৭।১৮ দিবস এইরূপ চিন্তামগ্ন থাকিয়া উপেন্দ্রনাথ বম্বে বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিল।

জাহাজ হইতে ভারতবর্ষের মাটীতে পদার্পণ করিতেই তাহার হৃদয় গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল বাটীতে গিয়া সে কি দেখিবে—দেখিবে যে তাহার চির আদরের আবাসস্থল হয়ত শৃগাল কুকুরের বাসভূমি হইয়াছে! তাহার

হৃদয় এতদূর কাতর হইয়া উঠিয়াছিল যে সে পথে আর কোনরূপ কালবিলম্ব না করিয়া কমলপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

উপেন্দ্রনাথ যখন গ্রামে প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে দেখিল যে গ্রামের প্রান্তস্থিত বিদ্যালয় গৃহটী ঠিক তেমনই রহিয়াছে তবে যেন কাহার অভাবে বিমর্ষ দেখাইতেছে—চিরপরিচিত গ্রাম্যপথ গুলি—তাহার আদরের আম্র কানন প্রভৃতি যেমন সবই আছে তবে যেন কিছু বিমর্ষভাব। সে দেখিল ঘোষেদের বাটীর সম্মুখস্থিত কদম্ববৃক্ষের বেদীর উপর কতকগুলি লোক গুরুতর তর্কে নিমগ্ন; তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে "রঘুনন্দন কি একটা মানুষ! তাহার কথার বা অভিমতের মূল্য কি? যে সামান্য অর্থের লোভে আপনার মান সম্ভ্রম বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই অপব্যবহার করিতে পারে তাহার মত অপদার্থ লোক কি কেহ আছে? এই দেখ না সে দিন যেমন উপেন্দ্রনাথ বিলাত গমন করিল সে কত প্রমাণ কত শাস্ত্রযুক্তি আওড়াইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিল সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয়। তাহাকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা অসম্ভব সুতরাং তাহার পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিল। আর আজ সামান্য অর্থের লোভে সকলকে বুঝাইতে আসিল বিধবার বিবাহ হইতে পারে; উহা অশাস্ত্রীয় নহে। যাহার মতের মূল্য এইরূপ সে পৃথিবীতে কি না করিতে পারে?"

উপেন্দ্রনাথ তাহাদের কথাগুলি স্পষ্টই শুনিতে পাইয়াছিল কিন্তু বাটী যাইবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ায় সে তথায় আর আত্মপ্রকাশ না করিয়া সমান গৃহাভিমুখে গমন করিল।

(৭)

দূর হইতে বাটীর অবস্থা দেখিয়া উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল! কোথায় ভাবিয়াছিল সে দেখিবে যে তাহার বাটির প্রাচীরে অশত্থগাছ হইয়াছে, কোথায় দেখিবে বাটীর দরজা তালাবদ্ধ, শৃগাল কুকুর গমনাগমন করিতেছে তাহার পরিবর্ত্তে একি! বাটী পত্রপল্লব ও আলোকমালায় সুশোভিত; বহির্ব্বাটীর দরজায় ব্যাণ্ড বসিয়াছে দূরে সানাই বাজিতেছে! তবে কি তাহার পিতার কোন বন্ধু বিলাত হইতে তাঁহাকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং আমার প্রত্যাগমনের জন্য কি এইরূপ আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে উপেন্দ্রনাথ বাটীর ফটকে উপস্থিত হইল এবং ফটক পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। তখন একজন দারোয়ান আসিয়া উপেন্দ্রের গতিরোধ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপ্‌কো পাশ?

উপেন। পাশ কি ? কিসের পাশ ?

দারোয়ান। আজ হিঁয়াপর থ্যাটার্ কো তামাসা হো রহা বিনা পাশমে জানেকা হুকুম নাই মেরা ক্যা কসুর ?

উপেন্দ্রনাথ দেখিল দারোয়ানটী নূতন। সুতরাং সে তাহাকে কোনরূপে চিনিতে পারিবে না। তখন উপেন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া দারোয়ানের হাতে একটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল—"জি হামলোক্ পাড়াগেঁয়ে লোক হ্যা কখন থ্যাটার ট্যাটার নাই দেখা, ভেতরমে যেতে দাও না।" দারোয়ান তখন উপেন্দ্রনাথকে একটা মস্ত সেলাম ঠুকিয়া বলিল—যাইয়ে হুজুর যাইয়ে। উপেন্দ্রনাথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দেখিল—একজোড়া কৃত্রিম গুম্ফ পড়িয়া রহিয়াছে বোধ হয় থিয়েটারওয়ালার মধ্যে কেহ ফেলিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া সেটা নাসিকার সহিত সংযোগ করিয়া দিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিল। তৎপরে ধীরে ধীরে অভিনয়স্থলে গিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

(৮)

উপেন্দ্রনাথ দেখিল তথায় বৃদ্ধ দেওয়ান গোবিন্দরাম আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে। একবার একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে গোবিন্দরামের নিকট আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু সে শুনিয়াছিল যে তাহার পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া গোবিন্দরামকে বিষয়ের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার বাটী প্রবেশও নিষেধ ছিল। সে ভাবিল এ অবস্থায় সে যদি গোবিন্দরামের নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ত হীন হইতে হইবে। উপেন্দ্রনাথ আরও ভাবিল হয়ত তাহাদের বাটীতে কোন বিগ্রহাদি পূজা, অথবা অন্য কোন কারণে উৎসবাদি হইতেছে তাহার উপস্থিতে হয়ত সেখানে গোলযোগ ও ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা কারণ সে বিলাত ফেরত। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে গোবিন্দরামের নিকট যাইতে পারিতেছে না। অদৃষ্ট দোষে নিজের বাটীতেই নিজেকে চোরের ন্যায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তাহার পশ্চাতে দুই জন ভদ্রলোক ফিস্ ফিস্ করিয়া অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে। সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে "কণিকার" নামটী তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। উপেন্দ্র তখন নিবিষ্টচিত্তে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিল। একজন বলিল—কণিকার কাজটা ভাল হয় নি।

অপর ভদ্রলোকটী বলিল—"তা'ত নিশ্চয় মোটে ৬।৭ মাস হইল উপেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে !"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া উপেন্দ্রনাথ চমকাইয়া উঠিল! কণিকার কাজটা ভাল হয় নি, তবে কি কণিকা আজও জীবিতা!—হইতে পারে আমাকে দেশে ফিরাইবার জন্য কণিকার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কেহ আমাকে সংবাদ দিয়াছে কিন্তু আমার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া কাহার কি ইষ্টসাধন হইবে। আমার বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, হ'তে পারে।

উপেন্দ্রনাথ সমস্ত সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যে গিয়া তাহার বন্ধু অনিলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য উপেন্দ্রনাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিতেছে, হঠাৎ বোধ হইল বাটীর দ্বিতলে তাহারই প্রকোষ্ঠের জানালায় একটী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ের সহিত দেখিল রমণী কণিকা! তখন সে আত্মবিস্মৃত হইয়া সিঁড়ির উপর দিয়া ছুটিয়া কণিকার নিকট যাইতে লাগিল—বাটীর একজন পরিচারক একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্দরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোর চোর করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহার সেই চীৎকারে গোবিন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোকও ভৃত্যের পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রধাবিত হইল—উপেন্দ্রনাথ তখন কণিকার কক্ষে। সে একেবারে কণিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আবেগে কহিল—কণিকা! কণিকা! তুমি এখনও জীবিতা; বল সত্যই তুমি জীবিতা! কণিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল —কেরে পাপিষ্ঠ পরনারীর গাত্রস্পর্শ করিতে সাহস করিস!

দূরে পালঙ্কের উপর রাশি রাশি সুগন্ধ পুষ্প বিক্ষিপ্ত দুগ্ধফেননিভ 'ফুল শয্যা'য় উপেন্দ্রের অন্তরঙ্গ অনিল ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত ছিল। সে এই চীৎকারে "কি হয়েছে" "কি হয়েছে" বলিয়া উঠিয়া আসিল। উপেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া ভাবিল কি আশ্চর্য্য আমার শয়ন ঘরে অনিল কেন! সে বজ্র গম্ভীরস্বরে কহিল—"কণিকা এ কি!"

কণিকা এইবার উপেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরটী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল। গুম্ফটাও এই সময় তাহার নাসিকাচ্যুত হইয়াছিল। সে দেখিল সম্মুখে উপেন্দ্রনাথ, পার্শ্বে অনিলচন্দ্র। উপেন্দ্রকে দেখিয়া অনিলচন্দ্র কিয়ৎকাল কোন কথা না কহিয়া নির্ব্বাকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল তাহাকে চিনিয়াও চিনিল না। কণিকা কেবল উপেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল—তুমি বেঁচে আছ!

অনিল এই সময় কণিকাকে কহিল—তুমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছ, তুমি কি ভুলে গেছ উপেন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে! পরপুরুষের সহিত তোমার বাক্যালাপ

করা কর্ত্তব্য নহে কারণ তুমি হিন্দুরমণী, কুলস্ত্রী। এখন আমিই তোমার স্বামী।

বাটীর পরিচারকের সহিত চোর ধরিতে আসিয়া গোবিন্দরাম উপেন্দ্রনাথকে দেখিল ও অতি বিস্ময়ে কহিল—"একি ! তুমি !!"

উপেন্দ্রনাথের আর কোন কথা জানিতে বাকী রহিল না। সে অনিলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আর কণিকা ! সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল ! সে মূর্চ্ছা গিয়াছিল কিনা জানি না ; তবে দেশে "বিধবা বিবাহের" জয় জয়কার পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

শেরসাহ।

রাজপথে শান্তিরক্ষার জন্য শেরসাহ এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পথে দস্যুতা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানিতে পারে। সুতরাং তিনি গ্রামের কর্ত্তা মকদ্দমদিগকে চুরি ডাকাতির জন্য দায়ী করিতেন। তাহারা যদি চোর ধরিয়া দিতে না পারিত তাহা হইলে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হইত। এ সম্বন্ধে তারিখি দাউদী নামক গ্রন্থে দুইটি সুন্দর গল্প আছে। একদা থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটি শিবির হইতে শেরসাহের একটি অশ্ব অপহৃত হইয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ অনুমতি দিলেন যে শিবিরের চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যত জমিদার আছে তাহারা রাজসভায় আহূত হউক। জমিদারবর্গ রাজশিবিরে সমবেত হইলে শেরসাহ বলিলেন "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ চোর এবং অপহৃত অশ্ব আনিয়া অচিরে উপস্থিত করিতে না পারেন তাহা হইলে আমি সকলের প্রাণদণ্ড করিব।" প্রাণ ভয়ে সকলেই চোর ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে চোর ও অশ্ব রাজসমীপে নীত হইল।

আর একবার এটোবার নিকট রাজপথে একটি নরহত্যা হইয়াছিল। যেস্থলে মৃতদেহ পাওয়া গেল সে স্থলটি কোন্ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। উভয় গ্রামই সময়ে সময়ে সেই জমিটুকু দাবী করিত। শেরসাহ বলিলেন—"কোন্ গ্রামের লোক এস্থলে অধিক দৃষ্টি রাখে তাহা আমি এখনি স্থির করিয়া দিতেছি।" তিনি গোপনে দুইজন ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা ঐস্থলে গিয়া একটি গাছ কাটিতে আরম্ভ কর। তাহারা গাছ কাটিতে আরম্ভ করিলে একটি গ্রামের মকদ্দম আসিয়া তাহাদিগকে গাছ কাটিতে নিষেধ করিল। অমনি বাদসাহের দূতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া শেরসাহের নিকট উপস্থিত করিল। সম্রাট হাসিয়া বলিলেন—"বাপু গ্রামের বাহিরে দুই জন লোকে সামান্য একটা গাছ কাটিতেছে, এ সংবাদ তোমার নিকট পঁহুছিল, আর উহারই সন্নিকটে একটা নরহত্যা সাধিত হইল এ কথাটা তোমার কাণে প্রবেশ করিল না? হত্যাকারীকে বাহির করিতে না পারিলে তোমার গ্রামের কাহারও নিস্তার নাই।" হতভাগ্য গ্রামবাসিগণ রাজকোপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য হত্যাকারীকে ধরিয়া আনিয়া দিল।

কোনও পথিক বা সওদাগর পথিমধ্যে কালকবলিত হইলে যদি কেহ তাহার ধনাপহরণ করিত তাহা হইলে সে ব্যক্তি অত্যন্ত অধিক শাস্তি পাইত। কোনও রাজকর্ম্মচারী যদি বাজার দর অপেক্ষা সুলভে কোনও দ্রব্য জোর করিয়া খরিদ করিত তাহা হইলেও তাহার অত্যন্ত শাস্তি হইত।

শেরসাহের পূর্ত্তকার্য্য কেবলমাত্র রাজপথ নির্ম্মাণেই শেষ হয় নাই। লাহোর হইতে খোরাসানের পথে তিনি "নূতন রোটাস" নামক একটি সুদৃঢ় কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রোটাসের ন্যায় সবল দুর্গ ভারতবর্ষে অত্যল্প আছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যেস্থলে এ দুর্গটি অবস্থিত তথায় অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর অত্যন্ত বিরল ছিল। শের-সাহের কর্ম্মচারিগণ লিখিয়া পাঠাইলেন—"জাঁহাপনা, প্রস্তর খণ্ডের অভাবে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" লিপি পাঠে সম্রাট আজ্ঞা দিলেন—"অর্থাভাবে যেন কার্য্য বন্ধ না থাকে, যে প্রকারে পার, প্রস্তর সংগ্রহ কর। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর প্রত্যেক শিলাখণ্ডের মূল্য স্বরূপ সেই ওজনের তাম্রমুদ্রা প্রদান করিবে।" বলা বাহুল্য, এরূপ আজ্ঞার পর

কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে আর কোনওরূপ অন্তরায় রহিল না। যথাসময়ে দুর্গ নির্ম্মিত হইল। "তারিখি দাউদী" নামক ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আট ক্রোড় পাঁচ লক্ষ, পাঁচ হাজার দুই দাম ব্যয়িত হইয়াছিল।

বীর শেরসাহের পক্ষে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস যে অত্যন্ত বলবতী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি আমি দীর্ঘজীবি হই তাহা হইলে প্রত্যেক সরকারে এক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিব। রোটাস দুর্গ ব্যতিরেকে তিনি দিল্লীতে যমুনার তীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাতন কনৌজ নগর ধ্বংস করিয়া তিনি তথায় একটি ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "তারিখে শেরসাহি" প্রণেতা আব্বাস খাঁ বলেন—"পুরাণ সহর ধ্বংস করিবার কোনও সন্তোষজনক কারণ তো আমি দেখি না। এই কার্য্যটি সাধারণের অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল।" যেস্থলে তিনি যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, সে স্থানে শেরসুর নামক একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহন কস্তল ও শেরকোহ নামক আরও দুইটি কেল্লা নাকি তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তারিখে দাউদী নামক ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে তিনি পাটনায় গঙ্গাতীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিহার সহরের সমৃদ্ধি পাটনায় আসিয়াছিল।

হিন্দুস্থানের অপরাপর মুসলমান বাদসাহের মত সম্রাট শেরসাহ সুর ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি বলিতেন—"ইমামদিগকে ভূমি দান করা রাজার কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের নগররাজির সমৃদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধি ইমাম ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের উপর নির্ভর করে।" কিন্তু সাধারণতঃ ইমামদিগকে ভক্তি করিলেও তিনি তাহাদিগের অযথা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে ইব্রাহিম সাহের সময় হইতেই অনেক ইমাম আমিলদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া আপনাপন হক্ অপেক্ষা অধিক জমি উপভোগ করিতেছে। এই সংবাদে তিনি স্বয়ং এ বিষয় তদন্ত করিয়া যাহার যতটুকু ভূমিতে প্রকৃত অধিকার ছিল তাহাকে ততটুকু জমি প্রদান করিয়াছিলেন। তবে তিনি কাহাকেও একেবারে ভূমিশূন্য করেন নাই। তাহার পর প্রত্যেককে পাথেয় প্রদান করিয়া তিনি স্ব স্ব দেশে

পাঠাইয়া দিলেন। এই সকল ইমামদিগের প্রতি শেরসাহের তাদৃশ ভক্তি ছিল না। তাহাদিগের হস্তে বিচার ফল সম্বলিত ফারমন দিলে পাছে তাহারা কোনওরূপ প্রবঞ্চনা করে এই আশঙ্কায় শেরসাহ প্রত্যেক পরগণায় শিকদারকে পত্রে বিবৃত করিয়া যাবতীয় ফারমন তাহাদিগের নিকট মোহর করিয়া প্রেরিত করিলেন। তাহারাও বাদসাহের বিচারানুরূপ প্রত্যেকের ফারমন ও তল্লিখিত পরিমাণের জমি প্রদান করিয়া, বক্রী ভূমি কাড়িয়া লইল।

শেরসাহের ন্যায়পরায়ণতা এতদূর প্রসিদ্ধ ছিল যে অবিচার হইলে তাঁহার সামান্য সেনাবৃন্দ অবধি তাহাদের সেনাপতির বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ করিতে পারিত। এবং সম্রাটও পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার করিতেন। সুজাত খাঁ মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আপন অমাত্য-দিগের কুপরামর্শে সৈনিকদিগের জায়গীরের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় দুই সহস্র সৈন্য একত্রিত হইয়া সুজাতখাঁর নিকট আবেদন করিল যেন তাহাদিগের ন্যায্য সম্পত্তির তিনি অংশ গ্রহণ না করেন। লোভপরবশ সুজাত খাঁ সৈনিকদিগের অনুরোধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনার অভিষ্টসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইল। তখন মর্ম্মাহত সৈনিকগণ বাদসাহের নিকট আবেদন করিতে মনস্থ করিল। তাহারা স্থির করিল যখন সম্রাটের আদেশক্রমে তাহারা মালবে বাস করিতেছে তখন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিলে শেরসাহের অবমাননা করা হইবে। সুতরাং তাহারা রাজসমীপে প্রতিনিধি (উকীল) প্রেরণ করিতে সংকল্প করিল।

সৈনিকদিগের উকীল দিল্লী পৌছিবার পূর্ব্বেই আপনার গুপ্তচর মুখে শেরসাহ এই বিবাদের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সুজাতখাঁর উকীলকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি এই দণ্ডে সুজাতখাঁর নিকট প্রস্থান করিয়া তাহাকে বল আমি তাহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। সৈনিকদিগের উকীল দিল্লী আসিবার পূর্ব্বে যদি সে সমস্ত গোলযোগ না মিটাইতে পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে পদচ্যুত করিব এবং তাহার অসাধুতার যথেষ্ট শাস্তি দিব।"

বলা বাহুল্য দূত মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া সুজাত খাঁ তখনি প্রত্যেককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিল এবং দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ করিল। শেরসাহ প্রেরিত দূতকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া সুজাত খাঁ বাদসাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। বাদসাহও তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন।

শেরসাহের রাজত্ব কালে দেশে কি প্রকার শান্তি বিরাজ করিত তৎসম্বন্ধে আব্বাস খাঁ বলিয়াছেন——"শেরসাহের রাজত্ব কালে ভ্রমণকারিগণ মরুভূমির মধ্যেও অবস্থান করিতে পারিত। রাত্রে নির্ভীক চিত্তে তাহারা গ্রামে বা মরু-ভূমে যথেচ্ছা বিশ্রাম করিতে পারিত। তাহারা ভূমিতে আপনাপন ধন সম্পত্তি রক্ষা করিয়া, অশ্বতর গুলিকে মাঠে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিত এবং নিজ নিজ গৃহে যেমন সুস্থ চিত্তে নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইত সেইরূপ সুখে নিদ্রা যাইত। তাঁহার রাজত্ব কালে একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধা দস্যু তস্করের কিছুমাত্র ভয় না করিয়া একঝুড়ি স্বর্ণ অলঙ্কার মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করিতে পারিত। জগতে এরূপ শান্তির ছায়া পতিত হইয়াছিল যে একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি রস্তমের ন্যায় (একজন অমিত পরাক্রম) ব্যক্তিকে ভয় করিত না।"

———

শেরসাহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জলাল খাঁ সলিম খাঁ নামে সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। কোন কোন ইতিবৃত্তকার ইঁহাকে ইস্‌লাম খাঁ বলিয়া অভিহিত করেন। ইস্‌লাম খাঁ আপন জেষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং আপনার পিতার যাবতীয় ওমরাহদিগকে সন্দেহ করিয়া, খাওয়াস খাঁ নামক প্রসিদ্ধ বীরকে হত্যা করিয়া মোগল বিজয়ের পন্থা সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পিতার কতক গুণ পাইলেও ইসলাম শাহ অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি কলিঞ্জরের বন্দী রাজাকে সদলবলে হত্যা করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করেন।

তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি সুজাত খাঁকে তিনি যেরূপ নৃশংসতার সহিত কাল কবলিত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে এই ভূপতির উপর আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকেনা। চোন্সুর সুরাট সিং রাঠোরের নিকটে একটী সুন্দর শ্বেত হস্তী ছিল এবং তাঁহার কন্যার রূপও বিশ্ব বিমোহন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলাম শাহ অপর দুইটী সেনাপতির সহিত সুজাত খাঁকে চোন্সায় পাঠাইলেন। সকলে বুঝিল রাজার উদ্দেশ্য তাহার সেনাপতিত্রয় চোন্সা জয় করিয়া রাজকন্যা ও শ্বেত হস্তী লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিবে। বাদশাহ কিন্তু অপর দুইজন সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের যে সময় সুজাত খাঁর প্রাণ সংশয় হইবে সে সময় তাহারা যেন তাহাকে সাহায্য না করে। হিন্দুদিগের সহিত কঠোর সংগ্রামের সময় সেনাপতিদ্বয় নিজ নিজ সৈন্য লইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকা-বৎ স্থির হইয়া সমর দেখিতে লাগিল আর বীর সুজাত খাঁ ঈশ্বরের জন্য, দেশের

জন্য বাদশাহের জন্য সেই কঠোর ব্যূহ মধ্যে বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে বিশ্বাসঘাতক সম্রাটের জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। তাহার মনে একবার সন্দেহও হইলনা যে তাহাকে বলি দিবার জন্য এ যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছিল। তাহার পর "সম্রাট সুজাত খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল।" এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিবৃত্তকার ইলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন—"কি পিতৃস্থানীয় ভূপতি!"

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

নিবেদন।

অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়ে লইয়ে
কত কাল হরি! সহিব যাতনা
হৃদয়ের আশা দারুণ পিয়াসা
জীবনের সাধ কভু মিটিল না।
হৃদি-ক্ষেত্র মাঝে যে ফুল লতিকা
পালিনু যতনে প্রেমবারি দিয়ে
না মিটিতে সাধ ঘটিল প্রমাদ
কাল সাধি বাদ নিদয় হইয়ে,—
কঠিন পরশে সে হৃদি-লতিকা
মম হৃদি দলি' ফেলিল তুলিয়ে।

* * *

মনে পড়ে যবে সে রূপ মুরতি
হু হু জ্বলে প্রাণ—দাবানল সম
নারি কোনমতে সে বহ্নি নিভা'তে
খাক্ করি' ফেলে অন্তর মম।
তুমি সে আমার প্রেয়সীর প্রিয়
প্রেমময় তুমি—প্রেমিক রতন
এস সাথে করি, প্রেমময় হরি
অভাগার চির—বাঞ্ছিত ধন।
রাখি তার পদে উর মম হৃদে
পুরাও দাসের অতৃপ্ত বাসনা
উঠুক ফুটিয়া জ্যোতি নিরমল
ঘুচে যাক যত নিরাশ বেদনা।
প্রবাহিত হ'ক হৃদয় মাঝারে
ত্রিদিবের পূত প্রেম তরঙ্গিনী
উঠুক নাচিয়া ব্যথিত অন্তর
পান করি প্রেম-সুধা-সঞ্জীবনী।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

ঊষা।

অয়ি ঊষে! স্নেহময়ী জননী আমার!
প্রতিদিন নিশা শেষে মেলি আঁখি দুটী;
হিরণ্য অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ব নির্ব্বিকার
হেরি কি সৌন্দর্য্যে মাগো রহিয়াছি ফুটি!
কি সুন্দর! কি মোহন! মধুময়ী ছবি!
কি মহা সঙ্গীত বাজে চরণ মঞ্জীরে;
মৌন—মূক জ্ঞানহীন কত দীন কবি,
ডুবে থাকে সীমাহীন সুষমা সাগরে!
সৃষ্টির প্রথম হ'তে রয়েছ' ফুটিয়া,
তবু নিত্য নব শোভা চরণে লুণ্ঠিত!
মুগ্ধ আমি—মুগ্ধ বিশ্ব—তোমারে চাহিয়া
মধু রাতে মঞ্জরিত মাধবীর মত।
অয়ি মাতঃ বিশ্বময়ি! নিত্য মনোরমে!
জগৎ ফুটিয়া আছে তব মহা প্রেমে!

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কোন পথে!

(অর্চ্চনায় 'সান্ত্বনা' কবিতা পাঠে)

ক্ষান্ত কর, ক্ষান্ত কর ধর্ম্মের জয় গান,
কোন পথে কে বুঝিবে ধর্ম্ম ক'রে অবস্থান!
ধর্ম্ম পুণ্য লয়ে যা'রা রহিয়াছে চিরদিন,
হ'তে পারে হ'বে তা'রা একদিন ব্রহ্মে লীন!
কিন্তু যতদিন তা'রা র'বে এই ধরাতলে,
শোক দৈন্যে তার আগে হবে লীন প্রতি পলে।
এই বিশ্বে চায় সবে আত্মসুখ আত্মপ্রীতি!
নাহি চায় কারো মুখ, নাহি শুনে ধর্ম্ম-গীতি!
ক্ষুধিত শার্দ্দূল প্রায় পশ্চাতে ফেলিয়া সবে,
উন্মত্ত হইয়ে তা'রা ছুটিতেছে হাহারবে!
তার মাঝে কোন তত্ত্ব, কোন কথা, কোন গান
তৃণবৎ যায় ভেসে—অতি দূরে তার স্থান!
অতৃপ্ত বাসনা যার, অতৃপ্ত ভোগের আশা,—
জনমে যাহার প্রাণ পায় নাই ভালবাসা,
শুষ্ক কণ্ঠ, শুষ্ক জিহ্বা সহে যায় তীব্র তৃষা—
কোন প্রাণে তার প্রাণ না মিটাবে সে পিয়াসা!
এ বিশ্বে দেখেছি আমি বাসনার তীব্র স্রোতে
লভিয়াছে সিংহাসন সহোদর রক্তপাতে,—
লভিয়াছে মহাফল মহাজয় রণক্ষেত্রে,
আত্মীয় করিয়া নাশ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে!
তারো মাঝে আছে শুনি ধর্ম্মের মহান্ গান—
কোন পথে কে বুঝিবে ধর্ম্ম ক'রে অবস্থান!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

সরলা।—গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।॰ আট আনা।

সরলা বালবিধবা, অভাগিনী, সুতরাং পণ্ডিত মণ্ডলীর মত লইয়া কেহ তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে মনস্থ করে নাই। আদর্শ হিন্দু বিধবা যেমন পবিত্রতার সহিত জীবন যাপন করিয়া আপনার পুণ্যভাতিতে আত্মীয়স্বজন সকলকে উন্নত করিতে পারে, লজ্জাশীলা ম্লানমুখী সরলাও তাহা করিয়াছিল। তাই সরলা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি এবং আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রত্যেক বঙ্গ মহিলা এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি পাঠ করেন।

৫ম বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩১৫। [৮ম সংখ্যা।
September 1908.

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌।

"অর্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাধনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
,, ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার-পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃত নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক
বা য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম
পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৶০ আনা, মাশুলাদি ।৶০।

এডওয়ার্ডস "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ড "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্ট-কর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা গুণপ্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৶০ আনা।

সোল এজেণ্টস্ঃ—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্

অর্চ্চনার নিয়মাবলী।

অর্চ্চনার বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাকমাশুল লাগে না। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্র সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন।

অর্চ্চনা প্রতি বাঙ্গালা মাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। কেহ কোন মাসের অর্চ্চনা না পাইলে সেই মাসের সংক্রান্তির মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন, পরে আমরা আর দায়ী থাকিব না।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়,
১৮নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
অর্চ্চনা পোষ্ট, কলিকাতা।

শ্রীচন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী]

ভগ্ন-হৃদয়।

আর না! সংসার!! এইখান থেকেই তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি। আর তোমার ভালবাসায় ভুলিব না;—আর তোমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইব না;—এই দরজার বাহির হ'তেই তোমাকে প্রণাম করে, তোমার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করছি।

তোমাকে বড় ভালবাসি; সংসার! তোমার প্রতি যে মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসা সমর্পণ কোরে, জড়চৈতন্যের সবটুকু নিবেদন করেছিলাম, সে মায়ামমতার কিয়দংশ যদি তোমা ব্যতীত কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থে সমর্পিত হ'ত, তবে আ'জ কি প্রীতি-শান্তি উপভোগ করিতে পারিতাম, তা বুঝি কল্পনায়ও অনুমান করা যায় না। কিন্তু হায়! তোমাতে আত্মসমর্পণ করে, না জানি কি অপকর্ম্মই করেছি!! একদিনের জন্যও শান্তি-সম্ভোগ ঘটিল না;—কেবল লুব্ধ আশ্বাসে আর ক্রমাগত আশাভঙ্গে উত্তরোত্তর মৃত্যুমুখে পড়িতেছি। তথাপি তোমার বন্ধন কি দৃঢ়! মোহ কি মত্ততাময়! আকর্ষণ কি মর্ম্মভেদী!! নিয়ত চেষ্টা কোরেও তার শক্তির প্রতিকূলে প্রতিগমন ক্রমশঃ অসাধ্য হোচ্চে।

তবুও সংসার! অতঃপর সংকল্প স্থির কোরেছি যে, তোমাতে আমাতে যে চিরসম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আ'জ চিরবিচ্ছেদ ঘটাইব; হৃদয়মূলে যে প্রেমবন্ধন, সে বন্ধন আ'জ ছিন্ন হইবে; তোমার প্রতি যে স্বার্থ প্রতিদান প্রতিগ্রাহিনী প্রীতি, সে আ'জ আমাদের মধ্যে চিরবিরহের ব্যবধান-প্রাচীর দৃঢ় করিয়া গাঁথিবে। তোমার নিকট সাকাঙ্খ-প্রেমিকের নিরাশ-প্রণয়-কলুষিত আত্মাকে বলি দিয়া চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইব।

কেন হইব? তাও কি আর বুঝাইতে হইবে? জান না কি? জীবনের অর্দ্ধাতিরিক্ত কাল কেবল তোমার সেবাতেই অপব্যয় করিয়াছি। তোমাকে ভালবাসিয়া, তোমার রূপলাবণ্যে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া, অকপট হৃদয়ে নিরন্তর তোমারই অনুধ্যান করিয়াছি। কখন ভাবি নাই যে তোমা ছাড়া আর কিছু আছে!! তোমাকে বাদ দিয়া আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেও কখন সাহস করি নাই; পাছে তুমি বিমুখ হও!! পাছে তোমার সেই সপ্রেম-করুণ-দৃষ্টি

ভ্রূকুটীভঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়!! তার প্রতিদানে তুমি আমাকে কি দিয়াছ? বরঞ্চ আমার যা' ছিল তার অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়াছ। এ উদ্যানে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর লতা-বৃক্ষ-পুষ্প-পল্লব পথিকেরও প্রীতি সম্পাদন করিত, তুমি তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অন্যেরও অপ্রীতিকর করিয়াছ। যেখানে ফুল ছিল—সৌরভ ছিল—রূপ ছিল,—সেখানে আছে কেবল কণ্টক আর জ্বালা। কোনখানে শাখা নাই, কাণ্ড আছে—কাণ্ড নাই, মূল আছে। কোথাও বা মৃতপ্রায় কোন একটী পুষ্পবৃক্ষ যে কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে; তাহাতে আর একটীও কুঁড়ি ধরে নাই। আমার যা ছিল হায় সংসার! তুমি তার কি রাখিয়াছ? যে প্রস্রবণ হইতে সুখের উৎস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত; যার শীতলতায় সমস্ত উদ্যানটী সজীব ছিল; যে তার আপন শোভায় উদ্যানের যাবতীয় লতা-বৃক্ষকে সুশোভিত করিয়াছিল, তুমি সে প্রস্রবণের মুখেও পাথর চাপা দিয়াছ।

এমন একদিন ছিল; যখন তোমার লাবণ্যহিল্লোলে, তদ্গতচিত্তে তোমার কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছি। তোমার অঙ্গের এতটুকু বিকৃতি দেখিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তোমার দেহে একখানি ভগ্ন অলঙ্কারেরও স্থানচ্যুতি সহ্য হইত না। হায়! হায়!! আমার সে কোমলতাময়—মাধুর্য্যময়—প্রেমময় ভাব আ'জ কোথায় লুকাইয়াছে!! হে অদৃশ্য পুরুষ! হে স্বর্গের দেবতা!! আমার সে লুপ্তভাব আমাকে ফিরাইয়া দাও!! আমি একবার তেমনি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই!!

এখনও তোমার স্বর্ণ কিরীটভূষিত হীরক খণ্ড তেমনি-ই ঝলমল করিতেছে। এখনও লক্ষ লক্ষ মুক্তাহারে তোমার নিবিড়ান্ধকার লাঞ্ছিত কেশদাম আলোকিত করিতেছে। এখনও তোমার রূপে ত্যাগী সন্ন্যাসীরও চিত্তবিভ্রম সংঘটিত হয়। সেই সে কালের মত এখনও তোমার নিশ্বাসের সৌরভে অতি বড় ধীরকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। আজিও সে নবযৌবনের সৌন্দর্য্য আশে পাশে উছলিয়া, তোমাকে তেমনি-ই ভুবনমোহিনী করিয়া রাখিয়াছে।

নব বসন্ত সমাগমে তুমি তেমন করিয়াই নূতন সাজে সজ্জিতা হও!! তোমার মুখের সেই মৃদুহাসিটুকু সেই যে কতকাল পূর্ব্বে নবযৌবনের প্রথম উন্মেষে, যেমন করিয়া ফুটিয়াছিল, আজিও বুঝি ঠিক সেইরূপই ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, বুঝি মরণের অন্ধকারেও সে হাসি মিলাইবে না। প্রভাত-সায়াহ্নে তুমি সেই আগেকার মত মাধুর্য্য মহিমায় সকলের মনোহরণ করিতেছ। তবুও হায়! আমার হৃদয়ে যেমনটী ছিলে, তেমন বুঝি আর হইবে না।

একদিন এখানে সুখ ছিল—শান্তি ছিল—উৎসাহ ছিল—প্রণয় ছিল—ভালবাসা ছিল—আশা ছিল ; আর ছিল, কেমন যেন প্রতিভাবের হিল্লোলে ডুবিয়া ভাসিয়া কি এক অপূর্ব্ব সুখাস্বাদ। জীবন প্রভাতে, অস্ফুটালোকে তোমার ঐ লাবণ্যলহরী, তোমার ঐ হাসিমুখ কোন্ অজ্ঞাত-সুখ-সম্ভোগের ভবিষ্যচ্ছবি আঁকিয়া, আমার সম্মুখে ধরিত ;—কোন্ স্বপ্ন রাজ্যের ঐশ্বর্য্য কাহিনী শুনাইয়া, আশার আশ্বাসে মাতাইয়া, আমার ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়ের সবটুকু তোমাতে ডুবাইয়া দিত। মাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, ভগিনীর মমতা এ সব গুলির একত্র সমাবেশে কি এক অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত শান্তিরসের অবতারণা করাইত। গ্রীষ্মের সুশীতল প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মুক্তপ্রকৃতির শীতলতায় শান্ত হইতাম ; মনুষ্য মাত্রকেই আত্মীয় মনে হইত ; সমবয়স্কের মুখ দেখিলে, কত আনন্দ উথলিয়া উঠিত। রাজপথে গম্যমান স্বকার্য্য সাধনাভিলাষী শত শত লোকের চঞ্চল চরণের প্রতি পদক্ষেপে, তাহাদের প্রতি ব্যক্তির মুখে, প্রত্যেকের নয়নে, যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হইত, তাহা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইতাম ; হৃদয়ের আনন্দ হৃদয়ে ধরিত না ; উছলিয়া পড়িয়া অন্যকেও আনন্দিত করিত। খেলার সাথীকে সুখের অবলম্বনে আটক করিয়া, কত আনন্দ উপভোগ করিতাম।

মনে পড়ে ; একখানি ক্ষুদ্র পল্লী ; পল্লী ক্ষুদ্র, কিন্তু শোভায় নগরীও মুখ ঢাকিয়া থাকে। সামান্য পল্লী ; অধিকাংশই কৃষকের বাস। তার মাঝে ঘর কত ভদ্রলোক "নিরস্তপাদপেদেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে" সুতরাং "একচন্দ্রস্তমো-হন্তি" রূপে সকলের শীর্ষস্থানীয় এবং কৃষকের চক্ষে রাজাধিরাজের মত সম্মানিত অবস্থায় বাস করিত। এই ক্ষুদ্র পল্লীর পশ্চিমাংশে একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। তটিনীর সে অবিরাম নির্ব্বাক গতি ; বিশ্রাম নাই, স্থিতি নাই, কুলকুল শব্দে প্রবহমানা সেই স্রোতস্বিনী পতিসোহাগিনী নবীনার মত, কত আনন্দ বুকে করিয়া, লাঞ্ছিত-গজগতি মৃদুহিল্লোলে অথচ চঞ্চল চরণে ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘাটে ঘাটে কত জেলেডিঙ্গী দূরে নিকটে বাঁধা আছে। কত বড় বড় মহাজনী নৌকা, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ আশ্রয়-তরণী সেই নদীবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। মনে পড়ে !! একটী বালক, প্রভাতে মধ্যাহ্নে অনেক সময় একাকী কখন বা সঙ্গীসহ সেইখানে বসিয়া থাকিত ; অপরাহ্নে কতদিন আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাই ভগিনীর সঙ্গে, তাহার তরঙ্গ গণিত : দবাগত ভাসমান তরণীর সংখ্যা নিরূপণ করিত। মধ্যাহ্নে

বন্ধন ঘাটে ঘাটে মানুষের মেলা বসিত ;—কেহ খোসগল্প করিত—কেহ পরনিন্দা —কেহ বা ঘরের কথা কহিত, তখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া যে বালক সেই নদীর জলে সন্তরণ করিত, এখন কি তাহাকে মনে পড়ে ? যে শিশুর মুখে সরলতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তুমি প্রতিনিয়ত আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে উঁকিঝুকি মারিয়া চাহিয়া দেখিতে, আর প্রতিপলকে তার কোমল হৃদয়কে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে, যে তখন হইতেই তোমার রূপ দেখিয়া, আপন হৃদয়ে কত পূর্ব্ব স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিত ;—জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা বুঝি তার শিশু হৃদয়কে আকুল করিত, তাই সে পলে পলে তোমার আয়ত্ত হইতেছিল ; যার মুখের সুন্দর সরলতায়, তুমিও একদিন ভুলিয়াছিলে ; ভুলিয়াছিলে বলিয়াই যাহাকে ভুলাইবার জন্য কত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া, কত স্নেহ মমতা দেখাইয়া তাহাকে অল্পে অল্পে আকর্ষণ করিয়াছিলে, সেই শিশুকে কি অয়ি ! হৃদয়হীনে ! আর তোমার মনে পড়ে ? যদি মনে করিতে পার, তবে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি ! সে সৌন্দর্য্য—সে সরলতা, আর কি এখন তার মুখে চোখে প্রতিভাত হইতেছে ?

কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম !!——সেই কৃষক পল্লী ; সেই অতি ক্ষুদ্র গ্রামখানি ;—সেই আমার জন্মভূমি ;—সে আমার অতি বড় আদরের, অতি বড় ভালবাসার স্থান। ক্ষুদ্র হৃদয়ের সবটুকু দিয়া, প্রবল আকর্ষণে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। সেখানে কৃষক পত্নীরা মাটীর কলসী করিয়া, নদী হইতে জল আনিত। দলে দলে হাসিমুখে গল্প করিতে করিতে, যখন তাহারা ধীরমন্থর গমনে চলিয়া যাইত, তখন তাহাদের সেই সুস্থ সবল শরীর,—সেই নিরহঙ্কার চরণ বিন্যাস,—সেই স্বাভাবিক গমনভঙ্গী, আর সেই মৃদু সরল হাস্য আমাকে আনন্দে তরলতাময় করিয়া তুলিত।

অপরাহ্নে ভদ্রপল্লীর কোন স্থানে বৈঠক বসিত। তথায় অধিকাংশ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সমাগম হইত। কেহ বা খেলা করিত, কেহ বা গল্প করিত, কেহ বা শাস্ত্রচর্চ্চা করিত। কোনখানে সামাজিক মীমাংসা, কোথাও বা বৈষয়িক আন্দোলন হইত। পল্লীর স্থানে স্থানে ছেলেরা দল বাঁধিয়া পাঠাভ্যাস করিত ; কোথাও বা ছুটাছুটী করিত। সর্ব্বত্র শান্তিময়—কর্ম্মময়—কোলাহলময়—আনন্দময় ভাবের তরঙ্গে সমস্ত গ্রামখানি পূর্ণতোয়া সরসীর মত ঢল ঢল করিত। অপরাহ্নে কৃষক বৃদ্ধেরা মাঠে যাইত না ; তাহারাও দল বাঁধিয়া, রাস্তার ধারে বৈঠক করিত। সেখানে চাষের কথা—জলের কথা—সংসারের কথা—দেশের

কথা লইয়া. পরস্পর তর্ক করিত। কথাচ্ছলে রাজা মহাজনের দয়ার কথা উঠিত। তখন সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি কৃষক বৃদ্ধগণের অন্তরে, করুণার উৎস ছুটিয়া, দরদরধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত; সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !!

সে পল্লীর সায়াহ্ন কি সুশীতল !! হায়রে সংসার! সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া, সেই কতকালের অতীত সুখস্মৃতি, আজিকার এই দারুণ দুঃখের দিনেও কত সুখস্বর্গের সুন্দর দৃশ্য দেখাইতেছে। যে দিন গিয়াছে, সে কি আর আসিবে? হায়! হায় !! যা' যায় তা' কি আর আসে? কিন্তু কি বলিতেছিলাম;——সে পল্লীর সায়াহ্ন কি শান্তিময় !!

সেই নিস্তব্ধ সায়াহ্নে কুটীরে কুটীরে দীপ জ্বালাইয়া, সরলা কুমারিগণ আকাশের তারা গণিত। একটী—দুইটী—তিনটী দেখিতে দেখিতে শত সহস্র সংখ্যাতীত তারার মালা আকাশ ছাইয়া ফেলিত। আনন্দে পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি করিয়া, সন্ধ্যামঙ্গল ঘোষণা করিত; সেই শঙ্খধ্বনির ঘাতপ্রতিঘাতে নদীর তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। অপর পারে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়া, নিকটের পল্লী-বাসিগণকে জাগাইয়া তুলিত। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, কৈশোর বয়স্ক কৃষক পুত্রেরা স্থানে স্থানে সঙ্গীতচর্চ্চা করিত;—সেই আনন্দ-উৎসাহ-সমুত্থিত বাদ্য তরঙ্গের তাললয়ে মন ডুবিয়া যাইত। সে পূর্ব্বস্মৃতি আজিকার এই দুঃখের দিনে একপ্রকার দুঃখবিমিশ্রিত সুখে নিমগ্ন করিতেছে। এ স্মৃতি যদি না থাকিত, তবে বুঝি পাগল হইতাম;—অতীত স্মৃতিই বুঝি বর্ত্তমান দুঃখে সান্ত্বনা-শান্তি-দায়িনী সখী। নতুবা সে কথা বলিতে, এত বাসনা, এত আগ্রহ কেন? তোমার নিষ্ঠুরতায়——তোমার ঘৃণিত আচরণে—তোমার কৃতঘ্নতায় তোমারই ভালবাসার অপ্রতিদানে যে আ'জ মর্ম্মাহত, সে তোমার কাছে কেনই বা সে পূর্ব্বস্মৃতির অনুবৃত্তি করে? জানিত তুমি কিছু শুনিতেছ না; শুনিলেও তোমার ঐ বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয়ে তাহা সূচ্যগ্রও ভেদ করিবে না। তোমার কাছে বৃথা রোদন! বৃথা আস্ফালন! ভালবাসার কাহিনী শুনাইবার বৃথা বাসনা !! তুমি যে যুগযুগান্তর ধরিয়া. কত হতভাগাকেই এইরূপে রূপের আকর্ষণে টানিয়া, অবশেষে এমনি করিয়াই উপহাস করিয়াছ, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তোমার রূপ দেখিতে দেখিতে তন্ময়তায় আপনহারা হইয়া, কত ভাবুক, কত প্রেমিক কতকাল ধরিয়া তোমার উপাসনা করিয়া, অবশেষে ভগ্নপ্রেমে বিষাদে—হতাশে—তোমারই পদতলে প্রাণপাত করিয়াছে—সর্ব্বনাশিনি! তুমি কি তার হিসাব দিতে পার? অয়ি! আত্ম-উল্লাসিনি !! পরোন্মাদিনি !! প্রাণে

সে মমতা—হৃদয়ে যে কোমলতা—স্বভাবে যে সহানুভূতি—নয়নে যে অশ্রু—সকলেরই যা আছে—তোমাতে বুঝি তাহাও নাই !!

কিন্তু, এ কথা কেন এতদিন ভাবি নাই ? পূর্ব্বে কেন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝি নাই ? ভাসমান রূপের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়াছিলাম সঙ্গীততুল্য মৃদুগুঞ্জনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম ; তাই সময়ে তোমাকে চিনি নাই—বুঝি নাই—বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই। ধীরে ধীরে তোমারই পদতলে পতিত হইয়া, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।

তুমি বলিলে, ঘর বাঁধ ! তোমার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে, অনুগত ক্রীতদাসের মত, দিগ্বিদিক না দেখিয়া, খড়-কুটা-তৃণ আহরণ করিয়া ঘর বাঁধিলাম। তোমার মনের মত সুন্দর করিবার জন্য, "অবশ্য সে সৌন্দর্য্য কোনদিন তোমার চিত্তরঞ্জন করিতে পারে নাই" তবু তোমারই মনের মত করিতে, কত আয়াস করিলাম। তোমার আজ্ঞায় সঙ্গিনী খুঁজিতে সাধ হইল ; —সে ত তোমারই দাসীপণা করিবে বলিয়া। তুমি আমাকে কি কুহকে কোন্ মন্ত্রে ভুলাইলে ;—জানি না কেনই বা তোমার আদেশ উপেক্ষা করিতে, কোন দিন সাহস করি নাই।বরং অত্যন্ত আহ্লাদে—একান্ত আগ্রহে—পূর্ণ অধ্যবসায়ে তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। তুমি প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করিয়াছ ; প্রতিসঙ্কেতে বুঝাইয়াছ ;—এখানে একমাত্র তুমি-ই আমার সব ; নীরবে অপাঙ্গভঙ্গিমায় জানাইয়াছ কত সুখ তোমার হাতে। হায়রে কুহকিনি ! নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই, তোমার ভালবাসায় পাগল হইয়াছিলাম ; তোমার হাবভাবে তোমার কুটিলকটাক্ষে তোমাকে বিপরীত বুঝিয়াছিলাম। তারপর যখন প্রতি-ঘাতে অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িল ;—নিরাশে হৃদয় দমিয়া গেল ;—বিষাদে বক্ষঃ বিদীর্ণ হইল ;—যখন দেখিলাম কেহ আমার নয়—সুখ কোথাও নাই—সহানু-ভূতির সখা নাই—স্নেহধারা বর্ষণের মেঘ নাই—অন্ধকারে অনুভূতির সৌদামিনী নাই—জ্বালাযন্ত্রণায় তাপ নিবারণের বাতাস নাই—কণ্ঠতালুশোষী পিপাসায় তৃষ্ণা নিবারণের পানীয় নাই—তখন হায় ! অন্ধ তমসাবৃতে ! নিতান্ত হতাশে—দারুণ দুঃখে—বিষণ্ণ মুখে—করুণ নয়নে—একমাত্র আত্মীয়জ্ঞানে তোমার প্রতি নির্ভরতার দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম ;—ওঃ ! তাহা বলিতেও ব্যথা লাগে, স্মরণেও যাতনা হয় ;—লজ্জা পায়—দুঃখ হয়—আপনাকে উপহাস করিতে ইচ্ছা করে। কি দেখিলাম !! রাক্ষসি ! পাষাণি !! তুমি বিকট-দশন-বিকাশ-বিস্ফুরণে অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছ !

কি ঘৃণা! কি লজ্জা!! সেই তুমি; সেই রূপমোহে ভুলাইয়া, কোন্ যাদু-মন্ত্রে আমাকে মুগ্ধ করিয়া, এতদিন কেবল তোমার কাজই করাইয়া লইয়াছ!! একদিনও তুমি আমাকে আপন ভাব নাই!! রূপমোহে আত্মহারা অসহায় প্রেমিককে এতকাল শুধু লোভ দেখাইয়া, তামাসা দেখিয়াছ!! আর বৃথা আশ্বাসে আশা দিয়া, নিজের কাজ করাইয়াছ!! আবাল্য বার্দ্ধক্য যে তোমার উপাসনা ভিন্ন আর কিছু করে নাই;—তোমার তুষ্টির জন্য যে অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে; যখন ঢেউ লাগিয়া সে হাবুডুবু খাইতেছে, কুলকিনারা না দেখিয়া, অবলম্বন জন্য তৃণের সহায়তা না পাইয়া, যখন সে নিতান্ত কাতর-নয়নে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, তখন কিনা উপহাস? এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা, ইহাপেক্ষা হৃদয়হীনতার পরিচয় আর কোথাও পাই নাই।

এখন যে ডুবিতেছি; ক্ষণকাল পরে অনন্তের কোলে চিরনিদ্রিত হইব; আর কখন জাগিব কি না, জানি না;—এখন এই আসন্ন সময়ে তোমার স্বরূপ আমার প্রত্যক্ষ হইল!! তাই বড়ই আক্ষেপ রহিয়া গেল যে, তোমাকে একবারও অবজ্ঞা করিবার অবসর পাইলাম না;—তোমার এই অসম্ভাবিত আচরণ—এই অকল্পিত নিষ্ঠুরতা কাহাকেও বুঝাইবার অবসর পাইলাম না। তথাপি হে অকরুণে! এখনও তোমার নিকট চিরবিদায় লইবার জন্য, তোমাকে না জানাইয়া যাইতে পারিতেছি না। একি অভ্যাস? না মোহ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কোচ্‌ম্যান চলিয়া গেলে গোবিন্দরাম আমার দিকে ফিরিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার, আমাদের শেষ সূত্রটাও ছিঁড়িয়া গেল? কি বদমাইস—চালাক! সে আমাদের চেনে,—এখানে রাজা ও নলিনাক্ষকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে, তাহারা আমার সাহায্য লইতে আসিয়াছে। তাহার পর আমাকে পথে দেখিয়াই গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়াছিল। সে বেশ জানিত যে, আমি গাড়ীখানার নম্বর

দেখিয়াছি, সুতরাং কোচ্‌ম্যানকে ধরিব, তাহাই কোচ্‌ম্যানের কাছে আমার নাম করিয়াছিল। ডাক্তার, এবার শক্ত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ। এখানে ত সে আমাদের দস্তুরমত হারাইয়া গেল, দেখি নন্দনপুরের গড়ে গিয়া তুমি কতদূর কি করিয়া উঠিতে পার। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

আমি। কি সম্বন্ধে?

গোবি। তোমার সেখানে পাঠান সম্বন্ধে। ডাক্তার, ব্যাপারটা সহজ নয়, ব্যাপারটা বড়ই বিপজ্জনক। যতই আমি এ বিষয়টা আলোচনা করিতেছি, ততই আমার ভাল বোধ হইতেছে না। ডাক্তার, দেখিতেছি, তুমি হাসিতেছ—আমি জানি, তুমি ভয় পাইবার লোক নও, তবুও তুমি নিরাপদে ফিরিয়া আসিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব।

যাহাই হউক, পরদিন রাত্রে আমি ও গোবিন্দরাম হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তথায় রাজা ও ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দরাম যাত্রাকালে আমাকে দুই একটা হিতোপদেশ দিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার, আগে হইতে আমি তোমাকে কিছু বলিয়া একটা ধারণা করাইয়া দিব না। আমি এই চাই—যাহা যাহা ঘটিবে, তুমি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমায় লিখিয়া পাঠাইবে—অনুমান, ধারণা করার ভার একা আমার উপরেই থাকিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম,—কি লিখিয়া পাঠাইব, বলিয়া দাও।"

গোবি। যাহা কিছু দেখিবে,—যাহা কিছু শুনিবে। এই নূতন রাজার সহিত তাহার নিকটস্থ লোকজনের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহারা কে কিরূপ লোক, মৃত রাজার মৃত্যু, সম্বন্ধে যদি কিছু নূতন কথা জানিতে পার—এই রকম এ সম্বন্ধে ছোট বড় যাহা কিছু জানিতে পারিবে, সমস্তই আমায় লিখিয়া পাঠাইবে; এটা আবশ্যক নয়,—ওটা অনাবশ্যক, এরূপ কিছু মনে করিয়ো না। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুসন্ধান লইয়াছি,—কিন্তু বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, তবে একটা বিষয় স্থির। এই নবীন বাবু ভাবী উত্তরাধিকারী। তবে শুনিলাম যে, তিনি অতি ধার্ম্মিক বৃদ্ধ, সুতরাং তিনি যে এই গুরুতর ব্যাপারে আছেন, এরূপ আমার বোধ হয় না, সুতরাং তাঁহাকে আমরা প্রথম হইতে বাদ দিতে পারি।

আমি। এই অনুপ ও তাহার স্ত্রীকে প্রথমেই তাড়ান কি উচিত নয়?

গোবি। কিছুতেই নয়, ইহাপেক্ষা ভুল আর হইতে পারে না; যদি তাহারা নির্দ্দোষী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উপর ঘোর অন্যায় করা হইবে, আর যদি তাহারা দোষী হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিদায় করিয়া দিলে তাহারা নজরের বাহিরে যাইবে—না না তাহাদিগকে আমাদের নজরে রাখিতে হইবে। আমরা যে সকল লোককে সন্দেহ করিতেছি, তাহাদের মধ্যে ইহাদের দুইজনকেও রাখিয়া দিলাম। এ দুইজন ছাড়া আরও লোক আছে, এই রাজার গড়ে আরও দুই-একজন চাকর আছে, তাহার পর গড়ের কিছু দূরে দুইজন গৃহস্থ চাষা থাকে, আর এই আমাদের ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু আছেন, তাহার উপর এই সদানন্দ, শুনিয়াছি তাহার বাড়ীতে তাহার এক সুন্দরী বিধবা ভগিনী থাকে, এ ছাড়াও আরও দুই-চারিজন আছে, এই সমস্ত লোকের উপরই তোমাকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

আমি। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

গোবি। সঙ্গে পিস্তল লইয়াছ?

আমি। হাঁ, সঙ্গে পিস্তল লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

গোবি। হাঁ, নিশ্চয়ই সঙ্গে লওয়া উচিত। রাত্রিদিন যেন পিস্তল সঙ্গে থাকে। দেখিও, যেন কোন সময়ে কোনমতে অসাবধান হইও না।

ডাক্তার নলিনাক্ষ বলিলেন, "না, আর নূতন কিছু ঘটে নাই, তবে এটা স্থির, ষ্টেশন পর্য্যন্ত কেহ আমাদের পিছু লয় নাই। আমরা বিশেষ নজর রাখিয়াছিলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনারা দুইজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে ত ছিলেন?"

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "হাঁ কেবল, কাল সন্ধ্যায় আমি একজন আত্মীয়ের সঙ্গে একবার দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন, "আমিও একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু আর কিছু গোলযোগ ঘটে নাই।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা হইলেও এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি কখনও একা কোথায়ও যাইবেন না। এরূপ করিলে আপনার বিষম দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনার হারান জুতাটা পাইয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন, "না, সেটা গিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই।"

এই সময়ে গাড়ী ছাড়িল, গোবিন্দরাম রাজাকে বলিলেন, "যেন মনে থাকে, রাত্রে কখনও আপনি আপনার দেশের মাঠে বাহির হইবেন না।"

আমি দূর হইতে একবার ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, গোবিন্দরাম তখনও আমাদের গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন।

আমরা বহুক্ষণ নীরবে গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। ক্রমে গাড়ী বালিগঞ্জের নিকটস্থ হইল। তখন আমরা একটি ছোট ষ্টেশনে নামিলাম। এইখানে এক ব্যক্তি একখানা টমটম গাড়ী লইয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া নন্দনপুরের দিকে রওনা হইলাম। আমাদের দ্রব্যাদি পশ্চাতে একটা গরুর গাড়ীতে চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ, সেই পথে আমাদের গাড়ী ছুটিল, মধ্যে মধ্যে গাছের ঝোপ, দূরে দূরে দুই-একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়। লোকজনের সংখ্যা অতি কম, পথে মধ্যে মধ্যে দুই-একটা লোক যাইতেছে, দুই-একখানা গরুর গাড়ী চাকার কত রকম শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন স্থানটা আরও নির্জ্জন মরুময় হইয়া আসিল, পথের দুইদিকেই কাঁকর, নুড়ি পাথর বালিতে পূর্ণ বিস্তৃত মাঠ, গাছপালা বড় একটা দেখিলাম না।

সহসা নলিনাক্ষ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"

আমাদের সম্মুখে কিছু দূরে বন্দুক স্কন্ধে একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল। এরূপ স্থানে এরূপ কনেষ্টবল প্রায় দেখা যায় না। নলিনাক্ষ বাবু সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রকম পুলিস এখানে কেন?"

সহিস বলিল, "হুজুর, সুরির জেল থেকে একজন কয়েদী পালিয়েছে, তিন দিন থেকে সে নাকি এখানে কোথায় লুকিয়ে আছে, তাকেই ধর্‌বার জন্য পুলিস চারিদিকে ঘুরছে; কিন্তু এখনও তাকে ধর্‌তে পারে নি। এদেশের সব লোক ভয়ে অস্থির হয়েছে, লোকটা নাকি ভারি দুর্দ্দান্ত ডাকাত।"

"কে সে?"

"হারু ডাকাত।"

ইহার নামটা আমারও শোনা ছিল। গোবিন্দরামও এক সময়ে ইহার বিষয় একটু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। হারু চার-পাঁচ জেলায় ডাকাতি

করিয়াছিল, তাহার দল হইতে দুই-চারটা খুনও হইয়াছিল, অবশেষে সে ধরা পড়ে, এক জায়গায় এক জেলায় ডাকাতি নয়, তাহাই তাহার নানা স্থানে বিচার হইতেছিল, বিচার শেষ হইলে তাহার ফাঁসী না হইলেও নিশ্চয়ই দ্বীপান্তর হইবে। উপস্থিত সুরিতে তাহার বিচার হইতেছিল, তাহাই সে সুরির জেলে ছিল, এখন সেই জেল হইতে সে পলাইয়াছে।

আমরা আরও কিয়দ্দূর আসিয়া গাছপালার ভিতর দূরে একটা বাড়ীর কিয়দংশ দেখিতে পাইলাম। ডাক্তার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ নন্দনপুরের গড়।"

এরূপ নির্জ্জন মরুভূমির ন্যায় স্থান যে বাঙ্গালা দেশে আছে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। এ দিক্‌টায় ছোট ছোট পাহাড়, প্রতি পদে গর্ত্ত খানা ডোবা। গাছপালা প্রায়ই নাই, মধ্যে মধ্যে জলা, আমি পূর্ব্বে এমন ভয়াবহ স্থান আর কখনও দেখি নাই। এরূপ স্থানের ভূতের কথা যে গ্রাম্য লোক সহজেই বিশ্বাস করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

ক্রমে আমরা গড়ের কাছে আসিলাম। গড়ের পূর্ব্ব-গৌরব আর নাই, অধিকাংশ স্থানে জল নাই, নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; গড়ের ভিতর একটী বৃহৎ অট্টালিকা, কিন্তু তাহাও অতি প্রাচীন, ভগ্নাবস্থ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহুকাল হইতে এই অট্টালিকার মেরামত হয় নাই।

গড়ে যাইতে প্রথমে আমাদিগকে একটা অর্দ্ধভগ্ন সাঁকোতে উঠিতে হইল। আমরা সেই সাঁকো পার হইয়া গড়ে প্রবেশ করিলাম, গড়ের ভিতরও খুব জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। রাজা মণিভূষণ একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া প্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "এইখানে ?"

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "না, সে বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে।"

রাজা সভয় দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিলেন। আমরা যেস্থানে আসিলাম, প্রকৃতই সেস্থানে আসিলে মনে ভয় হয় ; চারিদিকে কি গভীর নির্জ্জনতা বিরাজ করিতেছে !

রাজা মণিভূষণ চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি আমাকে এখানে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এ সমস্তই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন করিতে হইবে। এমন স্থানে মানুষের থাকা অসম্ভব।"

ক্রমে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় লাগিল। দরজায় কালো নিবিড় দাড়িযুক্ত একজন যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে একটি স্ত্রীলোক উঁকি

মারিতেছিল। আমি বুঝিলাম, এই লোকই অনুপ—রাজার ভৃত্য, আর স্ত্রীলোকটি—অনুপের স্ত্রী।

নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন, "রাজা মণিভূষণ, তাহা হইলে আমি এখন বাড়ী যাই—আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া আছেন।"

রাজা বলিলেন, "একটু বিশ্রাম করিয়া যাইবেন না ?"

"না, এখন থাক, অনুপই আপনাকে বাড়ীর সমস্ত দেখাইবে, আমি সুবিধা পাইলেই কাল আসিব।"

এই বলিয়া সেই টমটম গাড়ীতে উঠিয়া নলিনাক্ষ বাবু প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে আমরা দুইজনে সেই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা কয়েকটা ঘর উত্তীর্ণ হইয়া একটা বড় বসিবার ঘরে আসিলাম। সেখানে কয়েকখানা অতি পুরাতন কোচ ও চেয়ার রহিয়াছে, গৃহমধ্যে লম্বা তক্তাপোষ, তাহার উপর বিস্তৃত—বোধ হয় একশত বৎসরের পুরাতন এক গালিচা।

রাজা মণিভূষণ বলিলেন, "জ্যেঠামহাশয় কেমন করিয়া একা এই বাড়ীতে থাকিতেন, তাহা বুঝিতে পারি না। কি নির্জ্জন! কি পুরান বাড়ী, কত হাজার বৎসর হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ঘরে বসিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে মনে কত রকম ভাবের উদয় হয়—নয় কি ডাক্তার বাবু ?"

আমি মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিলাম। নলিনাক্ষ বাবুর পত্র পাইয়া অনুপ আগে হইতেই আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে আসিয়া বলিল, "খাবারের জায়গা করিয়া দিব কি ?"

মণিভূষণ বলিলেন, "তৈয়ারী হইয়াছে কি ?"

"হাঁ, এখনই হইবে, স্নানের ঘরে জল দেওয়া হইয়াছে। যতদিন আপনি নূতন লোক স্থির না করেন, ততদিন আমি ও আমার স্ত্রী সব সময়ই আছি ; আপনি নিশ্চয়ই অনেক লোকজন রাখিবেন।"

রাজা। কেন ?

অনুপ। রাজা কাহারও সহিত মিশিতেন না, তাঁহার কোন পরিবার ছিল না, আপনি ত আর তাঁহার মত থাকিবেন না, কাজেই আরও লোক জনের দরকার হইবে।

রা। তাহা হইলে তুমি ও তোমার স্ত্রী আমার কাছে থাকিতে চাও না।

অ। আপনি নূতন লোকের বন্দোবস্ত করিলেই আমরা চলিয়া যাইব।

রা। তোমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে আমাদের বংশে চাকরী করিয়া আসিতেছে, তুমি ইচ্ছা করিয়া না গেলে আমি কথনই তোমাদিগের বিদায় করিব না।

অনুপ যেন এই কথায় একটু বিচলিত হইল। বলিল, "আমি ও আমার স্ত্রী, আমরা দুইজনেই এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে মনে কষ্ট পাইতেছি। মৃত রাজা আমাদের বড় ভালবাসিতেন, আমরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের প্রাণে বড় লাগিয়াছে, আর আমাদের এ বাড়ীতে থাকিতে কিছুতেই প্রাণ চাহিতেছে না।"

মণিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গিয়া কি করিবে?"

অনুপ কহিল, "রাজা যে টাকা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একখানা দোকান করিলে আমাদের দুইজনের বেশ চলিয়া যাইবে।"

হঠাৎ পুরাতন চাকর কেন চলিয়া যাইতে চাহে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না; বলা বাহুল্য, মনে মনে বিশেষ বিস্মিত হইলাম, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিলাম না।

আহারাদির পর আমরা দুইজনে সমস্ত বাড়ীটা ও গড়ের চারিদিক দেখিলাম। অনুপ আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া সমস্ত দেখাইল। ক্রমে রাত্রি হইল। তখন আমরা শয়ন করিতে গেলাম। রাজা যে ঘরে শয়ন করিলেন, আমি তাহার ঠিক পাশের ঘরেই শয়ন করিলাম।

শয়ন করিবার পূর্ব্বে ঘরের জানালাটা খুলিয়া আমি বাহিরটা একবার দেখিলাম, যতদূর দেখা যায় দেখিলাম, সম্মুখে সেই বিস্তৃত মরুভূমিবৎ সুদূরপ্রশস্ত মাঠ। সেই মাঠ নিস্তব্ধতা নির্জ্জনতা ও অন্ধকারের রাজত্ব। পূর্ব্বদিক্‌কার আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিলাম, চন্দ্রোদয়ের বড় বিলম্ব নাই।

আমি জানালা বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। নূতন স্থান—অনেকক্ষণ নিদ্রা হইল না। না হওয়াই স্বাভাবিক। আমি বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। চারিদিক আরও নিস্তব্ধ হইল। সহসা আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। দূরে আমি স্পষ্ট ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম, স্বপ্ন নহে—মিথ্যা নহে—নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। দূরে কোন একটি ঘরে কোন স্ত্রীলোক মুখ চাপিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

কি আশ্চর্য্য! এত রাত্রে এ বাড়াতে কে কাঁদে? আমি জানিতাম, এ বাড়ীতে আমরা দুইজন আর অনুপ ও অনুপের স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ নাই। তবে এত রাত্রে কাঁদিতেছে কে?

একটু পরেই আর সে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলাম না। আমি বহুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না।

আমি এরূপ গভীর রাত্রে রমণীর ক্রন্দনে অতিশয় বিস্মিত হইলাম। এই অতি প্রাচীন অট্টালিকা যে বহুরহস্যপূর্ণ, তাহা আমার এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

বোধ হয়, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। মণিভূষণ আসিয়া আমায় ডাকিল, আমি চমকিত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়"।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন,—"বাহির হইতে এই হিন্দু মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্ণমেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক্ হইতে তাহা রাজবাড়ীরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি একথা সত্য হয় যে হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্ততঃ ভাব

গতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না।"—সেই রবীন্দ্রনাথই এক্ষণে স্বীয় উক্তি পদদলিত করিয়া 'সতুপায়' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন,—মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষে এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম। কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের আর এক স্থানে বলিতেছেন,—"জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না?......এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না?" এতদুত্তরে আমরাও রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এইরূপ ব্যাপার তিনি কয়টা ঘটিতে দেখিয়াছেন? এক আধটা দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথার সমর্থন করা ঠিক সমীচীন বোধ করি না। কারণ দেশে যখন ভাবের বন্যা আসে তখন সকল দেশেই এইরূপ এক আধটা ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সেজন্য স্বদেশ প্রচারক সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। দেশের যখন ভাব রাজ্যে এবং কর্ম্মরাজ্যে মহাপ্লাবন আসে তখন তাহা সকল সময়ে ঠিক দার্শনিক পণ্ডিতের মত বিচার করিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিতে ফেলিতে কর্ম্ম করিতে পারে না। আর ইহার উত্তরে আমরা রবীন্দ্রনাথেরও নজীর দেখাইতে পারি। তিনিও ত একদিন বলিয়াছিলেন,—"যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্ম্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না

হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঞ্চল্যে পরস্পরকে একবার আঘাত করিয়াছে, সেই জীবন ধর্ম্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে।” শুধু তাহাই নহে। ‘আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিয়াছেন’ কবিবর স্বয়ং তাঁহাদিগের কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—“তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ ; ইহার প্রবল পুণ্য স্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শ মাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।” কিন্তু হায়! স্বার্থ জিনিষটা এমনই প্রবল যে, উহা আজ রবীন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য কথা বলাইয়া তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক উপদেশের তাৎপর্য্য আমরা ইহাই বুঝিয়াছি, যে তিনি বলিতেছেন যে,‘বয়কটের জেদে পড়িয়া আর মাতামাতিতে কাজ নাই। ইংরাজের প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষ আমাদিগকে ঐক্য দান করিতে পারিবে না। “কারণ, তাহা হইলে, ইংরেজ যখনি এদেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্য সূত্রটি এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন রক্তপিপাসু বিদ্বেষ বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়। অতএব ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা।” কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথই আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে,‘বিধাতার ইচ্ছা’ অর্থে ‘রাজশক্তির সহিত বিরোধ।’ ‘ব্রতধারণ’ নামক প্রবন্ধে তিনিই লিখিয়াছিলেন যে—“বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশঃই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না; আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবল রূপে, যথার্থ রূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না।······আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার

পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ শক্তিকে আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্য্যন্ত ধীর শক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে।" বিরোধ থাকিবে, সংঘর্ষ চলিবে, অথচ বিদ্বেষ এবং উত্তেজনা থাকিবে না;—আগুন জ্বলিবে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি এবং উত্তাপ থাকিবে না, ইহা কবি-কল্পনা হইতে পারে কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মে খাটে না। আজ রবীন্দ্রনাথ 'দেশব্যাপী উত্তেজনাকে' 'মত্ততা' আখ্যা দিয়া 'দেশের উদ্যমের মূলে হুল ফুটাইবার চেষ্টা' করিতেছেন বটে; কিন্তু তিনিই এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমাদিগকে ভুল করিতে দাও, গোল করিতে দাও, বাজে কাজ করিতে দাও, পাঁচজন লোককে ডাকিতে ও পাঁচ জায়গায় ঘুরিতে দাও। এই নড়াচড়া চলুক। এই নড়াচড়ার দ্বারাই, যেটা যেভাবে গড়িবার সেটা ক্রমে গড়িয়া উঠে, যেটা বাহুল্য সেটা আপনি বাদ পড়ে, যেটা বিকৃতি সেটার সংশোধন হইতে থাকে। বিবেচকভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তাহার কিছুই হয় না।"

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ইহাই বলিয়া রাখি যে, কালধর্ম্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কালধর্ম্মের প্রতিকূলে কিছু বলিতে গেলে তাহা নিশ্চয়ই ভাসিয়া যাইবে। কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক সত্য কথাই বলিয়াছেন যে, 'যে দেশে বারমাস দুর্ভিক্ষ, দেশের পনর আনা লোক আধ পেটা খাইয়া দেহভার বহন করে, যে দেশে মহামারীর রাবণের চিতা অহরহঃ জ্বলিতেছে, আর পতঙ্গপালের মত মনুষ্যকীট সকল সেই চিতায় অনায়াসে গিয়া পড়িতেছে—সে দেশের লোকের মনে যদি একবার একটা খেয়াল বসিয়া যায়—যদি একবার উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদের কাছে কোন কথাই বলা চলে না। পেটের দায়ে ধর্ম্ম পালায়, সত্য মলিন হয়, কাব্য বক বাক্যতে পরিণত হয়। * * * ধর্ম্ম প্রচারের ইহা সময় নহে। ধার্ম্মিক হইবার অবসর নহে।" *

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

---

* বঙ্গীয় সাধনা সমিতির মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

অসাধ্যসাধনের জন্য ব্যগ্রতা সমস্তই দরিয়াচরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দরিয়াকে আমাদের সম্মুখে সাধারণ মানবের ন্যায়ই দাঁড় করাইয়াছেন। তবে দরিয়াতে আমরা যে অসাধারণ সাহস দেখিতে পাই, সে সাহস সাধারণ কোমলাঙ্গী রমণীতে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। অধিকন্তু, দরিয়া গর্ব্বিতা—দরিয়া রসিকা—দরিয়া মবারক আলি খাঁর পরিণীতা ভার্য্যা। যদি মবারক-আলি খাঁ দরিয়ার আত্মহারা ভালবাসার প্রতিদানে আপনার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম প্রদান করিতেন, তাহা হইলে দরিয়ার চরিত্র বড়ই সুন্দর, বড়ই কোমল, বড়ই মদিরাময় হইত। কিন্তু যখন মবারক দরিয়ার আত্মদানের পরিবর্ত্তে আপনার হৃদয়ের অযত্নসঞ্চিত দয়ার সামান্য কণা মাত্র দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে যত্নবান হইলেন, তখন দরিয়ার হৃদয় হইতে সেই রমণীসুলভ কোমলতা পলায়ন করিল, তখন দরিয়ার হৃদয় চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া হা হা রবে নিনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না তো অপমান,
এ যে অমরাবতী ত্যেজে, হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারও চেয়ে সে যে মহীয়ান॥"

তখন দরিয়ার প্রতিহিংসাবৃত্তি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং দরিয়া সেই অনলে মবারককে, মবারকের যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সেই জেবউন্নীসাকে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে দগ্ধ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া উঠিল। এই ঘটনাটীর দ্বারাই আমরা দরিয়া চরিত্রের উগ্রতা ও স্বার্থপরতা অনুভব করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দরিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা, এইবার তাহারই একটু পরিচয় দিব।

যখন মবারক দরিয়াকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেই প্রস্তাব দরিয়ার দর্পে, দরিয়ার গর্ব্বে, দরিয়ার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল, তখন দরিয়ার হৃদয় আবেগভরে কহিয়া উঠিয়াছিল, "হায়, মবারক, তুমি যখন আমায় বলিলে, 'তুমি আমার কে যে তোমায় নিবারণ করিব?' তখন আমি তোমার অর্থ লইব কেন? আমি তোমার অর্থের ভিখারী নহি, আমি—আমি তোমার প্রেমের কাঙ্গাল। যদি আমার সেই সাররত্ন অথচ তোমার কিছুই নহে তাহাই আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে দাও, তাহা হইলে কেবল মাত্র আমি তাহাই লইব, নহিলে তোমার সকল জিনিষই আমার নিকট "হারাম।" দরিয়া

জানিত সে মবারকের পরিণীতা ভার্য্যা, অতএব মবারকের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ দখল আছে, সুতরাং সেই স্বত্ব পাইবার জন্য সে এমন কি সকল প্রকার কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপাচরণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। হায়, দরিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল যে এ সংসার পরীক্ষাসাগর, সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তা যখন দরিয়াকে এই পরীক্ষা-সাগরে নিক্ষেপ করিলেন, তখন দরিয়া সেই পরীক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। দরিয়া জেবউন্নীসার সহিত মবারকের বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য, তাহার চিরন্তনপ্রিয় মবারককে পাইবার জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক উপায়ই তাহার যত্নকে সফল করিতে পারে নাই, কারণ কপটতা কখনই মহদুদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দরিয়ার চরিত্র কিছু উগ্র, সুতরাং দরিয়ার প্রেমে, দরিয়ার প্রতিহিংসানলে, দরিয়ার রসিকতায়, এমন কি তাহার সকল কার্য্যেই আমরা তীব্রতার গন্ধ পাই। এই তীব্র প্রেমই তাহাকে বাদসাহী সওয়ার করিয়াছিল, এই তীব্র প্রেমই তাহাকে জেবউন্নীসার বিনাশসাধনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল, এই তীব্র প্রেমই তাহাকে দিয়া অবশেষে মবারকের হত্যাসাধন করাইয়াছিল। দরিয়া মবারককে ভালবাসিত সত্য, কিন্তু সে ভালবাসা যে কামনা-গন্ধশূন্য নহে, লালসা বিবর্জ্জিত নহে, স্বর্গীয় সৌরভে পবিত্রিত নহে, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। দরিয়ার প্রেম, দরিয়ার ভালবাসা অন্তর্মুখী নহে, তাহা বহির্মুখী, তাহা আপনাতেই আপনি মগ্ন থাকে না, তাহা পরকে আপনার সহিত জড়িত করিবার জন্য সদাই উৎসুক থাকে, তাহা সদাই পরের মুখের দিকে পল্লববিহীন নেত্রে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সে প্রেম পার্থিব জগতের পঙ্কিলস্রোতে কিঞ্চিৎ পূতিগন্ধময়। সে প্রেম মানবকে দেবত্বের গ্রামে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না, তাহা মঙ্গলের স্থানে অমঙ্গলকে টানিয়া আনে, শান্তির স্থানে বিপ্লবের মূর্ত্তি স্থাপনা করে, স্বর্গের স্থানে নরকের সৃষ্টি করে, আত্মদানের পরিবর্ত্তে আত্মগ্রাসিনী বৃত্তির উদ্রেক করে। সুতরাং দরিয়ার প্রেমে 'আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া'র ভাব তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, সে প্রেম যেন প্রাপ্তির আশা রাখে, সে প্রেম বোধ হয় যেন দরিয়াকে সম্বোধন করিয়া কেবল এই কথাই বলিতেছে—

"দরিয়ারে অভাগীরে কেন ভালবাসিলি রে?"

দরিয়ার প্রবৃত্তির দোষে অবশেষে এই প্রেম গরলে পরিণত হইয়াছিল; দরিয়া বাসনা-বাঁশরীর আকুল আহ্বানের বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারে নাই যে

উৎকণ্ঠা দূর করিয়াছেন, তাঁহারা অতি উজ্জ্বলরূপে দরিয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহারা দরিয়াকে বার বার পরীক্ষা-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া, দরিয়াকে বার বার বজ্র কঠিন আঘাতে আঘাতিত করিয়া, দরিয়ার চরিত্রের ক্রমোন্নতি এবং ক্রমবিকাশ দেখাইয়া, পূর্ণ পরিণতি যে মুক্তি, সেই মুক্তিতে দরিয়ার চরিত্রকে পৌছাইয়া দিয়া দরিয়ার চরিত্রের অবসান করিয়াছেন। যদিও কবি বলিয়াছেন যে, "এ জগতে উন্মাদিনী দরিয়াকে আর কেহই দেখিতে পায় নাই" তথাপি সেই দরিয়া যে রমেশচন্দ্রের হস্তে পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়া, কিঞ্চিৎ উন্নতা হইয়া, কিঞ্চিৎ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জেলেখারূপে মাধবীকঙ্কণে দেখা দেয়, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

স্বামীজি।

(১)

স্বামীজি বলিলেন—কলিকাতায় যাওয়া হ'বে কেন?

আমি বলিলাম—ঠাকুর, কথায় বলে "ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে।" আমার কিন্তু স্ত্রীবিয়োগ আমার পক্ষে কি দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে তা আর কি বল্‌ব। এখন কল্‌কাতায় না গেলে খেতে পাব না।

শান্ত গম্ভীর ভাবে স্বামীজি জিজ্ঞাসিলেন—"কেন?"

"ঠাকুর, স্ত্রীবিয়োগ তো শোকাবহ ঘটনা সবাই জানে। কিন্তু আমার ন্যায় গৃহ-জামাতার পক্ষে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে শোকের সঙ্গে অন্ন চিন্তা মিশ্রিত হ'য়ে উঠে। যখন দেখ্‌লাম শ্বশুরবাড়িতে বাস করা সুবিধা হবে না, দুর্গা নাম করে বেরিয়ে পড়লাম কোন রকমে কল্‌কাতায় পৌঁছিতে পারলে ভগবান একটা উপায় ক'রে দিবেন।

স্বামীজি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তোমার কি পিতৃকুলের কেহ নাই?

আমি বলিলাম—প্রভু, তাহ'লে কি আর শ্বশুর-মন্দিরে বাস কর্‌তাম? আপনারা সাধু মানুষ তা'র আর কি জানবেন বলুন।

গল্প করিতে করিতে আমরা গ্রামের বাহিরে পঁহুছিলাম। পশ্চিম গগনে দিনমনি মুখ লুকাইবার চেষ্টায় ছিলেন। দূরে একটা রাখাল বালক ইতস্ততঃ ধাবমান গরুর পালকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বেচারার চেষ্টা বার বার বিফল হইতেছিল।

স্বামীজি বলিলেন—আমাদের সমাজের নেতারা যখন বাঙ্গালী জাতটাকে এক করবার চেষ্টা করেন তখন এইরূপ ঘটে।

আমি পল্লীগ্রামে থাকিতাম সুতরাং বাঙ্গালী জাতির সহিত অস্মদ্দেশীয় গো-জাতির এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে পারে সে সন্দেহ আমার মনে কখনও স্থান পায় নাই। সুতরাং সে কূট গবেষণায় প্রবিষ্ট না হইয়া স্বামীজিকে বলিলাম—তাত হ'ল এ দিকে রাত্রি আসছে আর কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

স্বামীজি বলিলেন—পরিব্রাজকের আবার বিশ্রাম স্থানের আবশ্যক কি?

আমি বলিলাম—আপনি না হয় পরিব্রাজক সাধু; আমার তো সে রকম দেশ ভ্রমণ করা অভ্যাস নাই।

স্বামীজি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কেন সাধুর জীবনের কি কোনও আকর্ষণী শক্তি নাই? দিন কতক কেন সাধু হয়েই দেখ না।

আমার সেই শোকক্লিষ্ট, উদাস প্রাণে স্বামীজির কথা গুলা যেন মন্ত্রের মত কার্য্য করিল। আজ মাসাবধি যাহা খুঁজিতেছিলাম, আজ এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় কল্যাণপুরের প্রান্তরে যেন তাহা পাইলাম। উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভিত জলধির মধ্যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ সমুদ্রবেলা দেখিতে পাইলে যেমন শান্তি নিকেতন বলিয়া বোধ হয়, আজ এই অপরিচিত যুবক সন্ন্যাসী প্রদর্শিত পথের দিকে তাকাইয়া জীবনে যেন একটা নূতন বিশ্রামস্থল দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম শুভক্ষণেই স্বামীজির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আমারই পরিত্রাণের জন্য ভগবান ইঁহাকে আমার জীবন-পথে লইয়া আসিয়াছেন।

(২)

দুই মাস সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর বুঝিলাম এ জীবনেও জ্বালা যন্ত্রণা, ভাবনা চিন্তা যথেষ্ট আছে। তবে এ জীবনের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য নাই বলিয়া এবং আমাদের ন্যায় নবীন সাধুর জীবনে উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির অনুপস্থিতি বশতঃ সাংসারিক জীবাপেক্ষা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সুখী ছিলাম। যাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী তাহাদের কথা ঠিক বলিতে পারি না। এটুকু উপলব্ধি করিয়াছিলাম

যে আমার সঙ্গী এবং দীক্ষাগুরু নরোত্তম স্বামী ভণ্ড না হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন না। আমরা গৈরিক বসনধারী উদ্দেশ্যহীন পরিব্রাজক ছিলাম মাত্র।

আমার গুরু সম্বন্ধে কেবল যে এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলাম তাহা নহে। বাঙ্গালী চরিত্রের যে সকল বিশেষত্বগুলি সমাজে থাকিলে দেখিতে পাওয়া দুর্ল্লভ হয় সেগুলাও কিয়ৎ পরিমাণে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম।

আমরা যে সকল স্থানে আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইতাম তাহার প্রত্যেকের বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কোথাও গৃহস্বামীর পুত্রের পীড়া, কোথাও একেবারে সপ্তম-স্বরে তিরস্কার, কোথাও সুদীর্ঘ বক্তৃতা, আবার স্থল বিশেষে পরিশ্রম করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিবার উপদেশ প্রভৃতি প্রায়ই আমাদিগকে শুনিতে হইত। একদিন একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"ফিরে দেখ বাবা, ঘোড়ার নাল খুলে গেছে"। গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বামীজি বলিলেন—"আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি ঘোড়ার নালে আশ্রয় চাহি না মহাশয়ের বাটীতে চাহি।" বাবু তো অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"কাজলেম রেখে বিদেয় হও।" আমরা উভয়ে বলিলাম—"হরে মুরারে।"

আমার নূতন জীবনে উক্তপ্রকার দুই একটা বিরক্তিকর ঘটনা ঘটিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এ জীবনে আমি এক প্রকার সুখে ছিলাম। তবে মধ্যে মধ্যে যখন দুই একটা সুখের সংসারে আতিথ্য লইয়া গার্হস্থ্য জীবনের শান্তিপ্রদ মধুর চিত্র দর্শন করিতাম তখন সেই স্বর্গীয়া প্রেমময়ীর জন্য এক একবার হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলা পীড়ার কারণ হইয়া উঠিত। তখন মনে হইত গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখের মধ্যেও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। এক একবার অলসভাবে শয়ন করিয়া এক একটা শান্তির চিত্র কল্পনা করিতাম, আবার পরক্ষণেই স্মরণ করিতাম আমার ভবিষ্যৎ জীবনে সে চিত্রের স্বার্থকতা অসম্ভব। একবার তো এক ভদ্রলোকের কুমারী কন্যার রূপে একটু চিত্ত চাঞ্চল্য হইয়াছিল। যা'ক সাধুর পক্ষে সে কথার উল্লেখ করাও মহাপাতক। তবে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা মহাপাতক কি না জানি না। কারণ চিত্ত তো আর কাহারও বাধ্য নয়।

(৩)

স্বামীজি বলিলেন—চিত্তানন্দ, এবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাই চল।

আমি বলিলাম—স্বামীজি! বৃন্দাবন যে বহুদূর।

ধীর স্বামীজি বলিলেন—"নারায়ণের কৃপায় উপায় মিলবে।"

আমি বলিলাম—"ভালো।"

তখন আমরা পানাগড় ষ্টেশনে বসিয়াছিলাম। একখানা মালগাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। তাহার গার্ড শীঘ্র লাইনক্লিয়ার পাইবার জন্য ষ্টেশনের বাবুদের সহিত কলহ করিয়া বিরক্তভাবে প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া অর্দ্ধ শ্বেতাঙ্গ গার্ড সাহেবের রসিকতার পরিচয় দিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। স্বামীজির নিকট হাত পাতিয়া বলিল—বোলোতো সাধু হামারা কব্ সাদি হোগা।

স্বামীজি ইংরাজি বলিতে পারেন বা কর পরীক্ষা করিতে পারেন, এ ধারণা কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সুতরাং স্বামীজি যখন গার্ডের হাত লইয়া বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বলিলেন—বিবাহের জন্য আবার ব্যস্ত কেন?—তখন বাস্তবিকই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গার্ডটারও মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল—What do you mean?

স্বামীজি বলিলেন—এত যদি জানিতে ব্যস্ত হও তো তোমায় গাড়িতে আমায় লইয়া চলো, সকল কথা বলিব।

গার্ড বলিল—আমি মোগলসরাই অবধি যাইব। তাহার পর আমি যাহাতে আপনাদের বারাণসী যাওয়া হয় তা'র বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ধীর গম্ভীর ভাবে স্বামীজি গার্ডের ভ্যানে উঠিলেন। আমিও মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু ও উপনিষদ লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম।

গাড়ি ছাড়িলে গার্ড বলিলেন—এবার বলুন।

স্বামীজি বলিলেন—একটি স্ত্রীলোককে আপনি বিশ্বাস করিয়া বড় ঠকিয়াছেন। তাই ভাবিতেছি আপনার কি আবার বিবাহ করিতে মন হইয়াছে।

সাহেব বলিলেন—কেন বাবু পৃথিবীতে কি ভাল মন্দ নাই?

"অবশ্য আছে। অনেকে কিন্তু একবার প্রবঞ্চিত হইলে সমস্ত জগতকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে। আপনার আবার স্ত্রীলোকের দ্বারাই জগতে সুখ শান্তি উন্নতি সমস্তই হইবে। কিন্তু এখনও এক বৎসরকাল বিলম্ব করিতে হইবে।"

এইরূপে স্বামীজি সাহেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। অধিকাংশ কথাই বোধ হয় মিলিতেছিল। বলা বাহুল্য, আমাদিগকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করিতে গার্ডটি কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা আপনার নিজের সম্বন্ধে বৃন্দাবনে গিয়া কি হইবে বলিতে পারেন?

স্বামীজি বলিলেন—আমার সুখ দুঃখ সমান। বৃন্দাবনে আমার যে অবস্থা হইবে তাহা দেখিয়া আপনারা বলিবেন দুঃখের অবস্থা। আর আমার সঙ্গীর জীবনের একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হইবে। পরিবর্ত্তনটা কি তাহা আমি বলিতে পারি না।

(৪)

বৃন্দাবনে গিয়া মস্ত পরিবর্ত্তনই হইয়াছিল। স্বামীজির উপর প্রথম যে প্রকার ভাব ছিল বৃন্দাবনে পঁহুছিয়া সে ভাবটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবে পরিণত হইয়াছিল। যতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতেছিলাম, তাঁহার মহান্ চরিত্রটা আমার নিকট যতই বিকসিত হইতেছিল, ততই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে আমার সঙ্গী এবং গুরু কেবলমাত্র গৈরিকধারী পরিব্রাজক নহে। তাঁহার চরিত্রের একটা গভীরতা আছে. এ ধারণা দিন দিন আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কোনও কথাই এই ছয়মাস কালের মধ্যে জানিতে পারি নাই। বিশেষ কোনও যোগাভ্যাস বা সাধনা করিতে তাঁহাকে আমি দেখি নাই, তবে সকাল সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিতেন এবং এক একদিন রাত্রে নিস্তব্ধে পূজা করিতেন।

আমরা বৃন্দাবন আসিবার পরই একটি ব্রাহ্মণ সপরিবারে বৃন্দাবনে বাস করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। বিদেশে স্বজাতি বাঙ্গালীকে এইরূপে বিপন্ন দেখিয়া স্বামীজি যে প্রকার যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল। রোগীর কষ্ট দেখিলে আমার হৃদয়ের বল কমিয়া যাইত, আমি রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারিতাম না। এবার কিন্তু পীড়িত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সেবা করিবার জন্য ভগবান আমাকে কি এক নূতন বলে বলীয়ান করিয়াছিলেন। কারণ দিবারাত্র স্বামীজির সহিত আমি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম।

একদিন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রোগীর তো অবস্থা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের শ্রম সফল হইবে তো? ভদ্রলোকের কুমারী কন্যা ও স্ত্রীর কাতরতা দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।

ধীরভাবে স্বামীজি বলিলেন—লোকের মৃত্যুর উপর আমাদের কোনও ক্ষমতা নাই। সম্ভবতঃ ভদ্রলোক এ যাত্রায় রক্ষা পাইবেন না।

স্বামীজির কথায় আমার অত্যন্ত ভয় হইল। আমি সাগ্রহে বলিলাম— সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে তাঁহার অনাথা স্ত্রী, কন্যার কি হইবে?

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে স্বামীজি বলিলেন—হরে মুরারে। ভগবান উপায় করিবেন। হয়ত কন্যাটির এখানেই বিবাহ হইবে। শুনেছি ভূধরবাবুর যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। সুতরাং তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের কোনও চিন্তা নাই।

(৫)

পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে আমার জীবনে নানাপ্রকার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু আজিকার মত বিস্ময়কর ব্যাপার কখনও কাহারও জীবনে ঘটিতে পারে কিনা তাহা বলিতে পারি না। যাঁহাকে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত জীবাপেক্ষা অধিক ভক্তি করিতেছিলাম, যাঁহার ধীর গম্ভীর জ্ঞানপূর্ণ স্বভাব ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয়ের মধ্যে সিংহাসনাধিকার করিতেছিল, যাঁহার পরহিতার্থিতা, যাঁহার পবিত্রতার মধ্যে আমি সুমহান্ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ দেখিতেছিলাম, এক কথায় যাঁহাকে আমি শোকতাপ পরিপূর্ণ হিংসাদ্বেষময় পাপ পৃথিবীতে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কুৎসিত কথা শুনিয়া হৃদয়ে কি প্রকার বেদনা অনুভব করিতেছিলাম তাহা বর্ণনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইবার পরেই কতকগুলা যমদূতসদৃশ পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহাদের দলপতি দারোগা সাহেব বলিলেন— নরোত্তম স্বামী কাহার নাম?

স্বামীজি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—তুমি ধরিতে আসিয়াছ চেনো না?

দারোগা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না আমরা কেবল কলিকাতা হইতে শুনিয়া পাইয়াছি মাত্র। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব।

গ্রেপ্তারের নাম শুনিয়া সরোষে আমি বলিলাম—গ্রেপ্তার কিসের? আমরা সাধু মানুষ কা'র কি করেছি যে গ্রেপ্তার?

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন—সাধুরই বা গ্রেপ্তারে আপত্তি কি? আমার নাম নরোত্তম স্বামী।

দারোগা বলিল—আপনার হাত ধরিব না, সঙ্গে আসুন। আপনি তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় নোট জাল করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়া হয়। আপনার অপর নাম নরেন্দ্রকুমার রায়?

তাঁহার স্বাভাবিক ধীরভাবে স্বামীজি বলিলেন—সেকথা আপনারা না জানিয়া কি একজন লোককে বন্দী করিবার দায়িত্ব লইতেছেন? যাইতে হয় ত বলুন কোথা যাইব।

দারোগা সাহেব বলিলেন—আসুন।

স্বামীজি বলিলেন—ভাল কথা। চিত্তানন্দ বিচলিত হইও না। যদি ভূধরবাবু ইচ্ছা করেন তাঁহার কন্যা সুলোচনার পানিগ্রহণ করিতে অসম্মত হইও না।

স্বামীজির কথাগুলা সে সময় মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়াছিলাম। তখন তাহাদের অর্থ বুঝি নাই। তিনি চলিয়া যাইলে নানাপ্রকার সুচিন্তা, কুচিন্তা, মনকে আলোড়িত করিতেছিল। কিন্তু সেই আভ্যন্তরিক গোলমাল, দ্বন্দ্ব বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে একটি প্রশ্ন বেশ সুস্পষ্টভাবে বারম্বার বুঝিতে পারিতেছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতেছিল এই স্বামীজি কে?

(৬)

স্বামীজি সম্বন্ধে কোনও কথা আমি ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারস্থ কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু পুণ্যভূমি বৃন্দাবনের ঐতিহাসিক যমুনা পুলিনে একবার স্নান করিবার জন্য যাইলে পাঁচখানা সংবাদপত্র পাঠ করিবার কার্য্য হয়। সুতরাং নিত্যস্নায়ী চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী পরদিনেই সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিদ্রিত দেখিয়া আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। বানরের উপদ্রবে বারান্দাটি পরদাবৃত ছিল বলিয়া নিম্নস্থ যমুনার শোভা সম্যক দেখিতে পাইতেছিলাম না। ওপারে কতকগুলা কুম্ভীর মুখব্যাদান করিয়া চরের উপর পড়িয়াছিল, আর গোটাকতক কপিকুলধ্বজ লাঙ্গুলাদি টানিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুলোচনা আসিয়া বলিল—স্বামীজি, বড় স্বামীজি সম্বন্ধে যা' শুনছি তা কি সত্যি?

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—কি সত্য?

"তিনি সাধু নন, নোট জাল করিয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া বেড়াইতেন, পুলিশ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গেরেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে?"

"গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি অপরাধী কি নিরপরাধী তাহা বলিতে পারি না।"

বালিকা বলিল—স্বামীজি অপরাধী একথা বিশ্বাস হয় না। সকলেই বলিতেছে কিছু একটা ভুল হইয়াছে।

তাহার কথায় আমার হৃদয়ের একটা বোঝা নামিয়া গেল। প্রকৃত কথা বলিতে কি স্বামীজির বিপদের সময় হইতে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, নানাপ্রকার কুচিন্তা আসিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছিল। এই কথা সহরে রাষ্ট্র হইলে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মধ্যে আমার উপর একটা ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইবে এচিন্তাও আমার পক্ষে বড় অল্প পীড়ার কারণ হয় নাই। অথচ সেইরূপ বিপদের সময় ভদ্রলোককে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া, তাহার সেই উজ্জ্বল প্রভাতকুসুমসদৃশ বালিকাকে এবং তাহার সাধ্বী স্ত্রীকে বিদেশে নিঃসহায়-ভাবে বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে দিতে প্রাণ চাহিতেছিল না। সুতরাং সুলোচনা যখন বলিল, তাহাদের বিশ্বাস স্বামীজি সম্বন্ধে কলঙ্কটা মিথ্যা, তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। সাগ্রহে তাহাকে বলিলাম—"সে বিষয়ে সন্দেহ আছে! আমি জানি স্বামীজির চরিত্র দেবোপম"।

সুলোচনা বলিল—তিনি স্বয়ং কি বলিলেন?

বস্তুতঃ স্বামীজিতো আত্মসম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। আমাকে একটা নিরর্থক উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র তাহা এখন স্মরণ করিলাম। ছিঃ! ছিঃ! তাহাও কি হয়? একবার তাহার সেই স্নিগ্ধরূপ রাশির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ভাবিলাম এইরূপ বয়ঃসন্ধি দেখিয়াই বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন—

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল
দুহুঁ দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।"

বাস্তবিকই তাহার "থির নয়নে অথির কিছু ভেল।" পরক্ষণেই সেই মৃত্যু-শয্যা শায়িতা প্রিয়ামুখ স্মরণ করিয়া স্বামীজির উপর বড় ক্রুদ্ধ হইলাম। আমাকে স্থির থাকিতে দেখিয়া চঞ্চললোচনা সুলোচনা বলিল—কোন কথা কি তিনি বলেন নাই?

এবার মিথ্যা বলিলাম। কেন বলিলাম জানি না। শপথ করিয়া বলিতে পারি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলি নাই—"স্বামীজি বলিয়াছেন আজ হইতে তোমাদের বাটী আসা বন্ধ করিতে।"

বালিকার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, তাহার নয়নদ্বয় ভারী হইল। সে বলিল—না, না, তাহা হইলে আমার পিতার কি হইবে?

আমি বলিলাম—আজকাল তো তিনি একটু সারিয়াছেন, আর আমাদের

পরিচর্য্যার আবশ্যক হইবে না। এইবার তোমরা স্বয়ং তাঁ'র শুশ্রূষা করিতে পারিবে।

কুমারী বলিল—না তা' হবে না। আমি বাবাকে বল্‌ছি।

(৭)

স্বপ্ন কখনই নহে অথচ ঘটনাটা সত্যও নহে। স্বপ্ন যতই সুস্পষ্ট হউক না কেন তাহাতে একটা অবাস্তবের ভাব থাকে, তাহার বিষয়ীভূত নরনারীগুলা একটু ছায়াময় হয়, আর নিদ্রান্তে বেশ বুঝিতে পারা যায় স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। অথচ আমার অদ্যকার ঘটনাটা যদি সত্য হইত তাহা হইলে স্বামীজিকে তাহার পরেও দেখিতে পাইতাম, অন্ততঃ কাহারও না কাহারও মুখে শুনিতাম স্বামীজি আসিয়াছিলেন। কিন্তু সশরীরেই হউক, স্বপ্ন দেহেই হউক, যাদুবলেই হউক, যোগবলেই হউক তিনি যে মধ্যাহ্নে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহা সত্য। বহুদিন পরে তাহার সেই দিব্যকান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার সেই স্থির ধীর গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বিনী বাণী শুনিয়া আমি যে পুলক অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বাস্তব জগতের। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার কথা বলিতে আসিয়াছি আমার কথা বলিতে আসি নাই—তাহাও আমার কর্ণকুহরে এখনও মধুর প্রভাতী সঙ্গীতের মত বাজিতেছে।

আমি বলিলাম—আদেশ করুন।

"মনে আছে মোগলসরাই ষ্টেশনে বলিয়াছিলাম তোমার জীবনের এখানে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হইবে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ভাল তো কিছু হ'ল না। আপনার নিগ্রহে—

"সে কথা ছাড়িয়া দাও। পরিবর্ত্তনটা কি জান?"

"কেমন করিয়া বলিব।"

"তোমাকে সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি তোমায় সন্ন্যাসী করিয়াছিলাম আমি তোমায় গৃহী করিব।"

"গৃহস্থ জীবনে যে বড় কষ্ট স্বামীজি।"

"কিছু না। সঙ্গে যে দেববালা থাকিবেন তিনিই তোমায় সুখী করিবেন। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত নও।"

"দেববালা কাহাকে বলিতেছেন?"

"সুলোচনা। আজি হইতে দশ দিনের মধ্যে তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।"

"সেকি স্বামীজি আমি যে বিপত্নীক, আমার যে স্ত্রী স্বর্গে—

"হরে মুরারে। তিনি স্বর্গে থাকিবেন। পৃথিবীর জন্য এই স্ত্রী। আমার কথা অবহেলা করিও না।"

আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম—স্বামীজি নাই! বাহিরে গেলাম তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পথে ছুটিলাম স্বামীজির কোন চিহ্ন নাই, কুঞ্জের সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহ বলিল না যে স্বামীজিকে দেখিয়াছে। নিজের গৃহের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম। স্বামীজির বা তাঁহার আত্মার বা স্বপ্নের স্বামীজির কথা মনোমধ্যে আন্দোলিত করিলাম। কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। "হরে মুরারে" বলিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

(৮)

গৃহে আমি ও ভূধরবাবু ব্যতীত অপর কেহও ছিল না, সেদিন তিনি একটু সুস্থ ছিলেন। শয্যার উপর কতকগুলা বালিস রাখিয়া বসিয়াছিলেন। প্রাঙ্গনের তমালগাছের পাতা নাড়িয়া মন্দসমীরণ গৃহের ক্ষীণ দীপটিকে নিভাইবার উপক্রম করিতেছিল। যমুনার পরপারে নীড় হইতে কতকগুলা ময়ুর কেকারব করিতেছিল। বোধ হয় অন্ধকারে কোনও জম্বুক তাহাদের শাবক চুরি করিতে গিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—আর কত দিন পাগলামো হ'বে।

আমি বলিলাম—পাগলামো কিসের?

"গৈরিক বসন আর হবিষান্ন।"

আমি বলিলাম—সাধুর তো এই বারোমেসে ব্যবস্থা।

তিনি বলিলেন—কাল রাত্রে নরোত্তম স্বামীকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি হাজত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। মনের ইচ্ছাটা চিত্তকে জানাইবেন। শীঘ্র সাক্ষাৎ হ'বে।

আমি বলিলাম—"অর্থ বুঝিলাম না।"

"না বুঝিবারই কথা। আমি তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া অবধি একটা বাসনা করিয়াছি। আমার এক মাত্র কন্যাটি তোমার হস্তে অর্পণ করিব।"

আমি তখনই স্বামীজির কথা স্মরণ করিলাম। কিন্তু এ কয়দিন আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম স্বপ্নের কথা অবহেলা করিব। মনে করিবেন না

সাহিত্য-সমাচার।

জাহ্নবী—৪র্থ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। কয়েক দিবস হইল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "জাহ্নবী" আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা পাইবামাত্রই আমাদের এক বন্ধু গাহিয়া উঠিলেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।"

বাস্তবিকই "জাহ্নবীর" এ প্রকার অনিয়মিত প্রকাশে আমরা দুঃখিত। যে "জাহ্নবীর" প্রবাহ দুর্দ্দান্ত ঐরাবতও প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই পূত "জাহ্নবী" নামাঙ্কিত সাময়িক জাহ্নবীর কেন গতিরোধ হয় ভাবিবার বিষয়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় "মিলন" শীর্ষক কবিতাটী বেশ হইয়াছে। "বাঙ্গালা-ভাষায় উৎকল-শব্দের সমাবেশ"—প্রবন্ধটী গবেষণামূলক এবং বর্ত্তমান সংখ্যা "জাহ্নবীর" সম্পদ বিশেষ। "বিক্রম-পুরের কয়েকটী প্রাচীন স্থান"—প্রবন্ধটী বহু জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। "কন্যাদায়" (গল্প)—মন্দ হয় নাই। "বাঙ্গালার অন্তঃপুরে আবৃত্তির আদর"—লেখক বলিতেছেন "আবৃত্তি বাঙ্গালীর ঘরে এক সময়ে অতি উচ্চ আদর পাইয়াছিল * * *" এবং "এই উন্নতির যুগে লোপ পাইতে বসিয়াছে।" বর্ত্তমান সংখ্যা "জাহ্নবীতে" অনেক শিক্ষনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বাল্যসখা—ইহা "বালকবালিকার জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা"—আমরা এই মাসিকের কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ। আমাদের বিশ্বাস সুকুমারমতি বালক বালিকা ইহা পাঠে অতি সহজে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। দুই একটী প্রবন্ধের ভাষা তাহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য হইবে সুতরাং ভাষা একটু প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন মাসিকের দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

শোক-সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, বিগত ১৬ই ভাদ্র আমাদের পরম সুহৃদ্ অর্চ্চনা-সম্পাদক শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব হরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই শ্রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ওলাউঠা রোগগ্রস্ত হওয়ায় তিনি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছাপরায় গমন করেন কিন্তু তিনি সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কন্যা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিল সুতরাং কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কন্যা-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তিনটী পুত্র একটী কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্নেহ মায়া মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়া তিনিও সেই পথানুবর্ত্তী হইয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন স্মৃতি ও হাহাকার। মনুষ্যোচিত সকল ধর্ম্মেই তিনি ভূষিত ছিলেন। তাঁহার স্নেহ আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিব কি, তাঁহার মৃত্যুতে আমাদেরই হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ভগবান তাঁহার পরি-বারবর্গকে শোক সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

অর্চ্চনা সমিতির সভ্যবৃন্দ।

৫ম বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩১৫। [৯ম সংখ্যা।

October 1908.

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে বঙ্গীয় সাধনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং'র সর্ব্বজন প্রশংসিত

সুরমা ।

প্রতি গৃহে সুরমার কথা ।

কেন তা জানেন কি ? "সুরমা" মহাসুগন্ধি এবং অতি তৃপ্তিকর কেশতৈল । প্রথম শ্রেণীর কেশতৈলে যে যে গুণ থাকা উচিত সুরমায় তা আছে । গন্ধে মন মাতাইবে, এবং কেশের মসৃণতা ও কোমলতা বাড়াইতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ।

কেন তা জানেন কি ? সুরমা প্রত্যেক বঙ্গমহিলার সোহাগের অঙ্গরাগ । যদি গৃহিণীর মুখে হাসি দেখিতে চান, নিজ গৃহে চিরবসন্ত বিরাজমান করিতে চান, "সুরমা" নিত্য ব্যবহার করুন ।

মূল্যাদি ।—বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵৹ সাত আনা । তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা । ডাকমাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা ।

আমাদের নূতন এসেন্স ।

গন্ধরাজ ।—সত্য সত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার ।

পারিজাত ।—এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ !

মস্ক্ জেসমিন । —মিশ্রিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে ।

হোয়াইট্ রোজ ।—নামের অনুবাদ করিলেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায় । এই আমাদের "শেতউজ্জি গোলাপ ।"

কাশ্মীর-কুসুম ।—কুঙ্কুম বা জাফরান্ ইহার মূল উপাদান, আর অধিক পরিচয় অনাবশ্যক ।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ টাকা । মাঝারি ৸৹ বার আনা । ছোট ॥৹ আট আনা । প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা । মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা । ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা । মাশুলাদি স্বতন্ত্র । আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাকমাশুল ।৴৹ পাঁচ আনা । অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা । মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা । আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ । প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা ।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী ।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্ ।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ।

দরিয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দরিয়ার ন্যায় জেলেখাও তাতার জাতীয়া। দরিয়ার সহিত জেলেখার অনেক সাদৃশ্য আছে; তবে জেলেখা কিছু গম্ভীরাপ্রকৃতি, কিছু বিষাদময়ী, কিছু অধিকতর সংযমী। দরিয়া কিছু গর্ব্বিতা, কিছু দর্পময়ী সত্য, কিন্তু জেলেখার তেজ, জেলেখার দর্প আরও কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত। জেলেখা দরিয়া অপেক্ষা লজ্জাশীলা, দরিয়া অপেক্ষা অন্তর্ম্মুখী। জেলেখা দরিয়ার ন্যায় তাতার জাতীয়া সত্য, কিন্তু দরিয়ার ন্যায় নিষ্ঠুরপ্রাণা নহে; জেলেখার প্রাণ কিঞ্চিৎ কোমল, জেলেখার প্রতিহিংসানল কিঞ্চিৎ তেজোহীন; জেলেখার হৃদয় কিছু অধিকতর সংযত। জেলেখা যে প্রেমে পড়িয়াছিল, তাহার মূলে কিঞ্চিৎ দয়া ছিল, পরে সেই দয়াই প্রলয়ের মূর্ত্তি ধরিয়া জেলেখার হৃদয়কে পুড়াইয়া পুড়াইয়া খাক্ করিয়া ফেলিয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে, নরেন্দ্রনাথ যখন আহত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় জেলেখার সন্নিকটে আনীত হইলেন, তখন জেলেখা রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ভবিষ্যতের বিভীষিকাময় পরিণাম ভুলিয়া, কেবল মাত্র নিজ উগ্র বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রাসাদে আনিয়া রাখিয়াছিল এবং যখন আত্মসংযম করিতে না পারিত, তখন নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার সকল জ্বালার, সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট হইত, আর মধ্যে মধ্যে আপনহারা হইয়া কহিয়া উঠিত,—

"প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?
তোমা বিনে মন, করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!"

বাস্তবিকই জেলেখা তখন বুঝিতে পারিত না যে নরেন্দ্রনাথ কে, নরেন্দ্রনাথ কেমন, নরেন্দ্রনাথ কি, বাস্তবিকই সে বুঝিতে পারিত না যে সে নরেন্দ্রনাথকে লইয়া কি করিবে।

আমরা পূর্ব্বে দরিয়াচরিত্রে আত্মসংযমের অভাব দেখিয়াছি এবং এক্ষণে জেলেখাতেও আমরা সেই আত্মসংযমাভাব অপেক্ষাকৃত অল্পায়তনে দেখিতে পাই। জেলেখার যদি আত্মসংযম পূর্ণমাত্রায় থাকিত, যদি সে নিজ প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারিত, যদি সে প্রকৃত, কামনাশূন্য প্রেমের প্রেমিকা হইতে পারিত, তাহা হইলে সে কথনই কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথকে প্রত্যহ সন্দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে 'হারামে' আনিয়া রক্ষা করিত না, তাহা হইলে সে কথনই অত দর্পময়ী ও তেজস্বিনী হইয়াও সামান্য খোজা যে মসরুর, তাহার তোষামোদ করিত না। তবে দরিয়াতে আমরা যে অসীম সাহস দেখিতে পাই, সে সাহস জেলেখাতেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল; সে নিজের প্রাণকে অতি তুচ্ছ, অতি হীন বলিয়াই জানিত, কিন্তু তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে নরেন্দ্র নাথ, সেই নরেন্দ্রনাথের জীবনসংশয়স্থলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইত, তখন তাহার যত দর্প, যত তেজস্বিতা, সকলই ক্ষণকালের মধ্যে বিলুপ্ত হইত, তখন তাহার হৃদয় সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠিত, তখন সে বিহঙ্গিনী যেরূপ আপনার পক্ষের মধ্যে লুকাইয়া আপনার শাবকদিগের প্রাণরক্ষা করে, সেইরূপ ভাবে আপনার প্রাণ সংশয় করিয়াও নরেন্দ্রনাথকে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হইত।

বাদসাহ অন্তঃপুর অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ জেলেখাকে যত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র উত্তর পান নাই, কেবলমাত্র জেলেখার নীরব-তপ্ত অশ্রু তাঁহার প্রশ্নের কোনও অজ্ঞাত উত্তর প্রদান করিত। এই তপ্ত অশ্রু কি রহিয়া রহিয়া, সকল সুখ দুঃখের উপর দাঁড়াইয়া বলিত না যে—

"তোমারি চরণে নাথ দেছি উপহার,
যা কিছু সৌরভ এর তোমারি, তোমার।"

আমরা দরিয়ার চক্ষুতে কেবলমাত্র একবার জল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু জেলেখার হৃদয় দরিয়ার হৃদয়াপেক্ষা কোমলতর সুতরাং জেলেখা উত্তর দিতে পারিত না, সেই জন্যই সে কেবলমাত্র অশ্রুপাত করিয়াই আপনার গুপ্ত প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতে সচেষ্ট হইত।

দরিয়া যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে স্বামীরূপে পাইয়াছিল, তাহার সহিত কিয়দ্দিবসের জন্য বাসও করিয়াছিল, তাহার নিকট প্রশংসমানাও হইয়াছিল, কিন্তু জেলেখা যাহাকে আপনার করিবার জন্য এমন কি নরকে প্রবেশ করিতেও ভীতা হইত না, জেলেখা যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, যাহার

মুখ সন্দর্শন করিবার জন্য এমন কি ভারতের সম্রাট যে আওরঙ্গজেব, সেই আওরঙ্গজেবের ও আদেশ অমান্য করিয়াছিল, সেই জেলেখার বড় আপনার ধন নরেন্দ্রনাথ কিন্তু জেলেখার প্রতি কোনও দিন সমবেদনা প্রকাশ করে নাই, সেই জেলেখার বড় আদরের সামগ্রী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের স্ত্রী হেমলতার জন্যই সারাদিন উন্মনা রহিত, সেই জেলেখার হৃদয়সর্ব্বস্ব নরেন্দ্রনাথ কিন্তু জেলেখাকে "যবনী" বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে, জানি না!

জেলেখা নরেন্দ্রনাথের জন্য সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল সত্য, জেলেখা নরেন্দ্রনাথের জন্য 'প্রেমের দেওয়ানা' হইয়াছিল সত্য, জেলেখা তাহার মনের মানুষ, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তরকে পাইবার জন্য সকল প্রকার কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন নরেন্দ্রনাথ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার গর্ব্বে আঘাত করিলেন, তাহার বড় আশায় ছাই দিলেন, তখন দরিয়ার ন্যায় জেলেখার হৃদয়েও প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। তখন জেলেখার হৃদয়ও দিগন্তদাহী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল যে—

"আমার পরাণ যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে।"

সেই জন্যই সে ঔষধিপানে অচেতন নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যতা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দরিয়াপেক্ষা জেলেখা কিঞ্চিৎ কোমল-প্রকৃতি-সম্পন্না, কিঞ্চিৎ অল্প প্রতিহিংসাপরায়ণা। সুতরাং সে তাহার চিরবাঞ্ছিত, তাহার লীলার ক্রীড়া-নিকেতন, তাহার জীবনের সার, তাহার প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, তাহার সংসারের সর্ব্বস্ব, তাহার নন্দনকাননের পারিজাত তাহার স্বর্গপুরীর অমরা, তাহার অমরার সুখ, তাহার সুখের সর্ব্বস্ব যে নরেন্দ্রনাথের বক্ষস্থল, সেই বক্ষস্থলে আঘাত করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহার দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি হইতে ছুরিকা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেই জন্য সে বিরহাগ্নির অরুন্তুদ মর্ম্মযাতনা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল, সেই জন্য সে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিকে পুনর্প্রজ্বলিত করিবার জন্য তাহাকে হেমলতার সন্ধান বলিয়া দিয়া আপনার প্রতিহিংসানলকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছিল। জেলেখা প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, জেলেখা প্রেমের জন্য 'দেওয়ানা' হইয়াছিল, জেলেখা প্রেমের জন্য আত্মহত্যা

করিয়াছিল বটে ; কিন্তু সে তথাপি পরজন্মে কিম্বা পরলোকে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই সে লিখিয়াছিল, "যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র, এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমায় দেখাইব।" দরিয়া স্বীয় প্রাণের আবেগ, স্বীয় প্রাণের উচ্ছ্বাস, স্বীয় প্রাণের আকুল বাসনাকে মবারকের গোচরীভূত করিয়াছিল, কিন্তু জেলেখা কোমলতাবশতঃ, লজ্জাবশতঃ স্বীয় হৃদয়ের আবরণকে উন্মোচন করিতে পারে নাই, অশ্রু-বন্যা তাহার হৃদয়ের যত মর্ম্ম-যাতনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

জেলেখা মরিল সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণের আকুল হাহাকারের রোদনধ্বনি তো থামিল না, তাহার পাপেরতো সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল না, সুতরাং সে দরিয়ারূপে যে পাপসাধন করিয়াছিল সেই পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুনরায় রমেশচন্দ্রের হস্তে বিমলারূপে আবির্ভূতা হইল।

জেলেখা তাহার হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিত—

"হৃদয়রে, হৃদয়রে ওরে দগ্ধমন,
আমাদের তরে ধরা হয়নি সৃজন।"

সুতরাং সে ভাবিয়াছিল,

"বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।"

কিন্তু হায় চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,—

"——এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ।"

সেই জন্যই, উন্নতিশীল জগতে উন্নতিশীল জেলেখার হৃদয়ে প্রণয়ের সুখ অনুভব করাইবার জন্যই যেন, বোধ হয়, রমেশচন্দ্র বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিয়াই 'বঙ্গবিজেতায়' পুনরায় জেলেখার পরজন্ম দেখাইয়াছেন।

বিমলা দরিয়া বা জেলেখার ন্যায় তাতার জাতীয়া নহে, সে আমাদের কুসুম-কোমলা বঙ্গকুলললনা। বঙ্গকুলললনার ন্যায় তাহার হৃদয় অতীব কোমল ছিল। সে কোমলতা তাতার জাতীয়া জেলেখার কোমলতাকেও পরাস্ত করিয়াছিল। তবে জেলেখাতে যে সাহস, যে বুদ্ধিমত্তা, যে দর্প আমরা অবলোকন করি, তৎসমূহই আমরা বিমলা চরিত্রে আরও অধিকতর পরিস্ফুট-রূপে দেখিতে পাই। বিমলার আত্মসংযম, বিমলার উদারতা, বিমলার পর-

হিতৈষণা প্রবৃত্তি, বিমলার দয়া দাক্ষিণ্য যে জেলেখার অপেক্ষা উন্নততর, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

জেলেখার স্থায় বিমলাও যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, জেলেখার স্থায় বিমলাও যাহার প্রাণরক্ষা সাধন করিয়া নিজের জীবন সংশয় করিয়াছিল, জেলেখার স্থায় বিমলাও যাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধা হইয়া আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিয়া উঠিয়াছিল,—

"অমিয়া মাখানো মুখানি তোমার
দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর,
ও মুখানি লোয়ে কি যে করিতাম,
বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,
ভাবিয়া পেতাম তা কি ?"

সেই বিমলার বুকে রাখিবার সামগ্রী, সেই বিমলার কণ্ঠের হার, সেই বিমলার কবরীভূষণ, সেই বিমলার বড় যত্নের ধন সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু বিমলার সেই অনাবিল সাগর তুল্য প্রেমের পরিবর্ত্তে সামান্য বাৎসল্য ভাব ব্যতীত আর কিছুই দেন নাই। কিন্তু তথাপি বিমলা জেলেখার ন্যায় আত্মহত্যা করে নাই, কারণ তাহার যে আত্মসংযম ছিল, সে যে বুঝিত "যার যত জ্বালা, তার ততই পিরীতি," সে যে জানিত প্রণয়ীকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে হয়—সে সাধনা দুঃখের ভিতর দিয়া প্রেমের সাধনা, অসূয়ার ভিতর দিয়া প্রীতির সাধনা, আপনার ভিতর দিয়া সমস্ত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার সাধনা। সেই জন্যই তো যখন সুরেন্দ্রনাথের সহিত সরলার বিবাহ হইয়া গেল, তখন আর বিমলা, সরলা ও সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ সত্বেও চতুর্বেষ্টিত দুর্গের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয় নাই, তখন সে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিরাট বিশ্বের বিরাট অধীশ্বরকে আহ্বান করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিয়া উঠিয়াছিল,

"ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃত রস,
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ।"

তখন সে সেই জন্যই, দরিদ্র দুঃখিনীগণকে দুঃখের ভীষণ কশাঘাতের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনার অবশিষ্ট জীবনকে নিয়োজিত করিয়াছিল।

রাজসিংহে যখন আমরা সর্ব্বপ্রথমে দরিয়াকে দেখিতে পাই, তখন দরিয়া সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী তন্বঙ্গী কিশোরী, বঙ্গবিজেতাতেও যখন বিমলার সহিত

পাঠকের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন বিমলাও আপনার অসীম সৌন্দর্য্যের ডালা লইয়া সপ্তদশবর্ষীয়া কিশোরীরূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। তবে বিমলাতে আমরা এমন কয়েকটা গুণ দেখিতে পাই, যাহা অবস্থার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক দরিয়া বা জেলেখাতে পরিদৃষ্ট হয় না। বিমলার পিতৃস্নেহ বাস্তবিকই বড়ই তৃপ্তিপ্রদ, বড়ই মনোরম, বড়ই ঔজ্জ্বল্যময়। বিমলাতে আমরা এমন একটী মাতৃভাব দেখিতে পাই, যাহাতে স্বতই আমাদের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তির বা শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়া থাকে। বিমলার বুদ্ধি জেলেখার বুদ্ধি অপেক্ষা আরও তীক্ষ্ণতর। বিমলা স্বীয় পিতাকে পাপ পথ হইতে অপহৃত করিবার জন্য, পিতাকে ন্যায়পথে পরিচালিত করিবার জন্য, পিতাকে দুরাত্মা শকুনির হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু সে চেষ্টাতে কোনও অসম্মানসূচক কার্য্য ছিল না, তাহাতে কোনওরূপ পিতৃনিন্দার গন্ধ অবধি ছিল না, - সে চেষ্টা কেবল মাত্র পিতৃভক্তির প্রভায় উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সে চেষ্টা কেবল মাত্র পিতার প্রতি অসীম স্নেহের সৌরভে সৌগন্ধযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিমলার সহিত যখন সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহারা উভয়েই মহেশ্বর-মন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছিলেন। বিমলা যখন মন্দিরের চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তখন তাহার সংযমের বাঁধ ভাসিয়া গেল, তখন সে অনিমেষলোচনে সুরেন্দ্রনাথের দেবদুর্লভ রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল, তখন সে এতই উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহার পাত্রাপাত্র, স্থান অস্থান জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। সুতরাং সে যে সুরেন্দ্রনাথের প্রেমে পড়িয়াছিল, তাহার মূলে আমরা বিমলার এই রূপতৃষা দেখিতে পাই।

বিমলার প্রাথমিক জীবনে আমরা বিমলার চরিত্রে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় আত্মসংযমের অভাব দেখিতে পাই। সে পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথের বংশপরিচয় জানিবার জন্য সমুৎসুক ছিল এবং যখন সুরেন্দ্রনাথ কোনও কারণ বশতঃ বিমলার সহিত কথা কহিলেন, তখন সে তাহার ইচ্ছার গতিকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, তখন সে প্রগল্‌ভার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার বংশের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। পরে যখন সে জানিল সুরেন্দ্রনাথ কায়স্থ বংশীয় জমীদারের সন্তান, "তখন ব্রাহ্মণকুমারী বিমলা অবনত-

মুখী হইয়া নিস্তব্ধে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল।" এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই বিমলার যত সুখ, যত আশা, যত ভরসা, বিমলার হৃদয়ের যত হাহাকার, যত উদারতা, যত প্রীতি, যত কোমলতা, সমস্তই যেন একসঙ্গে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই যেন আমাদের বোধ হয় বিমলার হৃদয় মর্ম্মযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিয়া উঠিতেছে,—

"তবে থাক্, থাক্ সব, বুকে থাক গাঁথা—
বুক যদি ফেটে যায়, ভেঙ্গে যায়, চূরে যায়
তবু রবে লুকানো এ কথা,
দেবতা গো বল দাও, এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।"

বিমলা কুসুমকোমলা কমনীয় কলেবরা, বঙ্গরমণী বটে, কিন্তু তাহার জাতীয়া জেলেখার দৃঢ়তা, কার্য্যতৎপরতা এবং বিপদকালে অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমরা বিমলা চরিত্রে আরও অধিকতর উন্নতভাবে এবং পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই। তবে জেলেখা জানিত না যে—

"এ হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়ণি
কি দিলে হইবে ভাল?"

কিন্তু বিমলার নিকট এই রাজরোগের মহৌষধি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে আমরা দুই জনে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, চারিদিকে গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে,—গড়ের মধ্যস্থ গাছগুলিও বড় সুন্দর দেখাইতেছে। গত কল্য অপরাহ্ণে এ স্থান যত নির্জ্জন, শ্মশানবৎ বোধ হইতেছিল, আজ সকালে তেমন নির্জ্জন বলিয়া বোধ হইল না।

আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল, মণিভূষণের মনেও ঠিক সেই ভাব হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "কাল আমরা রেলে আসিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম,—আমাদের মন ভাল ছিল না, তাই বাড়াটা কেমন কেমন বোধ হইতেছিল—আজ এখন আর কেমন বোধ হইতেছে না।"

আমি বলিলাম, "ইহা যে কেবল আমাদের মনের গতিকের জন্য হইয়াছিল, তাহা নহে। কাল রাত্রে আপনি কি কোন স্ত্রীলোককে কাঁদিতে শুনিয়াছিলেন?"

মণিভূষণ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তাই ত—যথার্থই ত আমিও যেন ঘুমের ঘোরে কাহাকে কাঁদিতে শুনিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

আমি। না, আমি জাগিয়াছিলাম,—আমি স্পষ্ট কোন স্ত্রীলোককে কাঁদিতে শুনিয়াছিলাম।

মণি। অনুপকে এখনই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অনুপ আসিলে রাজা তাহাকে এই ক্রন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি দেখিলাম, রাজার কথা শুনিয়া অনুপের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, "এ বাড়ীতে আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক নাই। আমার স্ত্রী আমার ঘরে শুইয়াছিল, সে কাঁদিবে কেন?"

অনুপ যে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, তাহা আমি একটু পরে সব জানিতে পারিলাম। অনুপের স্ত্রী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আমাদের খাবার দিতে আসিলে আমি অলক্ষ্যে তাহার মুখটা একবার দেখিলাম; দেখিয়াই বুঝিলাম, যে কারণেই হউক, এই স্ত্রীলোক গত রাত্রে কাঁদিয়াছিল, এখনও তাহার চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। তবে কেন অনুপ এরূপভাবে মিথ্যাকথা কহিল? কেনই বা এই স্ত্রীলোক গভীর রাত্রে কাঁদিতেছিল? অনুপের সহিত যে কোন রহস্য জড়িত আছে, এ সম্বন্ধে আমার ক্রমে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। সেই প্রথমে মৃত রাজার দেহ দেখিতে পায়; সে কিরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা সে যাহা বলিয়াছে, সকলেই তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার পর তাহার মুখেই ঘন কাল দাড়ী, তবে কি আমরা কলিকাতার রাস্তায় গাড়ীর ভিতরে তাহাকেই দেখিয়াছিলাম? সে লোকটার দাড়ীটা ঠিক এই অনুপের মত ছিল। অনুপই সেই লোক কিনা, তাহা আমি কিরূপে স্থির করি? দেবগ্রামের টেলিগ্রাফমাষ্টারের সঙ্গে প্রথম দেখা করা আবশ্যক। তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, টেলিগ্রামখানা সেদিন যথার্থই অনুপের নিজের হাতে দেওয়া হইয়াছিল কি

না। যদি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অনুপ এখানেই ছিল, কলিকাতায় আমরা যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে স্বতন্ত্র লোক। যাহাই হউক, এ অনুসন্ধান করা এখনই আবশ্যক হইতেছে; অন্ততঃ ইহা হইলে গোবিন্দরামকে কিছু লিখিবার বিষয় পাওয়া যাইবে।

পরদিন নূতন রাজা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের ও তাঁহার বিষয় সম্বন্ধীয় স্তূপাকার কাগজ লইয়া বসিলেন। আমি দেখিলাম, কাগজ-পত্রগুলি শেষ করিয়া উঠিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিবে। এই সুবিধা—একটু বেড়ানও হইবে, আর টেলিগ্রামটার সন্ধান লওয়াও হইবে। এই সকল ভাবিয়া আমি দেব-গ্রামের দিকে রওনা হইলাম।

আমি বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়া চলিলাম। দুইদিকেই—যতদূর দেখা যায়, কেবলই মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—প্রায় এক ক্রোশ দূরে আসিয়া দেখিলাম, বামদিকে একটু দূরে ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবুর বাড়ী। তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া আরও অনেকখানি গিয়া ডাকঘর পাইলাম। ডাকঘরেই এখানে টেলিগ্রাফ আফিস।

আমি পোষ্টমাষ্টারের সহিত আলাপ করিয়া ক্রমে সেই টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "যেমন বলা হইয়াছিল, ঠিক সেই মত অনুপকে গড়ে টেলিগ্রামখানা দেওয়া হইয়াছিল।"

"কে তাহাকে টেলিগ্রামখানা দিতে লইয়া গিয়াছিল?"

"আমার পিয়ন। (উদ্দেশে) ওরে হরি"——

হরি ছুটিয়া আসিল। পোষ্টমাষ্টার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গড়ে অনুপকে টেলিগ্রামখানা তুই দিয়া আসিয়াছিলি?"

হরি। হাঁ বাবু।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাকে নিজের হাতে দিয়াছিলি?"

হ। না—সে বাড়ীর ভিতরে ছিল, সেইজন্য টেলিগ্রামখানা তাহার নিজের হাতে দিতে পারি নাই, তাহার স্ত্রী নীচে ছিল, তাহাই তাহার হাতে দিয়াছিলাম।

আমি। অনুপের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল?

হ। না, সে ভিতরে ছিল।

আমি। যখন তুমি তাহাকে দেখ নাই, তখন কি রকমে জানিলে যে, সে ভিতরে ছিল?

হ। তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল।

এবার পোষ্টমাষ্টার একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "অনুপ কি টেলিগ্রামটা পায় নাই? যদি না পাইয়া থাকে, তবে ইহার জন্য তাহার নিজের লেখা উচিত।"

এখানে আর কিছু জানিবার আশা নাই, দেখিয়া আমি তথা হইতে বিদায় লইলাম। গোবিন্দরামের টেলিগ্রাম সত্ত্বেও জানিবার উপায় নাই যে, সেদিন অনুপ বাড়ীতে ছিল, না যথার্থই কলিকাতায় গিয়াছিল।

যদি তাহাই মনে করা যায় যে, অনুপ কলিকাতায় গিয়া নূতন রাজার পিছু লইয়াছিল, আর সে-ই পুরাতন রাজার মৃতদেহ প্রথম দেখিতে পায়, তাহা হইলেই বা কি? সে কি পরের হইয়া কাজ করিতেছে, না তাহারই নিজের কোন দুরভিসন্ধি আছে? এই রাজবংশের শক্রতা করিয়া তাহার লাভ কি?

"সোমপ্রকাশ" কাগজ কাটিয়া যে পত্র রাজাকে লেখা হইয়াছিল, তাহাতে এই বিস্তৃত মাঠ সম্বন্ধে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পত্রের কথা আমার মনে হইল। অনুপ কি রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই পত্র লিখিয়াছিল, না অনুপ যাহাতে রাজার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য রাজাকে সাবধান করিতে অপর কেহ লিখিয়াছিল? আর যদি অনুপই এইরূপ করিয়া থাকে, তবে তাহার উদ্দেশ্য কি? বোধ হয়, নূতন রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক—যদি ভয় দেখাইয়া তাহাকে এই বাড়ী হইতে দূরে রাখিতে পারে, তাহা হইলে অনুপ স্বয়ং এখানে মালিক হইয়া থাকিতে পারিবে।

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, অলক্ষ্যে থাকিয়া কেহ রাজার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য ষড়্‌যন্ত্র জাল বিস্তার করিতেছে। এই বাড়ীতে কেবল মালিক হইয়া থাকিবার জন্য কেহ এতটা চক্রান্ত করিতে পারে না। গোবিন্দরাম নিজেই বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারের ন্যায় জটিল ব্যাপার তিনি আর কখনও দেখেন নাই। নির্জ্জন প্রান্তরপথ দিয়া গড়ের দিকে ফিরিতে ফিরিতে আমিও শতবার তাহাই মনে করিতে লাগিলাম। এখন গোবিন্দরাম যত শীঘ্র হয়, এখানে আসিয়া পৌছিলে ভাল হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এই সময়ে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, যেন কে আমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে। ডাক্তার

নলিনাক্ষ বাবু ভাবিয়া আমি ফিরিলাম, কারণ এখানে আর কেহ আমায় চিনিত না; কিন্তু দেখিলাম, এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার দিকে খুব দ্রুত পাদক্ষেপে আসিতেছে।

লোকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, গোঁফদাড়ী কামানো, বেশ বলিষ্ঠ, খর্ব্ব দেহ, চক্ষু দুইটী তীক্ষ্ণ ও উজ্জল, বোধ হয়, বয়স ছত্রিশ বৎসরের কম হইবে না, তাহার হাতে একটা ফুলের সাজি, তন্মধ্যে অনেক ফুল সংগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমি উপযাচক হইয়া আপনার সঙ্গে আলাপ করিতেছি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না, এখানে আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, সহরের নিয়ম-কানুন বড় জানি না, কোন লোক পাইলেই তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে ব্যস্ত হই। বোধ হয়, আপনি নলিনাক্ষ বাবুর কাছে আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমার নাম সদানন্দ।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, নলিনাক্ষ বাবু আপনার কথা বলিয়াছিলেন। আপনি আমাকে চিনিলেন কিরূপে?"

তিনি বলিলেন, "আমি নলিনাক্ষ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম, আপনি তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলেন, তাহাই জানালা হইতে তিনি আপনাকে আমায় দেখাইয়া দিলেন। আমাকেও এই পথে যাইতে হইবে, তাহাই ভাবিলাম, আপনার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যাই। আশা করি, রাজা মণিভূষণ ভাল আছেন।"

আমি। হাঁ, বেশ ভাল আছেন।

তিনি। এখানে আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, রাজা অহিভূষণের হঠাৎ মৃত্যুর কথা শুনিয়া হয় ত রাজা মণিভূষণ এখানে বাস করিবেন না। তাঁহার ন্যায় বড় লোকের, বিশেষতঃ সৌখীন যুবকের পক্ষে এরূপ ভাঙ্গা গড়ে বাস করা সুখের নহে, তাহা জানি, তবে জমিদার বিদেশে থাকিলে দেশের প্রজাদের অনেক হানি—নয় কি?

আমি। হাঁ, এ কথা ঠিক।

তিনি। বোধ হয়, রাজা মণিভূষণের ভূতের ভয় নাই?

আমি। খুব সম্ভব, নাই।

তিনি। আপনি নিশ্চয়ই এই রাজবংশের ভৌতিক কুকুরের গল্প শুনিয়াছেন?

আমি। হাঁ, নলিনাক্ষ বাবুর কাছে শুনিয়াছি।

তিনি বলিলেন, "এখানকার ছোটলোকমাত্রেই ইহা বিশ্বাস করে। অনেকে শপথ করিয়া বলে যে, তাহারা মাঠে এই রকম ভৌতিক কুকুর দেখিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি মৃদুহাস্য করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তিনিও যে এ কথা বিশ্বাস করেন না, তাহা নহে।

তিনি বলিলেন, "রাজা অহিভূষণ এ কথা বিশ্বাস করিতেন, আর সেইজন্যই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।"

আমি। কেমন করিয়া ?

তিনি। তিনি এই ভূতের কথা এতই বিশ্বাস করিতেন যে, কোন কুকুরকে অন্ধকারে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিত। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মৃত্যুর দিন, রাত্রে তিনি নিশ্চয়ই এই রকম কিছু দেখিয়াছিলেন। আমার সর্ব্বদাই এ ভয় ছিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের বল কিছু মাত্র ছিল না।

আমি। আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন ?

তিনি। আমার বন্ধু নলিনাক্ষ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম।

আমি। তাহা হইলে আপনি মনে করেন যে, কোন কুকুর রাজা অহিভূষণকে তাড়া করিয়াছিল, আর সেই ভয়েই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ?

তিনি। আমার ত তাহাই বোধ হয়, আপনার কি মনে হয় ?

আমি। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করি নাই।

তিনি। গোবিন্দরাম বাবু কি বলেন ?

এই কথায় আমি এতই বিস্মিত হইলাম যে, বলা যায় না। এই লোক কিরূপে জানিল যে, গোবিন্দরাম এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার লইয়াছেন, আর আমি সেইজন্য এখানে আসিয়াছি ? আমি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিলাম। কিন্তু তিনি যে আমাকে বিস্মিত করিবার জন্য হঠাৎ গোবিন্দরামের নাম করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল না।

তিনি বলিলেন, "ডাক্তার বাবু. আপনাকে চিনি না বলা বৃথা, আপনার বন্ধুর কীর্ত্তি আপনি প্রকাশ করিতেছেন, এই পাড়াগাঁয়েও তাহার দুই-একটা প্রবেশ করিয়াছে। নলিনাক্ষ বাবু আপনার নাম বলিবামাত্র আমি বলিয়া উঠিলাম, 'সেই ডাক্তার, যিনি বিখ্যাত গোবিন্দরামের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।' নলিনাক্ষ বাবুকে তখন সে কথা স্বীকার করিতে হইল। যখন আপনি এখানে আসিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, গোবিন্দরামবাবু এ

বিষয়ে হাত দিয়াছেন, সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছেন, তাহা স্বভাবতই জানিতে ইচ্ছা হয়।

আমি কহিলাম, "তিনি কি ভাবিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।"

তিনি। নিশ্চয়ই তিনি একবার এখানে আসিবেন।

আমি। এখন তিনি কলিকাতায় বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

তিনি। দুঃখের বিষয়—নিতান্ত দুঃখের বিষয়—তাঁহার মত ক্ষমতাশালী লোক একবার আসিলে বোধ হয়, অতি সহজেই এ রহস্য ভেদ হইয়া যাইত। যাহা হউক, আপনার যদি কোন সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে বলিবেন, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। যদি আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন বা কি ভাবে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমায় বলেন, তাহা হইলে আমিও বোধ হয়, আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি।

আমি। আমি কোন অনুসন্ধানে আসি নাই। রাজা মণিভূষণ নিমন্ত্রণ করায় তাঁহার সঙ্গে কেবল কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছি।

"ওঃ! নিশ্চয়ই আপনার খুব সাবধান হওয়া উচিত। যাহা হউক, কিছু মনে করিবেন না। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা আপনাকে বলিব না। আমি ভাল ভাবেই বলিয়াছিলাম।"

আমরা যেখানে আসিয়াছিলাম, সেইখান হইতে একটি ক্ষুদ্র পথ মাঠের উপর দিয়া গিয়াছে, দূর হইতে সেই পথের সীমান্তে একটা ক্ষুদ্র অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, সদানন্দ বাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেই বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ বাড়ীতে আমি থাকি, অনুগ্রহ করিয়া আমার বাড়ীতে একবার পদার্পণ করিয়া যান, বেশী দূর নয়।"

আমার প্রথম মনে হইল যে, রাজা মণিভূষণের পাশ ছাড়িয়া থাকা আর আমার উচিত নহে; কিন্তু তিনি রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছেন, সমস্ত দেখিয়া শেষ করিয়া উঠিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, এদিকে গোবিন্দরাম আমায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজার সমস্ত প্রতিবেশীকে খুব ভাল করিয়া দেখা প্রয়োজন; সদানন্দ একজন প্রতিবেশী, ইহার সম্বন্ধেও দেখা আবশ্যক, সুতরাং এই সুবিধা, ইহার বাড়ীতে কিয়ৎক্ষণের জন্য গেলে ক্ষতি কি? আমি বলিলাম, "চলুন, আপনার বাড়ী দেখিয়া আসি।"

তখন আমরা দুই জনে মাঠের ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া চলিলাম। [ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

তাঁহার বক্ষে বসাইয়া দিল। বিস্মিত, ভীত সাহাবুদ্দীন ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সম্রাটের গৃহের দিকে ছুটিয়া যাইবার প্রয়াস করিলেন। সেই সময় আদমের এক অনুচর কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল। বিস্মিত সভাসদ্‌গণ কোনও উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই আদম সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল।

বিজয়মদে মত্ত হইয়া নরঘাতক আদম খাঁ সম্রাটের মহালের দ্বারে গিয়া প্রবেশ করিতে চাহিল। আকবর তখন আপনার গৃহে বিরামদায়িনী নিদ্রা-দেবীর কৃপা উপভোগ করিতেছিলেন। প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া আদমের সহিত কলহ করিতেছিল, বাহিরে বিস্মিত সভাসদ্‌মণ্ডলী চীৎকার করিতেছিল। এই সব কোলাহলে সম্রাটের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি প্রাঙ্গনে বাহির হইয়া একজন ভৃত্যকে কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ধীর পদবিক্ষেপে তিনি আপনার মহলের অপর এক দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। সেই সময় একজন রাজভৃত্য অযাচিত ভাবে তাঁহার হস্তে একখানি তরবারি প্রদান করিল।

অপর দ্বারে যেখানে আদম প্রহরীর সহিত কলহ করিতেছিল সম্রাট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জলদগম্ভীরস্বরে আদমকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—"সারমেয়ী নন্দন (বাচ্ছা-ই-লাদাহ) কি হইতেছে।" ভীত হইয়া আদম চকিতে সম্রাটের হস্তস্থিত তরবারি খানি দুই হস্তে ধরিয়া বলিল—"জাঁহাপনা বিচার না করিয়া ভৃত্যকে শাস্তি দিবেন না।" প্রত্যুৎপন্নমতি আকবর তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত অসিখানি ছাড়িয়া দিয়া আদমের মুখে এত জোরে একটা ঘুসি মারিলেন যে হতভাগ্য নিমেষের মধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইল। সম্রাট আকবর দুইজন প্রহরীকে আজ্ঞা দিলেন—"এখনি ইহাকে বাঁধিয়া প্রাসাদের ছাদ হইতে ভূমে নিক্ষেপ কর।" রাজাজ্ঞা অবহেলা করিতে না পারিলেও নির্ব্বোধ প্রহরীগণ হস্তপদ বদ্ধ আদমখাঁকে ধীরে ধীরে ছাদ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিল। তাহাতে আদম অর্দ্ধমৃত হইল মাত্র। ক্রুদ্ধ সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় হতভাগ্যকে ফেলিবার আজ্ঞা দিলেন। এবার তাহার ঘাড় ভাঙ্গিল, মাথার খুলি ফাটিল, চিরদিনের তরে ভবধাম ছাড়িয়া আদমকে অনন্তের পথে যাত্রা করিতে হইল।

কর্ত্তব্য বিবেচনায় আদমখাঁকে হত্যা করিলেও সম্রাট অন্তঃকরণ শূন্য ছিলেন না। আদমের মাতাকে তিনি অত্যধিক শ্রদ্ধা করিতেন। আদমজননী আপনার পুত্রের নির্দ্দয় মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া একবার তাহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট অনেক সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শোকাতুরা জননী পুত্রের পথে যাত্রা করিলেন। সহৃদয় আকবর সাহ তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

—আকবরনামা।

পূর্ব্বে যুদ্ধাবসানে বিজয়ীসেনা বিজিতদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে বন্দী করিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। মহামতি আকবর আপনার রাজত্বের সপ্তমবর্ষে এ প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর এমন কি রাজদ্রোহীদিগেরও স্ত্রীপুত্রাদিকে বন্দী করিবার ক্ষমতা কাহারও রহিল না। —আকবরনামা।

সম্রাট আকবর হস্তী চালাইতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে একবার হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া তাঁহার প্রাণনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্মণ নামক একটী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ অপর একটী করী দর্শনে লক্ষ্মণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। শত চেষ্টা করিয়াও মাতঙ্গকে মাহুত সবশে রাখিতে পারিল না। শেষে এক নালার নিকট আসিয়া হস্তীর পদস্খলন হইল। সম্রাটের পশ্চাদস্থিত একজন আরোহী ভূমে নিপতিত হইল, সম্রাট হস্তীর স্কন্ধ দিয়া পিছলাইয়া পড়িলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের অনুগ্রহে লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন একগাছি রজ্জুতে তাঁহার পা বাঁধিয়া গিয়া আকবর নিম্নশির হইয়া ঝুলিতে লাগিলেন; সেই সময় কতিপয় লোক আসিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া সম্রাটকে নামাইয়া লয়। পরে লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। —তব্‌কাতে আকবরী।

৯৭২ হিঃ অব্দে আগ্রা ছাড়িয়া মালবের চম্বলনদীর তীরে সম্রাট হস্তী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। সে সময় বৃষ্টি ও বন্যায় চারিদিক মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। বীরপরাক্রম আকবর সাহ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া

আপনার প্রিয় বারণ লক্ষ্মণের পৃষ্ঠে চড়িয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিলেন। নদীর অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে না পারিয়া প্রভুভক্ত লক্ষ্মণ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে বা তাহাদিগকে বশে আনিতে আকবর সাহ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বলিখিত ইতিহাসে পিতার চরিত্র বিশ্লেষণে ইহার অনেক গুলি উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, যে সকল হস্তীকে মাহুতগণ বশে আনিতে না পারিত, বাদসাহ স্বয়ং সেগুলিকে আয়ত্তাধীন করিতেন। তিনি হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইতেন এবং অকস্মাৎ লম্ফপ্রদান করিয়া মত্তমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেন মন্ত্রবলে হস্তীটা তাঁহার বাধ্য হইত। অনেক সময় এক উচ্চ প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া আকবর হস্তীর প্রতীক্ষা করিতেন এবং সেই স্থল দিয়া মত্ত হস্তী ধাবিত হইলে তিনি তাহার উপর লাফাইয়া তাহাকে বশে আনিতেন। তব্‌কাতে আকবরীতে বর্ণিত হইয়াছে যে মালবের যুদ্ধের সময় নারবারের নিকট যাইবার সময় হঠাৎ পথি মধ্যে এক ভীষণ শার্দ্দূল বাদসাহের নয়নগোচর হয়। কোন প্রকার বিচলিত না হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে এক মাত্র অসি হস্তে তিনি ব্যাঘ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজ বাসভূমে সহসা এক মানবকে পাইয়া পশুটা বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। সম্রাট অমনি অসির আঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন।

আকবর সাহের অপর একটি বিক্রমের কথা এইস্থলে বর্ণনা করিব। তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে তিনি মথুরার নিকটবর্ত্তীস্থলে শীকার করিতেছিলেন। কোকা ফুলাদ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। সম্রাট শীকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন দিল্লীর বাজার দিয়া গমন করিতেছিলেন তখন এক মাদ্রাসার নিকট হইতে হতভাগ্য ফুলাদ তাঁহার প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে তীরটি তাঁহার শরীরে সামান্যই প্রবেশ করিয়াছিল। সুলতানের অনুচরবর্গ তখনই ফুলাদকে যমপুরে পাঠাইয়াছিল। সম্রাট কিন্তু ধীর অবিচলিত ভাবে স্বহস্তে তীরটা আপনার গাত্র হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইলেন এবং অশ্বারোহণ করিয়া দিল্লীর

প্রাসাদ অবধি গমন করিলেন। এ ঘটনাটি তবকাতে আকবরী ও আকবরনামা প্রভৃতি সকল ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৭০ খৃঃ অব্দে সম্রাট আজমীর যাত্রা করেন। আজমীর হইতে অযোধ্যায় গমন করিবার সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে রাজপুতানার মরুভূমে গোরখর নামক বন্য গর্দ্দভ পাওয়া যায়। শীকারনিপুণ বাদসাহ গর্দ্দভ মারিবার বাসনা করিলেন। সমস্ত অনুচরবর্গকে পশ্চাতে রাখিয়া মাত্র চারিটি বেলুচি পথ প্রদর্শক লইয়া তিনি গর্দ্দভ শীকারে যাত্রা করিলেন। চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি একদল গোরখর দেখিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি একটি গর্দ্দভের উপর গুলি করিলেন। সেটি মরিল বটে, কিন্তু গাধারপাল ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। সুলতান কিন্তু এ নূতন শীকার একটি মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। সুতরাং সেই মরুভূমিতে তিনি ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ ক্রোশ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া দিবা-শেষে তিনি মাত্র ষোলটি রাসভ বধ করিয়া শিবিরে ফিরিলেন। তখন তাঁহার অনুচরবর্গ সেই শীকার গুলিকে খুঁজিয়া লইয়া শিবিরে উপস্থিত করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞায় সেই মাংস তাঁহার আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে বিতরিত হইল এবং বলা বাহুল্য, সম্রাট দত্ত মাংস তাঁহারা অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভূতের দান।

(১)

উষাকে তাড়াতাড়ি উঠিতে দেখিয়া বলিলাম—কি হ'ল ?

পলায়নতৎপর ভগ্নী বলিল—হেমবাবু আসছেন। গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম একটা বন্দুক হস্তে হেমচন্দ্র ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরস্থিত "মেঘনাদ বধ কাব্য" তুলিয়া লইয়া উচ্চৈস্বরে পড়িতে লাগিলাম—

"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু—

গৃহে প্রবেশ করিয়া হেম বলিল—বিদ্যে জানা আছে, পামো খবর আছে।

আমি তাহার প্রতি না চাহিয়া পাতা উল্‌টাইয়া পড়িতে লাগিলাম—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত। অমরবৃন্দ—

এবার হেম পুস্তকখানা কাড়িয়া লইল। আমি তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলাম -আরে কেও ? হেম নাকি ?

হেম বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন রঙ্গ রাখো। গোটাকতক বাক্‌সট্ পোরা টোটা আছে ?"

আমি বলিলাম—তবে ঠিক পাতাটাই উল্টেছিলেম। বীরধর্ম্মটা পালন হ'বে কি মেরে ? শেয়াল না হাড়গিল ?

গম্ভীরভাবে হেম বলিল—ভূত।

"ছিঃ ছিঃ স্বজাতি মারা মহাপাপ। মাইকেল বলেছেন—

রিপুদলবলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় ; শতধিক তারে।

কিন্তু স্বজাতি বধ মহাপাপ।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে হেমচন্দ্র বলিল—আর কবিতা আওড়াও তো পালাব।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কেন হঠাৎ বাক্‌সট্ কি হ'বে ?

হেম বলিল—ভূত মারতে হবে।

হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া এবং তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বাস্তবিক আমার আশঙ্কা হইল। দেখিলাম তাহার বাসগৃহ সম্বন্ধে জনশ্রুতির একটা ভিত্তি আছে। সে বয়সে আমাপেক্ষা তিন চারি বৎসরের ছোট হইলেও বলে ও সাহসে হেম আমাদিগকে কলেজে হারাইত। অকস্মাৎ তাহার পত্র পাইয়া আমি তাহার জন্য নদীর ধারের বাংলাটা ভাড়া করিয়াছিলাম। সহরে প্রবাদ ছিল, বাংলাটায় ভূতের উপদ্রব আছে। সুতরাং তাহা প্রায় জনশূন্য

হইয়া পড়িয়া থাকিত। আমি জানিতাম বলিষ্ঠ হেমচন্দ্র ভূতের ভয়ে অমন সুন্দর বাসভবনটি লইতে অস্বীকৃত হইবে না। আজ তাহারও শুষ্ক মুখ দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আসল ব্যাপারটা কি?

হেম বলিল—সে কথা কাল বলিব। আজ গোটাকতক টোটা তো দাও।

আমি জানি সে চিরকালই একরোকা। সুতরাং তর্ক নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া তাহাকে টোটার পেটিটা দিলাম। নিঃশব্দে কতকগুলা টোটা বাছিয়া লইয়া একটু হাসিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেল। দেখিলাম তাহার হাসিটা বিলক্ষণ চেষ্টা-প্রসূত।

হেম চলিয়া গেলে লীলা ও উষা আসিয়া উপস্থিত হইল।

লীলা বলিল—ওগো ঠাকুরঝির জন্যে আর ভাবতে হবে না।

একটা কিছু উৎকট রসিকতার আভাস পাইয়া উষা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমি স্ত্রীকে বলিলাম—ছিঃ লীলা! উষা তো আর বালিকা নয়। এখন ওর সামনে আর রসিকতাটা নাই কর্‌লে।

একটু অভিমানের সুরে লীলা বলিল—আমার কি দোষ? হেমবাবুর বিপদে তো বেচারার হৃদয় কেঁদে উঠেছে। আমাকে বল্‌লে—বৌদি দাদাকে বল ওঁকে ওবাড়ি ছেড়ে আজই আমাদের বাড়িতে চলে আস্‌তে।

আমি বলিলাম—মন্দ কি বলেছে? একেলা ওবাড়িতে থাকাটা কি ঠিক?

লীলা বলিল—ওটা প্রেমের লক্ষণ। তুমি একবার হেমবাবুকে ব'লে দেখ উনি উষাকে বিয়ে কর্ত্তে ঠিক রাজি হবেন।

আমি হাসিলাম। স্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিলাম—"এখন বেচারাকে ভূতে পেয়েছে তা'র উপায় গেল—বিয়ের কথা।

স্ত্রী বলিলেন—বীরত্বের তো কবিতা আওড়াচ্ছিলে। তাঁর কাছে গিয়ে রাত্রে থাকগে না।

আমার স্ত্রীর কথামত কার্য্য করা উপস্থিত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইলেও ভূত প্রেতের নামে প্রাণটা কেমন শিহরিয়া উঠিল। যাহা হউক, একটা কিছু করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাকে রাত্রে নিজের বাসায় থাকিতে অনুরোধ করিতে গেলাম। চারিদিন পরে সবরেজিষ্টারের বাংলাটা খালি হইলে সে সেখানে উঠিয়া যাইতে পারিবে।

(২)

পরদিন প্রভাতে যখন হেমচন্দ্র আসিল তখন তাহার মুখ দেখিয়া বাস্তবিক

আমার ভয় হইল। যে ভয়ের কারণ বলিষ্ঠ সাহসী হেমচন্দ্রকে ঐরূপ অবস্থায় আনিয়াছে তাহা যে আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইত তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার ওষ্ঠ দুইখানি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল আর তাহার চক্ষু দুটি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমি স্নেহভরে বলিলাম—দেখ ভাই আমরা সবাই জানি তুমি মস্ত বীর, কলেজে তোমার মত সাহসী কেহ ছিল না। বন্দুকে তোমার লক্ষ্য অসাধারণ, তবে কেন মিছে ভূতের সঙ্গে লড়াই ক'রে শরীর নষ্ট কর ভাই।

হেম বলিল—না। প্রাণ যায় সেও ভালো এর শেষটা দেখতে হবে।

দেখিলাম তাঁ'র স্বরে তেমন দৃঢ়তা নাই, একটু জোর করিয়া অনুরোধ করিলে এখনও মন বদলাইতে পারে। কিন্তু কথায় সে ভুলিল না।

আমি বলিলাম—কি রকম দেখ বল দেখি।

হেম বলিল—শব্দ গুলা কিছু না। মানুষে করে। মড়ার মাথাটাই একটু বেশী রকম চালাকি।

আমি বলিলাম—কি রকম?

হেম বলিল—পরশু রাত্রি ১১টা ১২টার সময় বাহিরের বারান্দায় খুব একটা শব্দ হইল। আমার মাত্র ঘুমটুকু আসিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি কবাট খুলিলাম, বারান্দায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর আলো হাতে লইয়া বাহিরে আসিলাম। শব্দটা থামিয়াছিল, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কেবল তেঁতুলগাছের সম্মুখে ভূমি হইতে ৪ ফুট উচ্চে দেখিলাম অন্ধকারের মধ্যে সাদা ধপ্‌ধপে একটা মড়ার মাথার কঙ্কালটি ঝুলিতেছে।

আমার হৃদপিণ্ডটা জোরে স্পন্দিত হইল। যেখানে সম্মুখের জানালার ফাঁক দিয়া লীলা ও উষা গল্প শুনিতেছিল সেখানে চাহিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছিলাম তাহারাও খুব ভীত হইয়াছিল।

হেম বলিল—আমি যেমনি সেই অপার্থিব বস্তুটার দিকে অগ্রসর হ'লেম অমনি সে'টা অদৃশ্য হ'ল। তারপর পুনরায় সেদিকে চাহিয়া দেখি মুণ্ডটা মুখব্যাদান করিয়াছে। আমি সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলাম, মুণ্ডটা মুখ নাড়িতে লাগিল। তাহার দন্তের শব্দ আমার কানে পৌঁছিল। মুণ্ডটাও পশ্চাতে সরিতে লাগিল। শেষে সেটা অদৃশ্য হইল। সত্য কথা বলিতে কি কেমন একটা ভয় আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল। আমি তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া বন্দুকটা লইয়া আবার বাহির হইলাম কিন্তু আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। সে দিন সমস্ত রাত ঘুমাই নাই।

আমি বলিলাম—তোমার চাকরগুলো কোথা ছিল?

"তারা তো পিছনে থাকে। সে দিন আর তাদের তুলিনি। কাল তাদের বারান্দায় শুইয়ে রেখেছিলাম। তাদের চিৎকারে বাহির হ'য়েই একেবারে মড়ার মাথার উপর গুলি ক'রলাম। অমনি মাথাটা অদৃশ্য হ'য়ে অপর দিকে নাচিতে লাগিল। আবার সেদিকে গুলি করিলাম। অমনি ক্ষণিক অদৃশ্য হয়ে অপর দিকে চলিল। এই রকমে বারোটি টোটা নষ্ট করিলাম। শেষে চাকরটা মূর্চ্ছা গেল। অনেক সেবা ক'রে তাকে বাঁচালাম। আজ ভোরে রাঁধুনিও পালিয়েছে। এখন গৃহে গিয়া স্বপাক না করিলে তো আর আহার হবে না।"

আমি বলিলাম—স্বপাক আর করতে হবে না। আজ থেকে এইখানে থাকো। তারপর যা হয় ক'রো।

বলা বাহুল্য বাসা ছাড়িতে হেমচন্দ্র সম্মত হইল না। তবে সে দু'বেলা আমার নিকট আহার করিতে সম্মত হইল।

(৩)

তাহার চারি দিন পরে প্রাতঃকালে আমার বাংলার বারান্দায় বসিয়া হেমের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সেদিন রবিবার, সুতরাং অফিসের তাড়া ছিল না। ভূত সম্বন্ধে যাহা যাহা পাঠ করিয়াছিলাম ও জানিতাম তাহা বন্ধুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সে কিন্তু আমার একটা যুক্তিও গ্রাহ্য করিল না।

আমি বলিলাম—চুলোয় যাক্। ও কথায় কাজ নেই। একটা কাজের কথা বলব শুনবে?

হেমচন্দ্র একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল—কি?

"বিয়ে কর্‌বে?"

"অবশ্য।"

"কবে কর্‌বে?"

"জুটলেই করি। বেটা ভূত যদি একটা জুটিয়ে দেয় তো বুঝি আইবুড় নামটা খণ্ডাল।"

"না, তামাসা নয়।"

হেমচন্দ্র ঘৃণার স্বরে বলিল—পাগল নাকি? তারপর তোমার মত একটা কুসংস্কারযুক্ত কুনো লোক হ'য়ে পড়ি। তোমার আগে বরং স্পিরিট্ ছিল। এখন একেবারে কাপুরুষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

আমি বলিলাম—অকৃতজ্ঞ, আমার স্ত্রী ছিল ব'লে 'স্বপাকে'র হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ, আবার স্ত্রীর নিন্দা।

সকল অনূঢ় যুবকের মত হেমচন্দ্রের স্ত্রীলোকের প্রতি বাচনিক শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল। সুতরাং নানা প্রকার মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিল—ওঃ তা ঠিক। আমি তাঁর নিকট অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। সে তো ঠিক। স্ত্রীলোকের মত যত্ন কি কেহ করিতে পারে?

আমি বলিলাম—তবে কেন একটি যত্ন করিবার পাত্রী বিবাহ করনা?

হেম বলিল—কি জান ভাই আমরা লড়ায়ে লোক, ওসব নরম প্রবৃত্তি আমাদের নাই।

ঠিক সেই সময় আমাদের সহরের দুইজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই সুশিক্ষিত সুতরাং তাঁহারা ভূত সম্বন্ধে আমাদিগের সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিলেন।

হেম হাসিয়া বলিল—মশায়, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। চলুন আজ আমার সঙ্গে রাত্রি বাস করুন তা'র পর থিওরি খাটাবেন।

অনুকূলবাবু বলিলেন—যদি সকলে যান তো আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার জনকতক হিন্দুস্থানী বাধ্য লোক আছে, বলেন তো তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাই।

অপর ভদ্রলোকটিও রাজি হইলেন। সুতরাং তাহাদের সহিত আমাদেরও সম্মত হইতে হইল।

আহারান্তে হেম বাড়ি চলিয়া গেল। আমি গৃহে শুইয়া একখানা থিও-জফির ভূতের বহি পড়িবার উপক্রম করিতেছিলাম এমন সময় স্ত্রী ও ভগ্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্ত্রী বলিলেন—আমরাও ভূত দেখিতে যাইব। ওঁর বাসার ছোট ঘরটায় আমরা থাকিব।

আমি বলিলাম—আর অত সাহসে কাজ নাই।

ঊষা বলিল—না দাদা আমরা একেলা এবাড়ীতে থাকিতে পারিব না। আর যতদূর বোঝা গেছে ভূতটা কা'রও কোনও অনিষ্ট করে না। কেবল বাজি দেখাইয়া পালায়।

আমি প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া বলিলাম—সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট। ওকেও ক্ষেপিয়েছ?

ভ্রুকুটি করিয়া লীলা বলিল—আজ্ঞে না। উনিই বীরাঙ্গনা। উনিই আমাকে সাহস দিয়াছেন।

যাহা চিরকাল সর্ব্বদেশে সকলের পক্ষে হইয়া থাকে এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল না। স্ত্রী জয়ী হইলেন। মনে করিলে অবশ্য আমিই জয়ী হইতে পারিতাম। তবে দুর্ব্বলের নিকট বল প্রকাশ করিয়া জয়ী হইয়া লাভ কি?

(৪)

তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর। আমরা চারিজনে মধ্যের হলে শুইয়া গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পার্শ্বের ছোট ঘরে লীলা ও উষা একটি পরিচারিকা লইয়া ঘুমাইতেছিল। বাহিরের বারান্দায় অনুকূল বাবু ‘ানীত হিন্দুস্থানী পালোয়ানগুলা শুইয়াছিল। বাংলার সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আলোক ছিল।

হঠাৎ একটা বিকট অট্টহাস্য আমাদিগের ঘুম ভাঙ্গাইল। বাহিরের হিন্দুস্থানী গুলি ‘রাম রাম’ করিতে করিতে আমাদিগের দরজা ঠেলিল। আমরা চকিতে উঠিয়া পড়িলাম। মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা অনুমেয়।

আমি ছুটিয়া স্ত্রীলোকদের গৃহে গেলাম। তাহারা তখন জানালা দিয়া সবিস্ময়ে মাঠের দিকে দেখিতেছে। সর্ব্বনাশ! হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক। একটা নরমুণ্ডের কঙ্কাল নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া শূন্যে নাচিতেছিল।

আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—উষা তোরা ভয় পেয়েছিস্?

উষা শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—না।

লীলা কথা কহিতে পারিল না। কেবল আমার হাত ধরিয়া আমাকে বাহিরে যাইতে নিরস্ত করিল।

গুড়ুম করিয়া একটি বন্দুকের শব্দ কাণে আসিল। নিমেষ মধ্যে কঙ্কালটা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখনই আবার ঠিক সেই স্থলে একটা হস্তপদবিশিষ্ট সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল বৃক্ষ স্কন্দে ঝুলিতে লাগিল। হেমচন্দ্র আবার গুলি করিলেন। এবার নরকঙ্কালটা অদৃশ্য হইল না। বোধ হয় সট্‌গুলা তা’র শরীর মধ্য দিয়া পশ্চাতে পড়িল।

বাহিরে অনুকূল বাবু বলিলেন—হেমবাবু স্থির হ’ন। গুলিতো রোজই মারচেন। আজ চলুন মশাল নিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের কাছে এগিয়ে যাই।

একজন পালোয়ান বলিলেন—বাবু অমন কাজ করিবেন না। ওসব বাবার চেলা। ওঁদের কাছে গেলে অপরাধ হয়।

এইরূপে আমাদিগের উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। এদিকে নরকঙ্কালটা অতি বিকটভাবে নানা প্রকার ভাবভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে নাচের কি ভঙ্গি! কখনও তাহার সাদা রক্তমাংসহীন অস্থিপদ দুইটি ঘুরিয়া মাথায় উঠিল, কখনও সেই পৈশাচিক হস্ত দুটিতে ভূতমহাশয় তালি দিয়া এক পৈশাচিক খট্ খট্ শব্দ করিতে লাগিল। আবার মধ্যে মধ্যে পদ দুটাকে উপরে তুলিয়া নিম্নশির হইয়াই নরকঙ্কাল নাচিতে লাগিল।

হেম বলিল—এ আজ আবার বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, কেহ না যায় তো আমি যাইব।

হেমচন্দ্র মশাল হস্তে ছুটিল। দুই একজন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার অনুসরণ করিল।

উষা অতি কাতরস্বরে আমার হাত ধরিয়া বলিল—দাদা মানা কর।

লীলা বলিল—হাঁ।

হেমকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কিন্তু নরকঙ্কাল অন্তর্ধ্যান করিল। দেখিলাম উষার একটু সাহস হইল। আমারও একটা হৃদয়ের বোঝা নামিয়া গেল। ভাবিলাম অন্ততঃ ভূতটার ভদ্রতা আছে।

ঠিক যেমন হেম প্রভৃতি আলো লইয়া তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল অমনি তাহাদের সম্মুখে মাঠের অপরদিকে এবার দুইটি কঙ্কাল বাহির হইল। আবার তাহারা সেদিকে ছুটিল। কঙ্কাল দুইটা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনুকূল বাবু বলিলেন—আর ছুটিয়া কি হইবে?

সকলে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় বসিল। তখন সকলেরই সাহস আসিয়াছিল। প্রত্যেকে নানা প্রকার কথা বলিতেছিল। আমার গৃহেও এবার কথাবার্ত্তা চলিল। লীলা আমার স্কন্ধে ভর দিয়া বলিল—"ব্যাপারটা কি?"

লীলার সোহাগে লজ্জিত হইলাম। বুঝিলাম ভয়ে বিস্ময়ে সে উষার অস্তিত্বটা ভুলিয়া গিয়াছে।

উষা বলিল—অতি সহজ।

লীলার চমক ভাঙ্গিল। সে আমায় ছাড়িয়া দিয়া বলিল—কিসে সহজ উষারাণী?

উষা বলিল—অন্ততঃ লোকের প্রাণহানির ভয় নাই। তাহা ভিন্ন ভূতের যাহা ইচ্ছা করুক না।

বাহিরে হেমবাবু বলিল—এ আবার কি?

ঠিক আমাদের সম্মুখে মাঠের মাঝে একখানা সাদা কাপড় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। ক্রমে কাপড়খানা চলিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে চলিয়া কাপড়খানা নদীর ধারে চলিল। তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেল।

উষার চিবুক ধরিয়া লীলা বলিল—কি ঠাকুরঝি ব্যাপারটা সহজ, নয়?

উষা বলিল—নিশ্চয়।

পরদিন প্রাতঃকালে তদন্ত করিতে করিতে তেঁতুলগাছের তলায় একখণ্ড ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ের টুকরা পাওয়া গেল। হেম বলিল—বেটা দাতা ভূত আবার দান ক'রে গেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

মহা-মিলন। *

(১)

এ কিবা সুষুপ্তি পিতঃ! জাগিবে না আর?
শুনিবনা ও মুখের ভাষা চিরতরে?
আর না হেরিব দেব মুরতি তোমার,
"মা" বলিয়া ডাকিবে না পুনঃ স্নেহভরে?
এ কিবা বিধির বাদ কোন্ মহা পাপে
হারা'নু তোমারে মোরা কার অভিশাপে?

(২)

কল্পনা করিনি কভু এক বিন্দু সুখ
জগতে থাকিতে পারে, যদি নাহি রহে
হরষে ফুটিয়া হেথা তব স্মিতমুখ—
যদিও প্রেমের নদী জগতে না বহে।
হেরেছি খুঁজিয়া প্রভু সৃতির ভাণ্ডার,
তোমার স্নেহের মত সুখ কোথা আর?

(৩)

সে স্নেহ-নির্ঝর স্নিগ্ধ পবিত্র অমল
অকালে রোধিয়া দেব কোন্ মহাপথে,
উপেক্ষিয়া অভাগীর দীন আঁখিজল
চলিছ ত্রিদিবধামে চড়ি দিব্যরথে?
না, না, পিতঃ, কাঁদিব না। নিরানন্দ ধরা
উপযুক্ত নহে তব—শুধু শোকে ভরা।

(৪)

স্বরগ দুয়ারে ল'য়ে রতন-সম্ভার—
নন্দনের ফুলে ডালি সাজায়ে উল্লাসে

---

* লেখিকার পিতা রায় চারুকৃষ্ণ মজুমদার বাহাদুর গত ২৭শে আশ্বিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। এই কবিতাটি তাঁহার স্মৃতিতে লিখিত। মজুমদার মহাশয় আমাদিগের বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতীব দুঃখিত। লেখিকাকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।—সম্পাদক।

দাঁড়ায়ে জননী মোর—করে ফুলহার—
বহুদিন পরে তোমা' পূজিবার আশে।
আঁখি জলে রোধিতেছি এ মহা-মিলন?
করহ আশীষ, পিতঃ, দৃঢ় করি মন।

শ্রীমতী ধরিত্রী দেবী।

কল্পনার প্রতি।

জীবনের আদি অঙ্কে সৌন্দর্য্যশালিনি!
হয়েছিল কয়দিন তব সনে দেখা—
অজানা প্রদেশ হতে কিরণ অঙ্গিনী—
নীল নভতলে যথা ছায়াপথ রেখা—
শ্যামল হৃদয়কুঞ্জে কুসুম কামিনী—
খেলিল সুরভি বায়ে প্রজাপতি পাখা
কত আলো, কত গান, কত না কাহিনী
হাসিয়া দেখালে তুমি কত সুখ লেখা!
আজি সে স্বপন অন্তে পরিশ্রান্ত মন
কত দূরে যেতে হবে ভাবি অবিরাম,—
কঠোর কর্ত্তব্য সনে নিরবধি রণ—
কোথায় বিরতি এর কোথা পরিণাম!
তারি মাঝে মনে পড়ে সেই তব কথা—
জীবনের সাথী মম সুখময় ব্যথা!

শ্রীউমাচরণ ধর।

বর্ষাগমে।

গগন ঘিরিয়া লয়ে মেঘরাজি,
আবার এসেছে বরষা।
ঝর ঝর ঝরে বাদলধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
ছোটে ভরা নদী আপনা হারা,
হরষে মেদিনী সরসা।
গগনে ঘিরিয়া নীল মেঘরাজি,
আবার এসেছে বরষা

নব জলদের কোলে গরজিয়া
দামিনী ফিরিছে খেলায়ে।
কাহারে দেখিতে প্রাণ তার চায়
তাই যেন ভাঙি শতেক ধাধায়,
নিমেষের তরে নেহারি তাহায়,
চকিতে যেতেছে মিলায়ে।
গুরু গুরু গুরু বিফল আবেগে
গরজি ফিরিছে খেলায়ে।
বনে বনে কত কদম্ব কেতকী
পুলকে উঠেছে ফুটিয়া।
সুবাসে তাহার অধীর পবন,
করে ছুটাছুটি হইয়ে মগন,
কাঁপায়ে দুলায়ে বকুলের বন,
যেন গো ফিরিছে লুটিয়া।
ডালে ডালে কত কদম্ব কেতকী
পুলকে উঠেছে ফুটিয়া॥
রবি শশধর নীবিড় নীরদে
বিলীন আজিকে হয়েছে।
কুলায় সিক্ত বিহঙ্গম ম্লান,
ভুলে তারা বুঝি গে'ছে কলগান,
শুধু বারি পানে চাতকের প্রাণ
পুলকিত হ'য়ে রয়েছে।
রবি শশী তারা সুনীল নীরদে,
বিলীন আজিকে হয়েছে।
ইন্দ্রধনু সম কলাপ বিথারি
কাননে ময়ুর নাচেরে।
নব বারিদের আগম দেখিয়া,
শিখিনী মণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া,
আকুল পরাণে আকাশে চাহিয়া,
কেকারবে কারে যাচেরে।
ইন্দ্রধনু নিভ কলাপ বিথারি
কাননে ময়ুর নাচেরে॥

শ্রীমতী অনুজা ঘোষ।

৩৪।২ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

৫ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। [১০ম সংখ্যা।

November 1908.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট আফিস হইতে শ্রী[illegible] রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ভিঃ পিঃ মাশুল লাগে না।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল সহযোগী ও শিষ্যমণ্ডলীর যশঃ সৌরভে বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন এখনও সৌরভময়; তাঁহাদিগের অনেককেই একে একে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে সেই অজ্ঞাত অসীম রহস্যের দেশে লইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট বশতঃ, বঙ্কিমের অন্যতম শিষ্য শ্রীশচন্দ্রও আজি সেই পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহার অকাল বিয়োগে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। সেই ক্ষতি অনুভব করিয়াই বাঙ্গালী আজি দুঃখিত। গবর্ণমেণ্টের একজন সুদক্ষ ডেপুটির অভাব হইল ভাবিয়া, বোধ করি, তাহারা ব্যথিত নহে।

সাহিত্যকীর্ত্তিই বাঙ্গালায় শ্রীশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিবে। উপন্যাস প্রণয়নে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। যাঁহাদিগের কৃপায় বঙ্গীয় উপন্যাস-ভাণ্ডার শ্রীসম্পন্ন, শ্রীশচন্দ্রও যে তাঁহাদিগেরই অন্যতম, একথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার সকল উপন্যাসই সুখদ, সুপাঠ্য ও সুরুচিসঙ্গত। কিন্তু তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। এমন উপন্যাসও তাঁহার আছে, যাহাতে অসামান্য প্রতিভাজ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ স্বরূপ আমরা এস্থলে তাঁহার রচিত 'ফুলজানি' উপন্যাস-কাব্যের নাম করিতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই 'ফুলজানি' গ্রন্থ অন্যান্য সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে সক্ষম; এই কথায়, হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, ওজনের মাত্রা বাড়াইয়া অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে over estimate বলে,—আমরা তাহাই করিতেছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বাপর সম্যক আলোচনা করিবার যাহার ক্ষমতা আছে, তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের অনুমান অমূলক নহে।

স্বীকার করি, ইংরাজী উপন্যাস-ভাণ্ডারের মত বঙ্গীয় উপন্যাস-ভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত রত্নে পরিপূর্ণ নহে। স্বীকার করি, ইংরাজী উপন্যাস-ভাণ্ডারে যেমন যে দরের রত্ন খুঁজিবে, ঠিক তাহাই মিলিবে; আমাদের উপন্যাস-ভাণ্ডারে

তেমনটি পাইবে না। কিন্তু তা'বলিয়া আমাদের উপন্যাস-ভাণ্ডারে কোহিনুরের অভাব নাই। হইতে পারে, কোহিনুরের সংখ্যা অল্প। হইতে পারে, কোহিনুর ব্যতীত অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহার অধিকাংশই ঝুঁটো; কিন্তু যে সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব, সে সাহিত্যে যে কোহিনুরের অভাব হইতেই পারে না, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতে পারি। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বঙ্কিমের রত্ন কয়টী ছাড়া, অবশিষ্ট সকলগুলিই কি তবে ঝুঁটো? তাহা নহে। অধিকাংশ তাহাই বটে; কিন্তু সকলগুলি নহে। কয়েক-খানি এমন রত্নও আছে, যাহা কোহিনুরের সমকক্ষ না হইতে পারে; কিন্তু সেগুলি যে বহুমূল্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীশচন্দ্রের 'ফুলজানি' ও 'শক্তি-কানন' প্রভৃতিকে এই 'বহুমূল্য রত্নের' অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বিশ্বাস করি।

একখানি উত্তম উপন্যাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ শক্তির উপর আধিপত্য থাকা চাই। "কেবল কল্পনা নহে, রসিকতা; কেবল রসিকতা নহে, পাণ্ডিত্য;—কেবল পাণ্ডিত্য নহে, রুচি;—কেবল রুচি নহে, সুবিচার শক্তি, সূক্ষ্মদর্শন ও দূরদর্শন, মানব প্রকৃতিতে গভীর জ্ঞান,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী প্রবৃত্তির প্রতি সমান সহানুভূতি;—ভাস্কর যেমন প্রস্তরে অবয়ব নির্ম্মাণ করেন; নবেলিষ্ট তেমনি শূন্য সেঁকিয়া চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি শক্তি কি সাধারণ? আর এই শক্তি দ্বারা সৃষ্ট পদার্থকে সজীব, সমুজ্জল ও দেদীপ্যমান করিতে ভাষার উপর কতই না সূক্ষ্ম ও অসীম অধিকারের আবশ্যক। এতগুলি বিভিন্ন শক্তি ও এতাধিক পরিমাণে প্রতিভা একাধারে একত্রিত হইলেই তবে একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস উৎপন্ন হয়।" সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, শ্রীশচন্দ্রে প্রায় এই সমস্ত শক্তিরই সমাবেশ ছিল। এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ,—তাঁহার রচিত 'ফুলজানি'। 'ফুলজানি'তে উপন্যাসোচিত সমস্ত গুণই বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণীর কাব্যে যেমন একটি ক্রমবিকাশ থাকে, স্বভাব সৃষ্টির ন্যায় তাহা যেমন ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়; 'ফুলজানি'তেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

'ফুলজানি' বাঙ্গালীর স্মৃতির তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। ইহাতে আমাদের অতীত জীবনের যে সুন্দর 'ফটোগ্রাফ' আছে, সেরূপ সুন্দর ফটোগ্রাফ আর কোন 'ক্যামেরায়' উঠিয়াছে বলিয়াত আমাদের মনে হয় না। সেকেলে বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর চিত্র, সেকেলে সধবা ও বিধবা

গৃহিণীর চিত্র, সেকেলে কর্ত্তার চিত্র, এ সমস্ত চিত্রই এই চিত্রপট খানিতে সুন্দর ও পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহা পড়িবার সময় মনে হয়, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যেন একখণ্ড ইতিহাস পড়িতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীশচন্দ্রের চরিত্রাভিজ্ঞান অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার পুরন্দর, ফুলকুমারী, কালী প্রভৃতি সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন এক একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ। ফুলকুমারী ও কালী, এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র তিনি যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সহজসাধ্য নহে। 'একে অপরাজিতা লতা, অন্যে লজ্জাবতী, বাতাসে কেহ নাচিয়া উঠে, কেহ মুদিয়া যায়।' এই লজ্জাবতী ফুলকুমারী এবং অপরাজিতা কালীর শোভায় সমগ্র 'ফুলজানি' কাব্য গ্রন্থখানি শোভান্বিত। পুরন্দর-চরিত্র-বিশ্লেষণও সবিশেষ প্রশংসনীয়। বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত একই ব্যক্তির চরিত্র ঘটনার পারম্পর্য্যে কিরূপে ক্রমবিকশিত হয়, তাহা আমরা পুরন্দর চরিত্রে পরিষ্কার দেখিতে পাই।

এ সংসারে কতই ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে, তাহার কোন ঘটনাটি কেহ বর্ণন করিলে হয়ত প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও যেন প্রকৃত বোধ হয়। এইরূপ বর্ণন শক্তি সঞ্জীবচন্দ্রের অসাধারণ ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার একজন অনুকারী শিষ্য দেখিতে পাই। তিনি শ্রীশচন্দ্র। এই শক্তি শ্রীশচন্দ্রের প্রভূত পরিমাণে ছিল। উল্লেখ স্বরূপ আমরা 'ফুলজানি'র প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম করিতে পারি। সেই পাঠশালার চিত্র, সেই বালক বালিকার খেলাধূলার চিত্র, তাঁহার তুলিকাসম্পাতে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেরূপ পরিস্ফুট চিত্র সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসাবলী ব্যতীত বড় একটা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ, বাঙ্গলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে।"

তবে সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে একটা দোষ লক্ষিত হয় যে তাহার অনেকস্থলে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে ভেদ নাই। স্থানে স্থানে সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে। বোধ করি, সেই জন্যই তাঁহার উপন্যাসাবলী বঙ্গীয় পাঠক সমাজে তেমন আদৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসে এই দোষ বড় একটা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার উপন্যাসগুলি স্বাভাবিক ও সঙ্গত চিত্রে পরিপূর্ণ। তাহার সর্ব্বত্রই স্নিগ্ধ সংযমের ছায়াপাত পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার চিত্রিত চরিত্র-

গুলি দেবতাও নহে, দানবও নহে,—মানব। তিনি বাস্তব চিত্রেরই কিছু পক্ষপাতী।

শ্রীশচন্দ্রের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল,—তাহা তাঁহার ভাষা। বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা যেমন মোহমন্ত্র বিশেষ; শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাও অনেকটা তদ্রূপ। যাঁহারা বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রায়শঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তাঁহার ভাষা অনেকটা বঙ্কিমী ছাঁচের;—বড় সুমিষ্ট, বড় চিত্তগ্রাহী, অতি সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

তাই বলিতেছিলাম, শ্রীশচন্দ্রের সমকক্ষ ঔপন্যাসিক বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। তাই আজি তাঁহার অভাবে তাঁহার ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননের একটি সুগন্ধ 'ফুল শুকাইল।'

বলা বাহুল্য, শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর বিস্তারিত সমালোচনা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজি তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য সমালোচনচ্ছলে পাঠক সমীপে তাঁহার বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

দরিয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যখন সুরেন্দ্রনাথ হুমায়ন ও তর্খানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে গঙ্গায় নিপতিত হইয়া বিমলার নৌকায় আনীত হইলেন এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিমলাকে চিনিতে না পারিয়া বিমলার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই উপকারসাধনের জন্য কি কার্য্য করিলে তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইতে পারে তাহাও জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন বিমলা "অনেকক্ষণ" উত্তর দেন নাই, ইহাতে কি আমরা বুঝিতে পারি না যে তখন বিমলার হৃদয় আপনা আপনিই আঘাত পাইয়াছিল, তখন বিমলার মনে হইয়াছিল, "আমিও তো ইহাকে দেখিয়াছি, কই, ইহাকে তো ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু ইনি ইহারই মধ্যে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, ধিক্ আমাকে, আমার এ নারীহৃদয়ে ধিক!"

রমেশচন্দ্র স্বয়ং বিমলাকে একস্থলে "মানিনী" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, এবং আমরাও কেবলমাত্র এই ঘটনাটীর দ্বারাই বিমলাকে "মানিনী" বলিয়া চিনিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথ যখন বিমলাকে কোনওরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে বার বার অনুরোধ করিলেন, তখন বিমলা হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছিল, তখন তাহার—

"হিয়ার ভিতরে লুটায়ে লুটায়ে কাতরে পরাণ কাঁদে।"

তখন সে সুরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিতে কেবলমাত্র এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে সে পুরস্কারের লোভে বা প্রত্যুপকারের আশায় তাঁহার প্রাণরক্ষা করে নাই, সে দয়াপরবশ হইয়া, সুরেন্দ্রনাথের প্রেমে ব্যাকুলা হইয়াই ঐরূপ করিয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন সে কথা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না, তখন বিমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সজল নয়নে স্বীয় পিতার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিল। বিমলার হৃদয় জানিত যে সুরেন্দ্রনাথের প্রেমপ্রাপ্তি তাহার নিকট একান্ত দুরাশা, সে জানিত যে যদি সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে প্রণয়ীর ন্যায় ভালবাসিত, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ তাহার—

"——প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে
মুখ দেখে, আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে,
বুঝিত যা গুপ্ত আছে বুকের মাঝারে,
প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি লুকানো থাকে?"

বাস্তবিকই প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম তো লুকানো থাকে না; সুতরাং সতীশচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা সত্বেও যখন সুরেন্দ্রনাথ বিমলাকে আর কিছু গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন বিমলার হৃদয় অভিমানে স্ফীত হইয়া কহিয়া উঠিল,—

"তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার।"

সেই জন্য সে সুরেন্দ্রনাথকে "বিমলা" নাম বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেই জন্য সে বলিয়াছিল, "সরলা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব অন্য নারী আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্যা।"

দরিয়া বা জেলেখার প্রেমে যেরূপ একটা হাহাকার রব, দারিদ্র্যের একটা ভীষণ নিনাদ, দুঃখের একটা মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, বিমলার প্রেমে সেইরূপ কোনও শব্দ শ্রুতই হয় না। বিমলার প্রেম কাহারও নিকট আপনাকে

প্রকাশ করে না, তাহা সর্ব্বদাই অন্তর্ব্বাহিনী হইয়া আপনারই মধ্যে লীন হইয়া থাকিতে চায়, তাহা সর্ব্বদাই বিমলাকে ইহাই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে,—

"পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল,
আশ কি মিটে না তোর রে আঁখি দুর্ব্বল।"

দরিয়া বা জেলেখার ন্যায় যদিও বিমলা আপনার ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই, তথাপি তাতারজাতীয়া যুবতীদ্বয়ের চরিত্রে আমরা যে উচ্ছৃঙ্খলতা, যে কপটতার ছায়া, যে দৈন্য, সমাজের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে অনুষ্ঠান দেখিতে পাই তাহা বিমলার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। দরিয়া ও জেলেখা আপনাদের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে ঘৃণার চক্ষে, অসূয়ার চক্ষে দেখিত, কিন্তু বিমলা সরলাকে কখনও হিংসার চক্ষে দেখে নাই, সে সরলাকে স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়ই জানিত এবং সেইরূপই তাহাকে স্নেহ করিত। জেলেখা ও দরিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া স্বীয় প্রণয়ীর সহিত তাহাদের অভিলষিত পাত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সদা সচেষ্ট রহিত, কিন্তু বিমলা কোনও দিন হৃদয়ে সেরূপ ভাব পোষণ করে নাই, সে স্বপ্নেও সরলার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ ঘটাইবার কল্পনাও আনে নাই, সে বরং তাহাদের হিতেচ্ছু হইয়া তাহাদের মিলনের জন্যই সদা উৎসুক রহিত। দরিয়া বা জেলেখার প্রেম অন্ধ ছিল, তাহা শাস্ত্রাশাস্ত্র মানিত না, পাত্রাপাত্র বুঝিত না, কিন্তু বিমলার প্রেম অত্যন্ত সংযত ছিল, তাহা আত্মসুখকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া তুলে নাই, তাহা মঙ্গলকেই চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

বিমলার চরিত্রে অসঙ্গতিদোষ আছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রদর্শন করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমরা নিরস্ত রহিলাম।

বিমলা ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাসবতী। বিমলার গাম্ভীর্য্য জেলেখার গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা গভীরতর। বিমলা রসিকা বটে, কিন্তু তাহার রসিকতার মধ্যেও আমরা গাম্ভীর্য্যের ছায়া দেখিতে পাই, সেই মধ্যাহ্নতপনের খর রশ্মির মধ্যেও আমরা প্রাবৃটের ছায়া অনুভব করিতে পারি।

বিমলার প্রণয় যে প্রথম হইতেই নিরাশপ্রণয় নহে, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যদিও, বস্তুতঃ, বিমলার প্রেমকে অত্যন্ত সংযত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু শেষ অবধি বিমলার এই প্রেমের অভ্যন্তর হইতে আমরা একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই এবং মাঝে মাঝে শোণিতশোষক

অস্থিবিমর্দ্দক দীর্ঘশ্বাসেরও উষ্ণতা অনুভব করিতে পারি। যখন বিমলা জানিতে পারিল যে তাহারই চিত্তচোর সরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তখন "সে শিহরিয়া উঠিল, তখন সে পাশ ফিরিয়া নিস্তব্ধভাবে শুইয়া রহিল।" যখনই বিমলা কোনও সংশয়াকুল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই সে নিস্তব্ধভাবে আপনার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিয়া লয়। এই নিস্তব্ধতাই বিমলার বিশেষত্ব, এই নিস্তব্ধতা আমরা জেলেখা চরিত্রেও দেখিতে পাই, তবে ইহা বিমলাতে গভীরতর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। জেলেখাও নীরব রহিয়া আপনার কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। জেলেখাই কিঞ্চিৎ উন্নতা হইয়া বিমলা-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। নরেন্দ্রনাথ যখন অজ্ঞানাবস্থায় জেলেখার গৃহে শায়িত রহিয়াছেন, তখন জেলেখা নরেন্দ্রের কষ্টে, নরেন্দ্রের দুঃখে, পীড়িতা হইয়া কেবলমাত্র নীরবে রোদন করিয়া আপনার সমস্ত দুঃখভার লাঘবের চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং আমাদের বিমলাও যখন সুরেন্দ্রনাথকে অচেতনাবস্থায় অন্ধকার কারাগারে শায়িত দেখিয়াছিল, তখন সেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই, তখন সেও জেলেখার ন্যায় উন্মত্তা হইয়া আপনার প্রাণ অবধি সংশয় করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রাণরক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়াছিল। তখন তাহার সেই নীরব অশ্রু কি তাহার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখের ভীষণ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে না যে,—

"কিছুই চাহিনা আর কিছুই ভাবি না আর—
শুধু সেই মুখে চাই দুটী আঁখি তুলে।":

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিমলার প্রণয় এমন কি তাহার পিতৃস্নেহকেও পরাজিত করিয়াছিল। বিমলা পিতার শুভেচ্ছু হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছিল, কিন্তু যেই শুনিল যে সুরেন্দ্রনাথ মুসলমানদিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়াছেন, অমনি তাহার যত দুঃখ, পিতার প্রতি যত স্নেহ, রমণী সুলভ যত কোমলতা ক্ষণকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইল, তখন সে সুরেন্দ্রনাথের উদ্ধার বাসনায় মুসলমান নবাবের দাসীত্ব স্বীকার করিল এবং এমন কি কারারক্ষীগণের সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইল না।

তবে আমরা দরিয়া ও জেলেখাতে যে একটা আত্মপ্রবঞ্চনা দেখিতে পাই, তাহার অল্পতর ছায়া বিমলাচরিত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনা এমন কি বিমলার যে উন্নতমূর্ত্তি, বিমলার যে আদর্শস্থানীয়া আয়েষা, সেই আয়েষাতেও আমরা দেখিতে পাই। যখন সরলার সহিত ইন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল,

তখন বিমলা দেখাইতে চাহিয়াছিল যে সে সুরেন্দ্রনাথের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী নহে, সে ঈশ্বরপাদপদ্মে তাহার যত সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি অর্পণ করিয়াছে, সে জানাইতে চাহিয়াছিল যে, সংসারে তাহার লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহার শেষ মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে এই ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে, তাহার শেষ মূর্ত্তির অভ্যন্তরে আমরা কি একটা আত্মপ্রবঞ্চনার রেখা দেখিতে পাই না? সে যখন সরলাকে সুরেন্দ্রনাথপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া দিল, তখন তো আমাদের ইহাই মনে হয় যে এতদিন বিমলা সুরেন্দ্রনাথকে প্রাপ্ত হইবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সেই জন্য সে অঙ্গুরীয়টী রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে সুরেন্দ্রনাথকে পাইবার আশা নাই, তখন সে তাহার প্রেমচিহ্নকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ইহা কি বিমলার চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচয় দিতেছে না? এই অঙ্গুরী অর্পণই তো বিমলার বিরহ আগুনকে আরও প্রস্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে। আয়েষাও যখন জগতসিংহকে পত্র লিখেন, তখন তিনিও এই আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে মুক্তি পান নাই। যদিও তিনি জগতসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি, আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না," কিন্তু তথাপি আয়েষার এই উক্তিতে কি আমাদের বিশ্বাস হয়? যেমন কোন মানব চিন্তা করিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বসে, অথচ "সেই চিন্তা করিবনা"র চিন্তাই তাহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে, তদ্রূপ এই প্রতিদানের চিন্তাই তাহার জীবনব্যাপী চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। কেন না, যে প্রেম একবার মানবের চিত্ত অধিকার করিয়াছে, যে প্রেম মানবকে একবার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, যে প্রেম মানবকে একবার অমৃতরস উপভোগ করাইয়াছে, তাহা কখনই হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতে পারে না; সেই প্রেমের পাত্রকে পাইবার জন্য তাহার হৃদয় আপনারই অজ্ঞাতসারে হা হা করিতে থাকে। সেই জন্যই না অদ্বিতীয় বাঙ্গালী প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"পিরীতি, পিরীতি, কিরীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে,
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?"

বাস্তবিকই পিরীতির জন্য প্রাণ দাও, তথাপি প্রণয় তো তোমায় ছাড়িবে না, প্রণয় তোমায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেই থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

মৃত্যু বিভীষিকা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মাঠের উভয় পার্শ্বই কঙ্করবালুকাকীর্ণ, সেই কঙ্কর ও বালুকার সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ কত প্রস্তরখণ্ড চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। স্থানে স্থানে প্রস্তরস্তূপ ও গহ্বর রহিয়াছে।

সদানন্দ বাবু বলিলেন, "আমাদের এই স্থানের ন্যায় বাঙ্গালা দেশে আর কোন স্থান নাই, এটাকে একটা মরুভূমি বলিলেও চলে, অনেক স্থানে কি আছে না আছে, তাহা কেহই জানে না। ঐ যে ঐ দিক্‌টা দেখিতেছেন, ওখানে একটা জলা আছে; বোধ হয়, কোন সময়ে একটা বড় নদী ছিল, এখন কেবল বালি—কেবল বালি, তাহাও চোরাবালি, কেহ ঐ বালিতে পড়িলে আর তাহার রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই; কিন্তু এই সকল স্থান কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই।"

আমি। আপনি দেখিয়াছেন ?

সদানন্দ। আমি কেবল দুই বৎসর হইল, এখানে আসিয়া বাস করিতেছি। তবে ছেলেবেলা হইতে নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে আমার সখ, তাহাই আমি এ স্থানটা যতদূর দেখিয়াছি, বোধ হয়, এদেশের আর কেহ তত দেখে নাই।

আমি। যে রকম স্থান—দেখাও বড় সহজ নহে।

স। ঠিক কথা, ঐ যে মাঠটা ধূ ধূ করিতেছে, দেখিতেছেন——

আমি। হাঁ, দূর হইতে বোধ হয়, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ঘোড়দৌড়ের মাঠই বটে ? ঐটী হইল, বড় বাঁকির চোরাবালি। মাঠ ভাবিয়া কত লোক যে ওখানে গিয়া মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কত জন্তু যে জল খাইতে গিয়া মরিয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কাল একটা গরু মারা গিয়াছে, অথচ আমি ঐ চোরাবালির মধ্য দিয়া যাইতে পারি। আবার প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি। উহার কোন্‌খানটা শক্ত আর কোন্‌খানটা চোরাবালি তাহা আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না—কি ভয়ানক! ঐ দেখুন ঐ চোরাবালিতে আবার আজ একটা গরু পড়িয়াছে।"

আমি দেখিলাম, একখণ্ড শুভ্র বস্ত্রের মত কি যেন একটা মাঠের উপর গড়াগড়ি দিতেছে। পরক্ষণে একটা গরুর কাতর আর্ত্তনাদে সেই প্রান্তরের চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই ভয়াবহ দৃশ্যে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু দেখিলাম, সদানন্দ বাবু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

তিনি বলিলেন, "ঐ গেল—গিয়াছে, চোরাবালি গিলিয়া ফেলিয়াছে! এই দুই দিনে দুইটা গেল। বেচারিরা জলের লোভে গিয়া প্রাণ হারায়। এই রকম কত যে মরেছে, তাহা কে বলিবে? ভয়ানক স্থান, বড় বাঁকির চোরাবালি—বড় ভয়ানক স্থান।"

আমি। আর আপনি বলিতেছেন যে, আপনি এই ভয়ানক স্থানে যাইতে পারেন।

সদানন্দ। হাঁ, দুই-একটা সহজ পথ ইহার ভিতর দিয়া আছে, আমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম।

আমি। এ রকম ভয়ানক স্থানে আপনি গিয়াছিলেন কেন?

স। চোরাবালির ওপারে ঐ পাথরের স্তূপগুলিতে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে, ফুল সংগ্রহ করা আবার আমার একটা মস্ত সখ, তাই মাঝে মাঝে যাই। আপনি একদিন যাবেন?

আমি। (সহাস্যে) রক্ষা করুন, মহাশয়। আমার এমন সাংঘাতিক সখ নাই।

স। খুব ভাল—খুব ভাল। আমি ভিন্ন আর কাহারও সেখানে গেলে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সহসা সমস্ত নির্জ্জন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা কি ভয়ানক কর্কশ ধ্বনি উত্থিত হইল। আমি বিস্ময়চকিত ভাবে বলিয়া উঠিলাম, "একি—একি!" সেই ভীষণ শব্দ ক্রমে দূরে—বহু দূরে গিয়া বাতাসে মিলিয়া গেল। সদানন্দ বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের এ মাঠ অতি অদ্ভুত স্থান।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "এ কি! এ কিসের শব্দ?"

সদানন্দ বাবু বলিলেন, "এ দেশের চাষারা বলে, রাজবংশের কুকুর ভূত আহারের জন্য চীৎকার করিতেছে। আমিও এ শব্দ দুই-একবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোনবারই এমন ভয়ানক চীৎকার শুনি নাই।"

আমি সভয়ে চারিদিকে চাহিলাম। চারিদিকেই—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই

সেই জনশূন্য প্রান্তর—বিস্তৃত মরু—ভয়াবহ স্থান! যতদূর দেখা যায়, একটী পাখী পর্য্যন্ত নাই! আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি শিক্ষিত লোক, আপনিও কি এই সকল পাগলামী বিশ্বাস করেন? এরূপ অদ্ভুত শব্দের কারণ কি আপনি মনে করেন?"

তিনি বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না, এই মাঠের মধ্যে অনেক অদ্ভুত গহ্বর আছে, তাহাতে বাতাস গিয়াও এই রকম শব্দ হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "না, এ শব্দ সে রকম শব্দ নয়, ইহা নিশ্চয়ই কোন জীবিত প্রাণীর শব্দ।"

"খুব সম্ভব, এ দেশে একরকম পাখী আছে, তাহারা অদ্ভুত রকম ডাকে। আপনি এ রকম পাখীর ডাক কখনও শুনিয়াছেন?"

"না, এ রকম পাখী দেখি নাই।"

"আমার বোধ হয়, সেই রকম কোন পাখীর শব্দ আমরা শুনিলাম।"

"এ রকম শব্দ আমি আর কখনও শুনি নাই।"

"এ স্থানটাই অদ্ভুত—আঃ কি চমৎকার ফুল!"

এই বলিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া সদানন্দবাবু ছুটিলেন। তিনি সেই চোরাবালির দিকে ছুটিলেন, আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আমি দেখিতে পাইলাম, অতি দূরে একস্থানে কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা এতদূরে রহিয়াছে যে, সে যে কি ফুল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সদানন্দবাবু দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঠের উপর দিয়া সেই ফুলগুলির দিকে ছুটিলেন। কেহ ফুলের জন্য এমন পাগল হইতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না।

আমি কি করিব, গড়ের দিকে ফিরিয়া যাইব, না সদানন্দবাবুর জন্য অপেক্ষা করিব ভাবিতেছি, এই সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিলাম। দেখিলাম, একটী পরমরূপবতী রমণী।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই রমণীর পরিধানে একখানি শুভ্র থান, দেহে একখানিও অলঙ্কার নাই, সীমন্তে সিন্দুরচিহ্নও নাই। সুতরাং এই সুন্দরী যে বিধবা, তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কথায় কথায় আমরা প্রায় সদানন্দ বাবুর বাড়ীর নিকট আসিয়াছিলাম, নিকটে আর কোন বাড়ী নাই, নলিনাক্ষ বাবুর নিকট

শুনিয়াছিলাম, সদানন্দবাবুর এক বিধবা ভগিনী আছেন, সুতরাং ইঁহাকে দেখিয়া আমি মনে করিলাম, ইনিই সদানন্দের সেই বিধবা ভগিনী হইবেন।

সহসা এই নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে ইঁহাকে দেখিয়া আমি কি বলিব, কি করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিলাম, কিন্তু তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "যাও—পার ত আজই কলিকাতায় ফিরিয়া যাও।"

আমি অতি বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই স্ত্রীলোক একি বলিতেছে?

রমণী আরও অধীর হইয়া বলিল, "এখনই—এখনই চলিয়া যাও—কলিকাতায় ফিরিয়া যাও।

আমি এবার কথা কহিলাম, বলিলাম, "কেন, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব কেন?"

রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "কেন তাহা বলিবার উপায় নাই। ভাল চাও ত আজই এখনই কলিকাতায় ফিরিয়া যাও, কখনও এই মাঠে আসিও না।"

আমি। আমি কেবল নূতন এখানে আসিয়াছি।

রমণী। (ব্যাকুল ভাবে) তা জানি—তা জানি। ভালর জন্য বলিলেও কি তাহাতে সন্দেহ হয়? যাও,—আজই এখান হইতে চলিয়া যাও—পালাও —প্রাণের মায়া থাকে ত পালাও—চুপ্, আমার ভাই আসিতেছে। উহাকে যেন আমার কথা কিছুতেই বলিও না—আমি চলিলাম।"

রমণী মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দণ্ডায়মান রহিলাম।

এই সময়ে ফুল লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সদানন্দবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ফুলের সাজি সুন্দর ফুলে পরিপূর্ণ; তিনি সগর্ব্বে বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, এমন সুন্দর ফুল আর দেখিয়াছেন কি? আমি ফুলের জন্য পাগল, আমি ফুল যত ভালবাসি, তত আর কিছু ভালবাসি না। আসুন, গরিবের আস্তানাটা একবার দেখিয়া যান।"

তখন আমরা দুইজনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী সুন্দর ক্ষুদ্র অট্টালিকার সম্মুখে আসিলাম, বাড়ীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র সুন্দর পুষ্পোদ্যান; দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই গৃহের গৃহস্বামী ফুল বড়ই ভালবাসেন। বাগানময় নানা রঙ্গের সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে।

তবে বাড়িটী বড়ই নির্জ্জন, নিকটে আর কাহারও বাড়ী নাই, যতদূর দেখা যায়, কেবলই কঙ্করপূর্ণ জনশূন্য মাঠ। এমন শিক্ষিত লোক কেন এমন নির্জ্জনস্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

সদানন্দ যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়াই বলিলেন, "বড় নির্জ্জন স্থান, নয় কি ডাক্তার বাবু ?"

আমি বলিলাম, "খুব নির্জ্জন স্থান সন্দেহ নাই।"

তিনি কহিলেন, "এক সময়ে পশ্চিমে আমি স্কুল-মাষ্টারী করিতাম, কিন্তু চিরকাল স্কুলে পড়াইতে আর ভাল লাগিল না। পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু ছিল, তাহাই ভাবিলাম, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া জীবনের শেষাংশটা কাটাইয়া দিব। তাহার পর এই স্থানটা বড় ভাল লাগায় এই বাড়ীটা কিনিয়া সেই পর্য্যন্ত এখানে এই ফুলের মধ্যে জীবন কাটাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "স্থানটা এমন নির্জ্জন বলিয়া আপনার কষ্ট হয় না ?"

তিনি কহিলেন, "বিন্দুমাত্র না, ফুল আর বই লইয়া আছি। তাহার পর ডাক্তার নলিনাক্ষ বাবু আছেন, তিনি বড় ভাল লোক, সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ীতে যাই। এখন আবার এই নূতন রাজা হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বোধ হয়, বিরক্ত হইবেন না।"

আমি কহিলাম, "কেন হইবেন ? এখানে ভদ্রলোকের বাস নাই বলিলেই হয়। আপনার সঙ্গে আলাপ হইলে তিনি খুব খুসী হইবেন।"

তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাকে বলিবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। এ রকম স্থানে থাকিতে তাঁহার মত লোকের নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হইবে, তবে আমাদের দ্বারা যতদূর হয়, তাঁহার যাহাতে এখানে আসিতে কষ্ট না হয়, তাহা আমরা করিব। আসুন, এইবার আমার বইগুলি দেখুন।"

আমি বহুক্ষণ রাজা মণিভূষণকে একাকী ফেলিয়া আছি, গোবিন্দরামের ইহা হুকুম নহে, সুতরাং আমার আর সদানন্দ বাবুর বাড়ী অধিকক্ষণ বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। তাহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি সেই ক্ষুদ্র পথ দিয়া অনেকদূর আসিয়াছি, একটা বাঁক ফিরিয়া দেখি, সম্মুখে সেই পূর্ব্বদৃষ্টা শুক্লবসনা রমণী—সদানন্দ বাবুর ভগিনী। তিনি আমার

পূর্ব্বে এখানে কিরূপে উপস্থিত হইলেন ? বুঝিলাম, মাঠ দিয়া এমন কোন পথ আছে, যাহাতে এই স্থানে সহজে ও শীঘ্র আসা যায়।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি দেরী করিব না, তাহা হইলে আমার ভাই সন্দেহ করিবেন, আমার অনুসন্ধান করিবেন। আমি আপনাকে আমার নিজের ভুলের কথা বলিতে আসিয়াছি, আমি আগে মনে করিয়াছিলাম, আপনি এখানকার নূতন রাজা, পরে আমার ভাইএর কাছে শুনিলাম, তাহা নহে, আপনি তাঁহার বন্ধু। আমি যাহা আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া যান।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি রাজা মণিভূষণের বন্ধু, তাঁহার বিষয় যাহা আমার বিষয়ও তাহাই। আপনি কেন ইচ্ছা করেন যে, তিনি এখাম হইতে চলিয়া যান, এ কথা আমার জানা উচিত।"

রমণী। স্ত্রীলোকের বাজে কথায় কান দিবেন না। আমার স্বভাবই ঐ রকম। যা তা একটা বলিয়া ফেলি, আর তার মানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমি। না, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত কথা নহে। আপনি যদি মণিভূষণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়েন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত কথা আমাকে খুলিয়া বলা উচিত। এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত আমি দেখিতেছি, যেন আমাদের উপরে অলক্ষ্যে কি একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে। এই নির্জ্জন মাঠের মত, আমার মনও সম্পূর্ণ যেন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজার কি বিপদের আশঙ্কা আপনি করিতেছেন, আমায় খুলিয়া বলুন। আমি আপনার কথা তাঁহাকে বলিব।"

রমণী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেন ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি সামান্য কথাকে অতি গুরুতর করিয়া তুলিতেছেন। আমার ভাই ও আমি আমরা দুইজনেই মৃত রাজাকে বড় ভক্তি ও মান্য করিতাম, তাঁহার এই রকম হঠাৎ মৃত্যুতে আমাদের মনে কেমন এক রকম ভয় হইয়াছে। এখানে আসিলে নূতন রাজারও মৃত্যু হইতে পারে, ভয়ে আমি না বুঝিয়া অবোধ স্ত্রীলোকের ন্যায় ঐ কথা বলিয়াছিলাম। আপনি সে কথা ভুলিয়া যান। স্ত্রীলোকের বাজে কথায় আপনি মন দিবেন না।"

আমি। তবুও দেখিতেছি, আপনি নূতন রাজার কোন বিপদ্ হইবার আশঙ্কা করিতেছেন। কি বিপদের ভয় করেন, বলুন।

র। আপনি এখানকার কুকুর ভূতের কথা শুনিয়াছেন কি?

আমি। শুনিয়াছি—এ রকম পাগলামী কথা আমি বিশ্বাস করি না।

র। আপনি না করেন, আমি করি। যদি নূতন রাজা আপনার কথা শুনেন, তাহা হইলে এখনই তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যান, বিপদের মধ্যে আসিতে তাঁহার ইচ্ছা কেন?

আমি। তিনি বিপদকে ভয় করেন না।

রমণী। কেন?

আমি। ভূত ছাড়া প্রকৃত কোন বিপদের প্রমাণ না পাইলে তিনি এখান হইতে একপদ নড়িবেন না।

র। (হতাশ ভাবে) তাহা হইলে আমি আর কি বলিব?

আমি। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। ইহা ছাড়া যদি আর কিছু আপনার মনে না থাকিবে, তবে আপনি আপনার ভাইএর নিকট এ কথা লুকাইতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন? অবশ্যই আরও কিছু আছে।

র। আমার ভাইএর ইচ্ছা নয় যে গড়ে নূতন রাজা না থাকুক, তিনি না থাকিলে এ দেশের অনেক হানি, এইজন্য আমি রাজাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি, শুনিলে তিনি রাগ করিবেন, তাহাই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে বারণ করিয়াছিলাম, আর দেরি করিব না, তিনি হয়ত আমায় খুঁজিতেছেন, আমি যাই।

আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া রমণী মাঠের নিম্নবর্ত্তী খাদের পথে অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরে জানিয়াছিলাম, এই স্ত্রীলোকের নাম মঞ্জরী।

আমি এই অদ্ভুত স্থানের অদ্ভুত ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে গড়ে ফিরিলাম। দেখিলাম তখনও রাজা তাঁহার কাগজপত্র লইয়া মহা ব্যস্ত আছেন। তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া আমার মন স্থির হইল। গোবিন্দরাম বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও রাজাকে ছাড়িয়া অন্যত্রে না যাই, সুতরাং এতক্ষণ তাঁহার নিকট অনুপস্থিত থাকায়, আমি প্রকৃতই বিশেষ চিন্তিত ও ব্যগ্র হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার নিকট আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

আকবর সাহ।

নানা প্রকার বন্য পশু পালন করিতে, তাহাদিগকে সবশে আনিতে এবং গভীর রাজকার্য্যের অবসরে তাহাদিগকে লইয়া সময়াতিবাহিত করিতে সম্রাট আকবর অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তদানীন্তন কালে সকল রাজা বাদশাহই ঐরূপ বন্য জন্তু লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন বটে, কিন্তু সম্রাট আকবরের এ বিষয়ে একটু অধিক মনোযোগ ছিল। যেমন তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল বিভাগেই বন্দোবস্ত ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আকবর যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহভাজন আবুল ফজেলের বিশদ বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পশু বিভাগ যন্ত্রীকৃত করিতেও সম্রাট যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, ষণ্ড, উষ্ট্র ও হরিণ প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তিনি বিভিন্ন কার্য্য বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সম্রাটের পিল্‌খানা বা হস্তীশালে অনেক হস্তী থাকিত। তাহার মধ্যে কতক গুলি খাস্‌ হস্তী নামে অভিহিত হইত। সম্রাট স্বয়ং এই খাস্‌ হস্তীগুলি লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, তাহাদিগকে লইয়া শীকার করিতে যাইতেন, এবং অপর হস্তীর সহিত আপনার খাসহস্তীর মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতেন। রাজহস্তী গুলি কোন্‌ কোন্‌ ভাগে বিভক্ত হইত, প্রত্যেকে দিন কত মণ কত সের আহার পাইত, প্রত্যেক হস্তীর কতগুলি করিয়া ভৃত্য থাকিত, তাহাদিগের কিরূপ বেতন, হস্তীর হাওদা কতপ্রকার হইত এই সমস্ত বিষয় সম্রাট স্বয়ং স্থির করিয়া দিয়াছিলেন এবং সে সকলের বিশদ বর্ণনা আবুল ফজল নিজ বহুমূল্য গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।* পশ্চিমের আগ্রা প্রভৃতি স্থলে এবং বাঙ্গালার সাতগাঁ প্রভৃতিতে বন্য হস্তী ধরিবার জন্য সম্রাটের রীতিমত বন্দোবস্ত ছিল। আবুল ফজেল বলেন—ত্রিপুরার হস্তীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

---

* সমগ্র "আকবর নামা" কেহ ইংরাজীতে অনূদিত করেন নাই। Elliot তাহার কতক অংশ ভাষান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। Gladwin ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে "আইনে আকবরী" নামক আকবর নামার অংশটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। তাহার পরে Blockman, পরে অধুনা Jarret সাহেব উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া দেশের মঙ্গল করিয়াছেন।—লেখক।

সম্রাট আকবরের নিকট অশ্বও খুব প্রিয় ছিল। সাধারণতঃ তাঁহার অশ্বশালে অন্যূন দ্বাদশ সহস্র অশ্ব থাকিত। ইরাক, রুম, তুর্কীস্থান, বদকসান তিব্বত, কাশ্মীর, ইরাণ বা পারস্য প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি প্রায়ই অশ্ব আমদানী করিতেন এবং নিজ আমীর, ওমরাহ ও প্রিয়পাত্রদিগের মধ্যে অশ্ব বিতরণ করিতেন। এখন যেমন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানের মধ্যেই উত্তম অশ্ব উৎপন্ন করিতেছেন, আকবরও সেইরূপ নানাস্থলে অশ্ব জন্মাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

অশ্ব বিভাগও সম্রাট আকবরের সাধারণ বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িয়াছিল। হস্তী সম্বন্ধে তিনি যেমন অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অশ্বশালা সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপ নানা নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

আকবর সতরখানা বা উষ্ট্রশালাতেও অনেক সময়াতিবাহিত করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে উষ্ট্র উৎপন্ন করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজমীর, যোধপুর, নগোর, গুর্জ্জর প্রভৃতি স্থলে বেশ উঠ পাওয়া যাইত। সম্রাটের যে কয়েকটী খাস উষ্ট্র ছিল তাহার মধ্যে "সাহ পসন্দ" সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এ উষ্ট্রটি দেশী হইলেও দ্বাদশ বৎসর কাল মল্ল যুদ্ধে তাবৎ দেশী ও বিদেশী উষ্ট্রকে হারাইয়াছিল বলিয়া সম্রাট "সাহ পসন্দ"কে বড় ভাল বাসিতেন।

সম্রাট গোখানারও বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এক শত বাছাই বলীবর্দ্দ খাস্ বলিয়া বিবেচিত হইত।

অশ্বতর ও হরিণেরও বিভিন্ন বিভাগ ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সম্রাট বন্যপশু শীকারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। আকবর নামায় তাঁহার সিংহ শীকারের বড় চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। সকল সময়েই অস্ত্রাঘাতে তিনি পশুরাজকে পরাজিত করিতেন না। নানা প্রকার কৌশল করিয়া তিনি সিংহগণকে বন্দী করিতেন এবং তাহাদিগকে নিহত করিতেন। এ সকলের মধ্যে প্রায় সমস্ত কৌশলই সুন্দরবনে ব্যাঘ্র ধরিতে আজিও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় এবং আকবরের পূর্ব্বে সে সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল কি না তাহা বলা কঠিন।

একটি সুবৃহৎ লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে একটি ছাগল রাখা হইত। বনের মধ্যে যথায় কেশরীর গতিবিধি আছে এমন স্থলে সেই পিঞ্জরটি রক্ষিত হইত। ছাগলের লোভে যেমন সিংহ পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিত অমনি পিঞ্জরের দ্বার

আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গিয়া সিংহকে বন্দী করিত। বৃক্ষের শাখায় একটা ধনুকে তীর বাঁধিয়া রাখিয়া সময়ে সময়ে সিংহ বধ করা হইত। যেমনি সিংহটা গাছের ডালে পদক্ষেপ করিত অমনি তীর ছুটিয়া সিংহের বক্ষে প্রবেশ করিত। ইহা ব্যতীত অপর একটা প্রথা আবুলফজেল বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে কতকটা নূতনত্ব আছে। বনের মধ্যে একস্থলে একটী মেষ বা ছাগ রক্ষা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কিছুদূরে খড়ের একটা গণ্ডী নির্ম্মাণ করা হইত। ঐ সকল খড়ে আঠা মাখান থাকিত। সিংহ লাফাইয়া যেমনি ভিতরস্থিত মেষটাকে ধরিতে যাইত অমনি তাহার পদে পিচ্ছিল খড়গুলা জড়াইয়া যাইত। বিরক্ত হইয়া সিংহটা যতই ছুটাছুটি করিত ততই তাহার সর্ব্বাঙ্গে খড় জড়াইয়া যাইত। শেষে শীকারীরা আসিয়া লগুড়, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিয়া পশুরাজের ভবলীলা শেষ করিয়া দিত।

আবুলফজল বর্ণিত মহিষের উপর চড়িয়া সিংহবধ করিবার উপায় বেশ সাহস ও বীরত্বের পরিচায়ক। একটা বলিষ্ঠ মহিষের পৃষ্ঠোপরি বসিয়া শীকারী মহিষটাকে উত্তেজিত করিয়া সিংহকে আক্রমণ করে। মত্ত মহিষ শৃঙ্গাঘাতে সিংহকে মারিতে আরম্ভ করে, কেশরীও সিংহ বিক্রমে মহিষকে আক্রমণ করে। শেষে সিংহকে যুদ্ধ নিপুণ মহিষের নিকট পরাস্ত হইতে হইত।

একবার বনের মধ্যে হস্তী পৃষ্ঠে শীকারান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে সম্রাট দেখিলেন অকস্মাৎ একটা ঝোপের ভিতর হইতে এক প্রকাণ্ড সিংহ লম্ফপ্রদান করিয়া তাঁহার হস্তীর শিরের উপর আসিয়া বসিল। নখরাঘাতে পরাজিত হইয়া হস্তীটা ভূমিশায়ী হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি ভূপতি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া রক্তলোলুপ পশুটিকে খড়্গাঘাতে নিহত করিলেন।

একবার টোডা নামক স্থলে শীকার করিবার সময় আকবরের একজন সৈনিককে সিংহে ধৃত করিয়া পলাইতেছিল, সম্রাট তীরক্ষেপ করিয়া তখনি পশুটাকে বধ করিয়া হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা করিলেন।

অনেক পাশ্চাত্য লেখক বলিয়া থাকেন যে বন্য পশুকে চক্ষের দৃষ্টিতে বশ করা যায়। আকবরের জীবনে একবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বনের মধ্যে একটা সিংহ হঠাৎ সম্রাটকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তাঁহার সঙ্গী সুজাহত খাঁ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সম্রাট প্রখর দৃষ্টিতে কেবল সিংহটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আক্রমণোদ্যত সিংহ সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষণিক

স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া শেষে পলায়ন করিল। তখন সম্রাট বাণাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিলেন।

আমরা অধুনা সার্কাসে একটা পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের শিক্ষা দেখিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হই। আবুলফজেলের ইতিহাস পাঠে জানা যায় সম্রাট আকবর স্বয়ং শত শত যুজ বা চিতাবাঘ শিক্ষিত করিতেন। তাঁহার একটা প্রিয় চিতাবাঘ তাঁহার সহিত কুকুরের মত ইতস্ততঃ বেড়াইত। তাহার শৃঙ্খলাদির প্রয়োজন হইত না।

পূর্ব্বে একটা গভীর গহ্বর খনন করিয়া তাহার উপর তৃণাদি আবরিত করিয়া রাখা হইত। শার্দ্দূল তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার সময় গহ্বর মধ্যে নিপতিত হইত। পরে তাহাকে শীকারীরা গিয়া ধরিয়া আনিত। সম্রাট দেখিলেন এ প্রণালীতে এককালে একটার অধিক ব্যাঘ্র বন্দী হইত না এবং অকস্মাৎ গহ্বর মধ্যে পড়িয়া গিয়া পশুগুলার হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয়া যাইত। অতএব সুলতান এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দুই এক গজ মাত্র গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার উপর একটা ছোট দরজা বসাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। দ্বারের উপর তৃণাদির আবরণ থাকিত এবং দ্বারে স্প্রিং থাকিত। ব্যাঘ্র কবাটের উপর আসিলেই গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাইত এবং তখনই আবার দরজাটা পূর্ব্ববৎ বন্ধ হইয়া যাইত। এইরূপে একাধিক ব্যাঘ্র সেই গর্ত্তের মধ্যে বন্দী হইতে পারিত। একবার একটা ব্যাঘ্রী চারিজন প্রেমাভিলাষী ব্যাঘ্র-যুবকের দ্বারা অনুসরিত হইয়া বন মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অকস্মাৎ দ্বারের উপর আসিয়া বাঘিনী অন্তর্ধ্যান করিল। তখন তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে একে একে সেই চারিটি শার্দ্দূল গর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া ক্রমে সুলতানের পশুশালার অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

আবুলফজেল বলেন সম্রাট যতই কেন ক্লান্ত হউন না, গর্ত্তে চিতা পড়িয়াছে শুনিলে অমনি অশ্বারোহণ করিয়া পাঁচ ক্রোশ ছুটিয়া বন মধ্যে ব্যাঘ্র ধরিতে ছুটিতেন। তিনি স্বহস্তে বাঘগুলাকে বাহির করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিতেন। প্রথমতঃ এক একটা বাঘকে পোষ মানাইতে দুই মাস লাগিত। শেষে যত বড়ই কেন দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র হউক না অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত।

সম্রাট এই সকল শিক্ষিত চিতা লইয়া হরিণ শীকার করিতে যাইতেন।

সময়ে সময়ে সহস্র ব্যাঘ্র তাঁহার সহিত শীকারে যাইত। প্রত্যেক চিতাটার এক একটীর নাম ছিল এবং তাহারা ডুলি, গাড়ী প্রভৃতিতে যাইত। দুইটা ঘোড়ার স্কন্ধে একটা লম্বা কাঠ দিয়া তাহাতে দুই তিনটা বাঘের পিঞ্জরা ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সমন্দমাণিক নামক সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যাঘ্র চতুর্দ্দোলা চড়িয়া শীকারে যাইত। ব্যাঘ্র বিভাগে সর্ব্বসমেত দুই শত সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ছিল।

সম্রাট আকবরের অনেকগুলি শিকারী কুকুর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে কাবুলিস্থানের কুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিক্রমশালী।

আকবরের সময় বন্য হস্তী ধরিবার নানা প্রকার প্রথা ছিল। সুলতান স্বয়ং এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একটা বিস্তৃত জমী ঘিরিয়া তাহার দ্বারের নিকট কতকগুলা পালিত হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর নানা প্রকার শব্দাদি করিয়া বন্য হস্তীদিগকে ভয় দেখাইয়া সেই দিকে তাড়াইয়া আনিলে তাহারা আসিয়া পালিত হস্তিনীর যূথমধ্যে মিলিত হইত। শিক্ষিতা হস্তিনীগুলা তখন খেদার মধ্যে প্রবেশ করিত। তাহাদিগের সহিত বন্য হস্তীগুলাও খেদার মধ্যে ঢুকিত। তখন তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে বশে আনিয়া সম্রাট পিলখানার সংখ্যা পরিপুষ্ট করিতেন।

আকবরের রাজত্বকালে বন্য হরিণ ধরিবার নানাপ্রকার উপায় ছিল। তাহাদিগের কতকগুলির প্রবর্ত্তক সম্রাট স্বয়ং এবং কতকগুলি পুরাকাল হইতে প্রবর্ত্তিত ছিল। কতকগুলা পালিত হরিণের শৃঙ্গে একপ্রকার জাল বাঁধিয়া দিয়া শিকারিগণ বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিত। বন্য হরিণ পালিত হরিণের সহিত লড়িতে আসিয়া পাশবদ্ধ হইত, সেই সময় শিকারীরা তাহাদিগকে তীর মারিত। কোন কোন স্থলে শিকারীরা বৃক্ষের উপর লুকায়িত হইয়া মৃগের মত শব্দ করিত এবং মৃগগণ নিকটে আসিলে তাহাদিগের প্রতি বাণাঘাত করিত। "তঘ্‌নী" নামক শীকার করিবার একটি উপায় ছিল। একজন ব্যক্তি নগ্নাবস্থায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিত। মৃগকুল ;তাহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া কুরঙ্গনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিত। সেই অবসরে লুক্কায়িত তীরন্দাজ তাহাদিগকে বধ করিত।

সম্রাট বন্য মহিষ ধরিবারও লোক নিযুক্ত রাখিতেন। যে বিলে সাধারণতঃ মহিষের পাল স্নানাদি করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা তাহার কুলে জাল পাতিত। তাহার পর কতকগুলা লোক পালিত মহিষের উপর আরোহণ করিয়া বল্লমাদি মারিয়া মহিষগুলাকে ভয় প্রদর্শন করিত। ভীত মহিষগুলা পলাইতে গিয়া জালে পড়িয়া ধৃত হইত। ইহা ব্যতীত মহিষ ধরিবার অপরাপর উপায় ছিল।

অপরাপর পশুপক্ষীর মধ্যে সম্রাটের নিকট পারাবত বেশ প্রিয় ছিল। রাজপ্রাসাদে অন্যূন বিংশতি সহস্র পারাবত ছিল, তাহার মধ্যে ৫০০ পায়রা সুলতানের খাস বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল পারাবতকে নানাপ্রকার কৌশল করিতে শিখান হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিকে পত্রবাহকের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

অন্যান্য ভূপতির মত সম্রাট আকবরও নিম্নলিখিত চারিটি পদার্থকে তাঁহার উচ্চপদের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতেন।

(১) আওরং বা সিংহাসন—ইহা নানা প্রকারের হইত। বলা বাহুল্য, প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সুলতানের সিংহাসনে মণিমাণিক্য সমাবেশের অভাব ছিল না।

(২) ছত্র—ইহাতে অন্ততঃ সাতটি বহুমূল্য মণি থাকিত।

(৩) শায়িবন বা আফতাবগির—রৌদ্রের সময় এই ছত্র ব্যবহৃত হইত।

(৪) কৌকেবা বা স্বর্ণতারকা—ইহা সম্রাটের প্রাসাদের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইত।

সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিবার পর যে মোহর ব্যবহার করেন তাহাতে রোকা অক্ষরে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম অঙ্কিত ছিল। দরখাস্ত, আবেদন প্রভৃতিতে যে মোহর ব্যবহৃত হইত তাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছিল। তাহার একদিকে লেখা ছিল—

"দাস্তী ওজব উজলী খোদ্ আস্ত।
কস্ নদিদম্ কিহকর্ শদ উজধর আস্ত॥

"জগদীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার উপায়
"সিধা রাস্তায় কেহ পথ ভুলিল এমন কথনও দেখি নাই।"

উজেক নামক একটি ক্ষুদ্র মোহর ফর্‌মান বা অনুমতিপত্রে ব্যবহৃত হইত। পররাষ্ট্র বিভাগের জন্য একটি বৃহৎ মোহর ছিল। অপরাপর কার্য্যের জন্য একটি চতুষ্কোণ শীল ছিল। তাহাতে লিখিত ছিল—

"আল্লাহ্ আকবর জল জলালুহ"

"জগদীশ্বর সর্ব্বোচ্চ তাঁহার মহিমা প্রবল।" হারেম বা অবরোধ সংক্রান্ত আর একটি মোহর ছিল।

সম্রাট আকবর পবিত্র গঙ্গাজলের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জাহ্নবীর জল ব্যতীত অন্য জল পান করিতেন না। রন্ধন কার্য্যের জন্য যমুনার জল গঙ্গাজলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা ছিল। সুলতান যখন আগ্রা বা ফতেপুরে থাকিতেন তখন সারুন নামক স্থান হইতে তাঁহার গঙ্গাবারি আসিত। গঙ্গাতীরে তাঁহার যে কর্ম্মচারী থাকিত সে কলসীতে জল পুরিয়া তাহার মুখে মোহর করিয়া দিত। পঞ্জাবে অবস্থিতি কালে পুণ্যভূমি হরিদ্বার হইতে তাঁহার গঙ্গাজল আসিত। পঞ্জাব বিজয়ের পর পাহাড় হইতে তুষার ও বরফ আনাইয়া তিনি পানীয় জল শীতল করিয়া লইতেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার আবদারখানায় যবক্ষার বা সোরা দ্বারা তাঁহার জল শীতল হইত। একটি বড় পাত্রে সোরা মিশ্রিত জল রাখিয়া তাহার মধ্যে একটি পানীয় জলের পাত্র, অবশ্য মুখ বন্ধ করিয়া, কিছুক্ষণ নাড়িলেই পানীয় জল বেশ শীতল হইত। তখন তাহা সম্রাটের ব্যবহারোপযোগী হইত।

[ক্রমশঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভূতের দান।

(৫)

কণ্ঠবিলগ্ন স্ত্রীরত্ন বলিলেন—না, বল উষাকে কল্‌কাতায় পাঠাবে না।

আমি তাহাকে সস্নেহে বলিলাম—আমার তো ইচ্ছা নাই। বাবা যে চিঠি লিখেছেন।

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার গলা ছাড়িয়া বলিল—তবে আমিও যাব।

আমি বলিলাম—বিয়ের সময় যাবে বই কি? আগে বিয়ের ঠিক হ'ক। বাবা লিখেছেন পাত্রটি খুব ভালো। আর এ জঙ্গলে ওকে বসিয়ে রাখ্‌লে কি হবে? পাঁচটা দেখ্‌তে হবে তো।

লীলাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার হাত ধরিলাম। সে বলিল—না, ছাড়ো। আমি বলছি হেমবাবুর সঙ্গে বিয়ে দাও। তাতে বাবুর আপত্তি হ'ল!

আমি হাসিয়া বলিলাম—পাগল হ'য়েছ লীলা? সে যে বিয়ে কর্ত্তে একেবারে সম্মত নয়।

স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক করা কঠিন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আমারই দোষে তাহার কৌমার ব্রতটা অভঙ্গ রহিয়াছে। কোন প্রকারে, ভার্য্যার নিকট এ বিষয়ে মদীয় নির্দ্দোষিতাটা সপ্রমাণ করিতে পারিলাম না। ক্রমে অবস্থাটা অশান্তিকর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে স্বয়ং হেমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিহে ভূতের কিছু সন্ধান কর্‌তে পার্‌লে?

সে বলিল—না ভাই। ওসব পৈশাচিক ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধানে আর কাজ নাই। আমি ও বাসা ত্যাগ করব। মিছে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে লাভ কি?

আমি হাসিয়া বলিলাম—কেন সাহস গেল কোথায়?

দৃঢ়স্বরে হেম বলিল—সাহসের অভাব নাই। বেটার বেয়াদবি যে রকম বেড়েছে তাইতে বেটার উপর রাগ হয়।

আমি সাগ্রহে বলিলাম—কি রকম?

"কাল তো দুইটা ভূত নাচিতে আরম্ভ করিলে আমি গম্ভীর ভাবে আরাম চৌকিতে পা তুলিয়া চুরুট টানিতে টানিতে দেখিতে লাগিলাম। শেষে একখানা সাদা হাতীর দাঁতের চেয়ার আসিল। একটা কঙ্কাল তার উপর বস্‌ল। অপরটা তেঁতুল গাছের পিছন হইতে একটা সাদা টি্রপয় আনিল। তার উপর সাদা হাড়ের মুণ্ড রাখিল। তারপর দুই জনে সেই রকম নৃত্য আরম্ভ করিল।"

হেম স্থির হইল। বুঝিলাম রাত্রের সেই অমানুষিক দৃশ্যগুলা তাহার স্মৃতির চক্ষে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে।

হেম বলিতে লাগিল—"আমি নিঃশব্দে পার্শ্বস্থিত বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া শব্দ করিলাম। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে কাষ্ঠের উপর গুলি করিলে যে প্রকার শব্দ হয় সেরকম শব্দ হইল। তারপর সব অদৃশ্য হইল। আমার বিশ্বাস চেয়ারখানা বাস্তবিক পার্থিব চেয়ার। ভৌতিক হইলে কাষ্ঠের শব্দ হইবে কেন?"

আমি মনে মনে ভাবিলাম উষার থিওরিটা নেহাত ছেলেমানুষি নহে।

(৬)

তখনও তৃণাগ্রে শিশির ছিল। নদী হইতে মৃদু মৃদু সমীরণ আসিয়া আমাদিগকে সেবা করিতেছিল। অশ্বত্থ বৃক্ষে বসিয়া একটা হরিয়াল ঘুঘু করুণ বিলাপ গীতে প্রভাতের নূতনত্বটুকু লোপ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

হেম বলিল—কি বল্‌বে ব'লে এখানে নিয়ে এলে?

আমি বলিলাম—মজার কথা। চলো বরং তোমার বাংলায় যাই।

বাংলার বারান্দায় বসিয়া যখন তাহাকে একে একে উষার থিওরিটা বুঝাইয়া দিলাম তখন এক সুন্দর উত্তেজনার ভাব তাহার চক্ষু দুটিকে উদ্ভাসিত করিতে-ছিল। সমস্ত ব্যাপার যখন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল তখন সে লাফাইয়া উঠিয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল—ক্যাপিটেল। এ থিওরিটা ঠিক, তোমার বোন্ ভারি বুদ্ধিমতী।

আমি মনের দুঃখে বলিলাম—কলিকাতা জায়গা আলাদা। মানুষে আবার কল্‌কাতা ছাড়ে। সহরের ছেলেমেয়ে আমাদের চেয়ে অনেক চালাক।

উত্তেজিত ভাবে প্রফুল্ল হেমচন্দ্র বলিল—কিন্তু ভাই বেটাদের ধরবার কি হ'বে?

আমি বলিলাম—সে মতলব আমি খাটিয়েছি। শঠে শাঠ্য কর্‌তে হ'বে।

"কি রকম?"

"এক কাজ কর। আজ রাত্রে বাংলায় আলো জ্বেলো না। যখন তা'রা আরম্ভ করবে, পিছনের দরজা দিয়ে বা'র হ'য়ে অন্ধকারে বেটাদের পায়ে গুলি কর।"

হেম বলিল—বেশ বলেছ। আর ও গুলি খুলি না। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বেটাদের টুঁটি টিপে ধর্‌ব।

আমি বলিলাম—পাগল। এমন কাজ করে? দুষ্ট লোক, হাতে ছোরাছুরি থাকতে পারে, সে বিপদে যাবার দরকার নাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বে হেম সম্মত হইল। তাহার ইচ্ছা একেবারে হাতাহাতি বথশিস দিয়া লোকগুলাকে বিদায় করে।

আমি বলিলাম—উত্তেজিত হ'য়ো না। বাস্তবিক যে মানুষে এ কাজ করছে সেটা আমাদের ধারণা মাত্র। আর এ ধারণাটা বেরিয়েছে একটা বালিকার মাথা থেকে।

হেম বলিল—কিছু ভয় নাই। ও ঠিক ধারণা। আমাদের দেশের স্ত্রী-লোকের উপর আমার শ্রদ্ধাটা বাড়ছে। যদি এ থিওরিটা ঠিক হয় তাহ'লে স্ত্রীবুদ্ধির প্রলয়ঙ্কারিতা সম্বন্ধে আমার ধারণাটার একটা বিপ্লব হবে।

(৭)

সত্য কথা বলিতে কি সে দিন মধ্যরাত্রে অন্ধকার বাংলার জানালা দিয়া যখন নৃত্যশীল নরকঙ্কালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম তখন হৃদয়টা সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদাবৃত হেমচন্দ্র নিকটে থাকিলেও তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে হারাইতেছিলাম।

চুপি চুপি হেম বলিল—তুমি আলো জ্বালিয়া মুখটা যথাসম্ভব ঢাকিয়া বন্দুক হস্তে বারান্দায় গিয়া উপবেশন কর। তোমাকে দেখিলে তাহারা আশ্বস্থ হইয়া নৃত্য করিবে আর আমি পশ্চাৎ হইতে তাহাদের উপহারের ব্যবস্থা করিব।

আমি বলিলাম—দেখো বেশি নিকটে যাইও না। আর গুলি করতো পায়ের দিকে লক্ষ্য করিও।

মদ্‌সদৃশ দর্শক পাইয়া ভূত মহাশয় সুচারুরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শেষে অকস্মাৎ এক চেয়ার বাহির হইল। নরকঙ্কাল তাহার উপর বসিল। অমনি গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল।

শব্দ হইবা মাত্র একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইল। তাহার পর ভূত শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে ছুটিতে লাগিল। চৌকীখানা সেই স্থলে পড়িয়া রহিল।

বিজয় গর্ব্বিত হেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ইংরাজীতে সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল অনুসরণ করিবে কি না, আমি নিষেধ করিলাম।

(৮)

ইনস্‌পেক্টরকে বলিলাম—এ বিষয় একটা কিছু স্থির করিতে হইবে।

মৌলভী হোসেন খাঁ বলিলেন—এবার আমরা তদন্ত করিয়া এ রহস্যের মীমাংসা করিব। আপনাদের কিন্তু ও বাসা ত্যাগ করিতে হইবে।

হেম বলিল—হ্যাঁ, আমি আজই ও বাংলা ছাড়িব।

ইনস্পেক্টর সাহেব আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আমি আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি একবার মনের মধ্যে ভাবিয়া লইলাম। রাত্রেই চেয়ার খানা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়াই রক্তের দাগ ধরিয়া নদীর তীর অবধি গিয়া দেখিলাম সেইখানেই দাগ শেষ হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা আহত লোকটাকে সেইস্থলে শুশ্রূষা করিয়াছিল। তাহার পর যে তাহারা কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সহরের বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষে তৃতীয় দিবসে ব্যাপারটা পুলিসের হস্তে দিয়া আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম।

চুরুট টানিতে টানিতে হেমচন্দ্র বলিল—আচ্ছা এ রহস্যের কারণটা কি? কাহারাই বা এ কাজ করিত আর কেনই বা করিত?

আমি বলিলাম—আমার যতদূর বিশ্বাস লোকগুলার উদ্দেশ্য বাংলাটি খালি রাখা। বোধ হয় একদল দুষ্টলোক ঐ বাংলায় কোনও অসৎ কার্য্য করে।

হেম বলিল—চুলায় যাক। আমি যে একটা বৃথা আতঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি তার জন্যে তোমার নিকট বিশেষরূপে ঋণী।

আমি বলিলাম—আমার নিকট!

হেম অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—অর্থাৎ তোমার ভগ্নীর নিকট। তিনি না বুদ্ধি দিলে তো আমরা কেহই এ রহস্যের মীমাংসা করিতে পারিতাম না।

(৯)

ঊষাকে বলিলাম—শুনেছিস?

ঊষা বলিল—দাদা ও ম্যাজিক না হ'য়ে যায় না। আমি কল্‌কাতায় ও রকম ব্ল্যাক আর্ট অনেকবার দেখেছি। নলিনদা' শিখে ক্রমে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কল্‌কাতার সব ছেলে মেয়ে ওর রহস্য জানে।

বাস্তবিক তাহার কথায় আমার মনে একটা গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। ঘটনাগুলা পূর্ব্বাপর বেশ মনের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিলাম। যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমস্তই অন্ধকার রাত্রে, অন্ধকারের মধ্যে। যখনই সেই সকল স্থলে দীপ লইয়া যাওয়া হইয়াছে তখনই কঙ্কালগুলা অন্তর্ধ্যান করিয়াছে। তাহার উপর যাহা কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদয় শুভ্রবর্ণের। প্রকৃত পক্ষে ইহা হইতেই আমার ভগ্নী ধারণা করিয়াছিল যে কোনও দুষ্টলোক হেমকে শঙ্কিত করিবার জন্য অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা শ্বেত পৈশাচিক বস্তু দেখাইত।

উষার ধারণা করিবার অপর একটি কারণ সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র খণ্ড। লোকটা এবং তাহার সহচরেরা স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া অন্ধকার রাত্রে শ্বেতবর্ণের বস্তু হেমচন্দ্রের দৃষ্টির সম্মুখে লইয়া আসিত। বাংলা হইতে অন্ধকারে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না অথচ তাহাদিগের হস্তস্থিত শ্বেত বস্তুগুলা দৃষ্টিগোচর হইত।

উষাকে বলিলাম—তোর মতে সব ঘটনাগুলার অর্থ করা যায় কিন্তু কঙ্কালগুলা যে অকস্মাৎ অদৃশ্য হ'ত তা'র বিষয় তোর কি বোধ হয়?

বালিকা হাসিয়া বলিল—দাদা সেতো খুব সহজ। লোকগুলার কাছে কালো কাপড় থাকিত। তাহারা বাংলার আলোয় দেখিত হেমবাবু বন্দুক ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেছেন। অমনি একখানা কালো কাপড়ে কঙ্কালটা আবৃত করিয়া অপরদিকে ছুটিত। আবার কাপড়টা তুলিয়া লইলেই কঙ্কাল বাহির হইত।

সত্য হউক মিথ্যা হউক উষার থিওরিটা বড় সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। মনে মনে ভাবিলাম কলিকাতা ছাড়িয়া জঙ্গলে চাকুরী করিতে আসিয়া অনেক বিষয়ে অজ্ঞ হইতে হইয়াছে। সহরে থাকিয়া একটা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার যে জ্ঞান হইয়াছিল সপ্তবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে আমার সে জ্ঞান হয় নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় বলিয়া বোধ হইল।

উষা বলিল—ঐ কালো কাপড়টা পেয়েই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। তা'র পর ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঠিক কর্‌লাম যে এটা ব্ল্যাক আর্ট, ঐ কাপড়টা মেপে দেখ ঠিক একটা মানুষের মুণ্ড ঢাকা যায়। ঐটা চাপা দিয়ে মড়ার মাথাটাকে অদৃশ্য ক'র্‌ত।

(১০)

প্রায় পনের দিন হইল হেমচন্দ্র এ নূতন বাসাটিতে আসিয়াছিল। সেদিন রবিবার। আমরা তাহার গৃহে বসিয়া নানা বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। সহসা সেই গৃহে ইন্‌স্পেক্টার মৌলভী আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিল।

হেম হাসিয়া বলিল—কি মৌলভী সাহেব তদন্তের কি হইল?

মৌলভী বলিলেন—হাঁ্যা বাবু সেই জন্যই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। একবার এদিকে আসুন না।

তাহারা দুইজনে বাহিরে গিয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদ করিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে হেমচন্দ্রের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। পত্রে লেখা ছিল—"মাথায় বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে, একবার আফিসের পর আসিও। বিশেষ প্রয়োজন।"

পত্র পাঠ করিয়া আমার মন্ত্রীদ্বয় পরামর্শ দিলেন যে কালবিলম্ব না করিয়া হেমবাবুর বাসায় যাওয়া উচিত। ভগ্নী বলিল—"ছিঃ দাদা। না গেলে নিন্দা হ'বে। হেমবাবু যে প্রকৃতির লোক আঘাতটা খুব গুরুতর না হ'লে আর অমন কাতরভাবে পত্র লিখিতেন না।"

অগত্যা একগাছি মোটা ছড়ি লইয়া নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে হেমচন্দ্রের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সমস্ত মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া একখানা চার পায়ের উপর শুইয়া একখানা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতটা পড়িতেছে। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিবার ধৈর্য্য হেমচন্দ্রের কখনও ছিল না। নেহাত যখন কাজকর্ম্ম থাকিত না তখন সে দুই একটা সংবাদ অথবা বিজ্ঞাপন পাঠ করিত। সুতরাং বুঝিলাম তাহার আঘাতটা বাস্তবিক তাহাকে শক্তিহীন করিয়াছে। তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখখানাও ঐ ধারণার সাক্ষী দিল।

আমি সাগ্রহে বলিলাম—কি হ'ল? ঐ দশা কে করলে?

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল—সে কথায় আর কাজ কি? মৌলভী না থাকলে প্রাণটা গিয়েছিল।

"কি রকম?"

"কাল সকালে মৌলভী আসিয়াছিল বোধ হয় স্মরণ আছে। আমাকে চুপি চুপি বলিল—'সন্ধান পাইয়াছি; আপনার পরিত্যক্ত নদীর ধারের বাংলাটায় জুয়াখেলা হয়। আজ আমরা সদলবলে রাত্রে সেখানকার লোকগুলাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইব'। বলা বাহুল্য আমি তাহাদের সহিত যাইতে সম্মত হইলাম। মৌলভী বলিল সেই জন্যই সে আমার নিকট আসিয়াছিল। একজন বাহিরের ভদ্রলোক সাক্ষী না থাকিলে তাহার মোকর্দ্দমার সুবিধা হইবে না।"

হেমচন্দ্র একটু চুপ করিল। আমি বলিলাম—তাই বুঝি রাত্রে এই নিগ্রহ হ'য়েছে।

সে বলিল—হ্যাঁ। রাত্রে ৫ জন কনষ্টেবল, দুইজন জমাদার ও ইন্‌স্পেক্টার মৌলভীর সহিত চুপি চুপি বাংলায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। জানালা দিয়া

দেখিলাম ৮।১০ জন লোক কড়ি লইয়া জুয়া খেলিতেছে। আর আমার সম্মুখে একটা লোক বাক্স হাতে লইয়া নাল বা জুয়ার মাশুল লইতেছে। লোকটার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আমি বলিলাম—বোধ হয় তোমারই গুলিতে সে লোকটা আহত হ'য়েছিল।

হেম বলিল—হঁ্যা আমারও সেই সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। যত নিদ্রাহীন নিশা অতিবাহিত করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলাম, সেই পরিমাণে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। পার্শ্বের গৃহ দিয়া হলে প্রবেশ করিয়াই লোকটাকে সজোরে পদাঘাত করিলাম। গৃহে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলমালে একটা লোক পশ্চাৎ হইতে আমার মাথায় এক লাঠী প্রহার করিল। আর একটা লোক একখানা বড় ছুরি লইয়া আমার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম!

হেম বলিল—এই সময় আমার পশ্চাৎ হইতে মৌলভী সাহেব অত্যন্ত সাহসের সহিত পাপিষ্ঠের হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিল। তারপর পুলিসের সহিত লোকগুলার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে আমরা পাঁচজনকে বন্দী করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমি বলিলাম—যে তোমার এদশা করিল সে লোকটা?

হেম সোৎসাহে বলিল—হঁ্যা সে আর যে লোকটা ছুরি মারিতে আসিয়াছিল এবং যে লোকটাকে আমি গুলি মারিয়াছিলাম তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

(১১)

উষার কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছিলাম বটে কিন্তু তাহার মত সদা প্রফুল্লিত স্নেহময়ী কনিষ্ঠাকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হইতেছিল। পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গ ছাড়িয়া চারি বৎসর বিদেশে বাস করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে গৃহের প্রতি কিরূপ গভীর মমতা ছিল। পিতাও এক একটী করিয়া ভ্রাতা বা ভগ্নীকে বরাবর আমার নিকট রাখিয়া দিতেন। উষা আরও কিছুদিন থাকিতে পারিত। কিন্তু হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না বলিয়া তাহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে হেমবাবু আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে

গেলাম

হেম বলিল—এত বিমর্ষ কেন ?

"কাল ভোরে উষা বাড়ী যাবে তার বন্দোবস্ত ক'রছিলাম।"

হেম বলিল—কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবার প্রয়োজন কি ? শীতকাল আসিতেছে এখানে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিবে।

"কেবল স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেতো হবে না। বাবা ওর বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন। একটী ভাল পাত্রও নাকি পাওয়া গেছে।"

হেম একটু নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর অন্য নানাকথা হইতে লাগিল। শেষে হেম বলিল—"তুমি বোধ হয় বিশেষ ব্যস্ত আছ।"

আমি বলিলাম—বিশেষ এমন কিছু না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া হেমচন্দ্র বলিল —"আমার মতে যে সকল পরিবারের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় আছে বিবাহটা সেই সকল পরিবারের মধ্যে হওয়া উচিত।"

আমি বলিলাম—একথা সত্য ; কিন্তু সকল সময় এরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠা যে অসম্ভব।

হেম বলিল—একজন অপরিচিত বালিকাকে বিবাহ করা আমার মতে অত্যন্ত অন্যায়। আমি যদি কখনও বিবাহ করি তাহা হইলে যে বালিকাকে জানি, যাহাকে বুদ্ধিমতী ও উপযুক্ত বোধ করি তাহাকে বিবাহ করিব।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলাম। মনে হইল বোধ হয় এই সময় হেমকে বলিলে সে উষাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। স্নেহের ভগ্নীটিকে একটা অপরিচিত লোকের হস্তে না দিয়া বন্ধু হেমচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে বড়ই সুখের হইত। হেমেরও দুঃসাহসিক স্বভাবটা কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। কিন্তু ভয় হইতে লাগিল পাছে হেমের নিকট প্রস্তাব করিলে সে আমাকে স্বার্থলোলুপ নীচ বলিয়া মনে করে।

ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তবে আসি।

আমি ভাবিলাম—এই ত সময়। বন্ধু যাহা ভাবে ভাবুক, আমি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব না।

আমি বলিলাম—হেম যদি কিছু মনে না করে তবে একটা অনুরোধ করি।

সোৎসুক নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হেম বলিল—কি বল ?

আমি বলিলাম—হেম আমাদের বন্ধুত্ব বহুদিনের। উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেটা দৃঢ়ীভূত করা আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার কোন আপত্তি আছে ?

লজ্জিতভাবে বলিষ্ঠ হেমচন্দ্র বলিল—"হাঁ আমিও তাহা চিন্তা করিয়াছি, যদি ভাল পাত্র না পাওয়া যায়———"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—হেম ভাল পাত্র আবার কি? বাবাকে তাহা হইলে লিখিব তোমার সম্মতি আছে।

হেম গম্ভীর ভাবে বলিল—ভূতবেটারা আমাকে একটা বিষম ভাবনা দান করিয়া গিয়াছে। আমি বিবাহ করিব কি না একথা আজকাল সর্ব্বদাই চিন্তা করি। ক্ষমা করিও ভাই বিবাহের চিন্তা হইলেই তোমার ভগ্নীর চিন্তা তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে ভূত তাড়াইয়াছে তাহাকেই বিবাহ করিয়া এ ভূতের দানটাকেও তাড়াই।

* * *

পরদিন বন্দোবস্ত মত লীলার দ্বারা উৎপীড়িতা হইয়া সলজ্জ উষা বাড়ী গেল। স্ত্রীকে বলিলাম—বাবার চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়েছ ত?

রসিকা লীলাবতী হাসিয়া বলিলেন—দু'পয়সা বাঁচিয়েছি। চিঠিখানা উষার হাতে পাঠিয়েছি। সে বেচারা জানে না চিঠিতে কি লেখা আছে। বাবা পড়িয়া দেখিবেন মেয়ে নিজের বিয়ের সংবাদ নিজেই এনেছে।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—ছিঃ লীলা তোমার বুদ্ধি হ'বে কবে?

মুখরা স্ত্রী উত্তর করিল—পূর্ব্বে স্বামীর হ'ক পরে স্ত্রীর হ'বে।

[সমাপ্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

উপেক্ষিত।

গিয়াছি ভুলিয়া সে সুখ দিবস
যবে হে তুমি দিয়েছিলে দেখা,
আজিও ঝঙ্কারে শ্রবণ কুহরে
তোমার সেই বাণী মধুমাখা।
পুত বিশ্বপ্রেম দিয়াছ শিখায়ে
জগতজনে তুমি ভালবাসি
তাই ওগো নাথ এ বিশ্ব জগৎ
আমি আপনা করিতে প্রয়াসী।
হায়! যারে চাই করিতে আপন
সে যে দূরে যায় না চাহি ফিরি!
নিরাশ পরাণ কাঁদে—নিরাশ হৃদয়
নিরাশ জীবন রহিল পড়ি।
ক্ষুদ্র স্বার্থ হায়! ভালবাসি' সবে
জীবনের সাথী করিয়া লয়
ক্ষুদ্র গণ্ডী তার করিয়া আপন
আঁধারে আঁধারে ঘুরিতে রয়।
ক্ষুদ্র আমি নাথ পারিনা সহিতে
দাও শ্রীচরণ বিশ্ব প্রণয়ি
দাও শিক্ষা মোরে যেন হতে পারি
বিশ্বজনের হৃদয়-বিজয়ী।

শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

(১)

ক্ষত্রিয় যুবা রণবীর সিং
রুধির করিতে পান,
ফিরিছে পথে বাবর সাহের
নাশিয়া আজি প্রাণ!
ভারতবর্ষ বিজয় করি'
বাবর সাহা দেশের অরি—
তাহার রক্তে আজিকে যুবক
শুধিবে মাতৃ ঋণ!
প্রতিহিংসা—বিষের জ্বালায়
সে ঘুরিছে নিশিদিন!

(২)

হিন্দু আমরা, স্বদেশ মোদের
পুণ্য হিন্দুস্থান—
হেথায় আসি' মোগল বসি'
গাহিবে বিজয় গান!
হীনের মত চেয়ে রব!
দীনের মত ভিক্ষা লব!
ক্ষত্রিয় হ'য়ে লইব শেষে
মুসলমানের দান!
মোগল পতির শোণিতে আজি
করিব পুণ্য স্নান!

(৩)

তীক্ষ ছুরিকা বক্ষে লুকায়ে
ফিরে পথে রণবীর—
কোথায় বাবর—বক্ষ তাহার—
কোথায় মোগল বীর!
সহসা ব্যাকুল পথিকের দল—
রাজপথ মাঝে মহা কোলাহল;
প্রাণভয়ে সবে ছুটিছে বেগে
হেরিয়া মত্ত হস্তী,—
যে পথে যে পায় ছুটিছে সবেগে
যতটুকু যার শক্তি!

(৪)

অদূরে আসিছে মত্ত মাতঙ্গ
ভীষণ মূর্ত্তি রুদ্র—
পথের মাঝে পড়িয়া শুধু
শিশু এক অতি ক্ষুদ্র!
দূর হ'তে শুধু কোলাহল উঠে,
"শিশু বুঝি ওই মারা যায় মাঠে!"
কেহ বা কহিল, "বাঁচাব আমি
আমি যে বীর ক্ষত্র!"
রোধিল কেহ "পূজায় যাবে
ছুঁয়োনা মেথর-পুত্র!"

(৫)

জনস্রোত ঠেলি নিমেষে এক
পথিক বলবান,
বক্ষে তুলিয়া লইল শিশু
বাঁচিল তাহার প্রাণ!
ভাবে রণবীর কে এই পান্থ!
চেয়ে দেখে মুখ করুণ শান্ত!
কহিল আবেগে "চিনেছি প্রভো!
কেন এ ছদ্মবেশ?
বধিতে তোমারে হে রাজন্
ফিরিয়াছি দেশ দেশ!

(৬)

"লহ এ ছুরিকা, লহগো প্রাণ
হে ভারত ঈশ্বর!
লুপ্ত হোক এ ঘাতক হীন
উজ্জ্বল হোক অম্বর!"
করুণ নেত্রে চাহিয়া স্থির,
হাসিয়া কহিল মোগল বীর
"তুচ্ছ প্রাণ করিতে দান
তুমিই পেয়েছ শিক্ষা?
আজি হ'তে হলে পার্শ্বচর
কর গো আমারে রক্ষা!"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

৫ম বর্ষ।] মাঘ, ১৩১৫। [১২শ সংখ্যা।
January 1909

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র নাই।

দুইখানি পত্র।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্

বন্ধুবরেষু

ভাই কেশব,

তোমাদের পাঁচজনের অনুরোধেই বিগত পাঁচ বৎসরকাল আমি "অর্চ্চনা"র সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। বিধাতার আশীর্ব্বাদ, সাধারণের অনুকম্পা ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্রের ন্যায় সুযোগ্য সহকারীর অভাব হইলে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। উপস্থিত সাংসারিক গোলমালে আমি কিরূপ বিপর্য্যস্ত তাহা তুমি বিশেষরূপে জান সুতরাং এক্ষণে আমি অর্চ্চনার সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে অপারগ। অতএব আশা করি, তুমি বা আমার বন্ধুগণের মধ্যে অপর কেহ আমার পদত্যাগে আপত্তি করিবেন না।

তুমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও আমা অপেক্ষা অনেকাংশে যোগ্য; তোমার হাতে "অর্চ্চনা" পড়িলে অর্চ্চনার আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সুতরাং তোমাকেই আমি 'অর্চ্চনা'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। আশা করি, তুমি আমায় বিফলমনোরথ করিবে না। ইতি ১লা মাঘ, সন ১৩১৫ সাল।

অভিন্নহৃদয় বন্ধু

জ্ঞানেন্দ্র।

পুঃ—পত্রখানির নকল ছাপাখানায় পাঠাইলাম।

জ্ঞান।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সুহৃদবরেষু,

ভাই জ্ঞান,

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইলাম। তুমি 'অর্চ্চনা'কে 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি' করিয়া আমাকে 'দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ' করিবার ভার অর্পণ করিতে চাহিয়াছ! তোমার অবস্থা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি ১লা মাঘ, সন ১৩১৫ সাল।

তোমার

কেশব।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

আকবর সাহ।

যেমন বিলাসশয্যায় শয়ন করিয়া সম্রাট আকবর অশেষ প্রকার আমোদ কৌতুক উপভোগ করিতেন তেমনি আবশ্যকমত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। পূর্ব্ববর্ণিত শীকার কাহিনী হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে তিনি বেশ কর্ম্মঠ ও ব্যায়ামশীল ছিলেন। খ্বজা ময়িনুদ্দিন চিস্তি সাহেবকে আকবর অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে চিতোর পরাজয় করিবার পূর্ব্বে সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যদি কার্য্যে সফলকাম হয়েন তাহা হইলে তিনি পদব্রজে পীর চিস্তির সমাধি মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করিবেন। বলা বাহুল্য, চিতোর যুদ্ধের অবসানে সম্রাট প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আগ্রা হইতে আজমীর পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইং ১৫৭০ খৃঃ অব্দে সাহজাদা সলিমের জন্ম সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া আকবর পদব্রজে আগ্রা হইতে আজমীরে উক্ত সমাধিস্থলে যাত্রা করিয়াছিলেন। ৯৪১ হিঃ অব্দে তিনি দ্রুত অশ্বারোহণে এককালে ৭০ মাইল গমন করিয়াছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা তবকাতে আকবরী, আকবরনামা ও বাদাউনীর ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এরূপ কার্য্যতৎপরতার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনীতে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

আকবরের দয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা। প্রতিদিন সহস্র সহস্র নিরন্নকে অন্ন দান করিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের বিধান করিয়া,কাতর ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি অজস্র পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। আবুলফজেল বলেন তিনি আপনাকে ওজন করিয়া সেই পরিমাণের স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদিগকেও তৌল করিয়া তিনি সে অর্থ বিপন্নকে দান করিতেন। তাঁহার দান বিভাগের জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। তাঁহার প্রাত্যহিক অর্থদান ব্যতীত সম্রাট নানা ব্যক্তিকে বৃত্তি ও ভূমি দান করিতেন। সাধারণতঃ ঐ সকল লোক চারি ভাগে বিভক্ত হইত। ১ম বিদ্বান ব্যক্তি ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ। ২য় যে সকল লোক সংসার ত্যাগ করিয়া-

ছেন। ৩য় যে সকল আর্ত্ত ব্যক্তি দান ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। ৪র্থ যে সকল লোক সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অদৃষ্ট দোষে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না অথচ লোকলজ্জার ভয়ে সামান্য কার্য্য করিয়াও বংশমর্য্যাদার হানি করিতে পারে না। ঐসকল ব্যক্তিকে সম্রাট সময়ে সময়ে নগদ মুদ্রার বৃত্তি বা ওজিফা প্রদান করিতেন এবং সময়ে সময়ে মিল্ক বা মদদমাস সর্ত্তে ভূমি দান করিতেন।

কিন্তু এই সৌম্যমূর্ত্তি দয়ার্দ্র হৃদয় আকবর সাহ সময়ে সময়ে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনার ধমনী মধ্যস্থ অদম্য তাতার রক্তের পরিচয় দিতেন। পূর্ব্বে তাঁহার দ্বারা আদমখাঁর নিগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পুরাতন অমাত্য বয়রামখাঁর জীবনের শেষ দশা স্মরণ করিলেও ঐ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। আসাদ বেগ কর্ত্তৃক আপনার ওয়াকায়া নামক ইতিহাসে বর্ণিত নিম্নলিখিত গল্পটী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় আকবরের ন্যায় কৃতবিদ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ মনীষির পক্ষেও কাম ক্রোধাদি রিপু জয় করা দুঃসাধ্য ছিল। সন্ধ্যার সময় প্রার্থনা বন্দনাদি করিয়া তিনি একবার বিশ্রামাগারে গমন করিতেন। সেই সময় তাঁহার অনুচরবর্গও যথেচ্ছা গমনাগমন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিত। আবার সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হইয়াছে অনুমান করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে তৎপর হইত। একদিন সম্রাট দক্ষিণাত্যের যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া শীঘ্র বিশ্রামাগার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সভায় আসিয়া তিনি একটীও ভৃত্যকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল একটিমাত্র ফরাস সর্পের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া এক কোণে নিদ্রা যাইতেছিল। এদৃশ্যে আকবর ক্রোধে অধীর হইয়া সেই হতভাগ্য ফরাসটাকে প্রাসাদ শিখর হইতে নীচে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। হতভাগ্য প্রাসাদ শিখর হইতে পড়িয়া সহস্র খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

আবার কর্ত্তব্যের অনুরোধেও আকবর সময়ে সময়ে কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার পুত্র সলিম তাবত পিতৃগুণে ভূষিত ছিলেন না। উদ্দাম যৌবনের মধুর প্ররোচনায় তিনি প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য পথ বিচ্যুত হইতেন। আনফাউল আকবর নামক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে একদা সম্রাট দশ দিন তাঁহাকে একটা স্নানাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় আকবরের

মাতৃবিয়োগ হওয়ায় সাহজাদা পিতার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে চাহিলে, পারিবারিক স্নেহবন্ধন কর্ত্তব্যের কঠোরতাটাকে শিথিল করিয়াছিল। ফলে যুবরাজ মুক্তি পাইলেন।

যদিও ইউরোপ এবং এসিয়ার পশ্চিমের দুই একটী প্রদেশে তামাক ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তথাপি এতাবৎ কাল ভারতবর্ষে তামাকের প্রচলন ছিল না। ইতিবৃত্তকার আসাদ বেগ সম্রাটাজ্ঞায় বিজাপুরে দৌত্য করিতে গিয়া তথায় তামাক দেখিতে পান। তিনি আকবরকে উপহার দিবার জন্য নানাপ্রকার নূতন নূতন দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্য তিনি কতকটা তামাক সংগ্রহ করিলেন। তিনি হীরামুক্ত খচিত একটী সটকা নির্ম্মিত করাইলেন। তাহার নলটি চীন দেশজাত কাষ্ঠের প্রায় তিন হাত লম্বা এবং দুই মুখে উত্তমরূপে হীরকাদিদ্বারা মণ্ডিত। যামান প্রদেশ জাত ডিম্বাকার প্রস্তরের একটি মুখনল করিয়া তিনি তাহাতে সন্নিবেশিত করিলেন এবং সটকার মুখে একটি স্বর্ণের কলিকা নির্ম্মিত করিলেন। তিনি বিজাপুরের আদিল সাহের নিকট একটি তাম্বুল রাখিবার সুদৃশ্য কৌটা পাইয়াছিলেন। সম্রাটের জন্য তিনি তাহাতে তামাকুপত্র ভরিলেন। সমস্তটি একটি রজত থালে রাখিয়া তিনি সম্রাট সমীপে অপরাপর উপঢৌকনের সহিত রক্ষা করিলেন।

সভাসদজন পরিবৃত হইয়া সুলতান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপঢৌকন গুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্মিতভাবে তাম্রকূট নলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। আসাদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার প্রত্যেক উপহারটিই কৌতুকপ্রদ ও সুন্দর কিন্তু এ উপহারটা কি তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না।"

নবাবখাঁই আজাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"জাঁহাপনা, এ দ্রব্যের হিন্দুস্থানে প্রচলন নাই সত্য, কিন্তু মক্কা ও মেদিনায় লোকে তাম্রকূট সেবন করে। ইউরোপীয় বিজ্ঞেরা এ দ্রব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করে এবং তাহারা ইহা ব্যবহার করে।"

রাজাজ্ঞায় আসাদবেগ সম্রাটকে তামাকু সাজিয়া দিলেন। তিনি সুন্দর কারুকার্য্য নির্ম্মিত নলটি যেমন মুখে লাগাইতে যাইবেন অমনি রাজসভায় রাজ-বৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যগ্রভাবে হকিম বলিলেন—"সাহানসাহ ও অপরিচিত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট করিবেন না। অস্মদ্দেশে ও দ্রব্যের প্রচলন নাই। উহার কি দোষগুণ তাহা আমরা জানি না। বৃথা বিপন্ন হইবার আবশ্যক কি?"

আকবর একটু হাসিয়া দুই তিন টান টানিয়া নলটি নবাব খাঁই জামানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া টানিতে লাগিলেন।

রাজবৈদ্যকে আসাদ বলিলেন—হকিম সাহেব ইউরোপে আজকাল তামাকুর যথেষ্ট প্রচলন আছে। তাহাদের চিকিৎসা পুস্তকেও ইহা যথেষ্টরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে, সুপণ্ডিত ও মেধাবী লোকের অভাব নাই।

রাজবৈদ্য বলিলেন—ইউরোপীয়গণ ইহার পক্ষপাতী বলিয়া আমরা ইহার পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমাদের পুস্তক বা দেশাচারে তামাকুর স্থান নাই।

এইরূপ তর্কবিতর্কের আকবর মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"একটা দ্রব্যের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু জানি না বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অস্বীকৃত হওয়া মূর্খতা। যাহা ভাল তাহা সকলদেশে সকল সময়ে সকল ব্যক্তির পক্ষেই ভাল। নূতন রীতিনীতির প্রবর্ত্তনকেই উন্নতি বলা হয়। সুতরাং তামাকু সেবন পদ্ধতি যদি হিতকর হয় তাহা হইলে নূতন বলিয়া ইহা বর্জ্জন করা বিধেয় নহে।"

সেই অবধি হিন্দুস্থানে তামাকু সেবন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল।

—ওয়াকায়া।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় সম্রাট আকবরের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ তখন গোয়ায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে সময় ভারতবর্ষের সহিত চীন ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। সম্রাটের পোষাক ও চিত্রশালার বর্ণনায় পাশ্চাত্য পণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে আকবর হাজী হবীব নামক একজন কর্ম্মচারীকে গোয়ার শিল্প-বাণিজ্যের তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন। হবীব তথাকার বস্ত্রাদি ব্যতীত গোয়া হইতে একদল পর্ত্তুগীজ বাদ্যকর লইয়া আসিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাদের অর্গান বাদ্যে বড় প্রীত হইয়াছিলেন।

অপর এক সময় বাঙ্গালা হইতে একজন ইউরোপীয়ন ও তাহার পত্নী আসিয়া আকবরের সভায় উপনীত হয়েন। কিন্তু আকবরনামায় তাহাদের

যে নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহাদের জাতীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইউরোপীয়নটি তদানীন্তন কালের বেশ সঙ্গতিপন্ন বণিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার নাম পর্‌তাব বার্‌ এবং তাহার পত্নীর নাম নাকি বসুর্বা। সম্রাট তাহার বুদ্ধিমত্তায় বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের পঞ্চত্রিংশ বর্ষে পাদ্রী ফরমলিডন্‌ নামক অপর একজন পর্ত্তুগীজ আকবরের সভায় উপনীত হইয়াছিল। পাদ্রী বেশ সুপণ্ডিত ও সদ্বক্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট কতকগুলি যুবককে তাঁহার অধ্যাপনায় রাখিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক কতকগুলি সারগর্ভ ইউনানী (গ্রীক) গ্রন্থ অনুদিত করিয়া লইয়াছিলেন। পাদ্রী ফরমলিডনের সহিত অনেকগুলি ইউরোপীয় যুবক ও আরমানী সুলতানের সভায় আসিয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভুল।

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া দিনকতক উৎসব আনন্দে সহপাঠী ও বন্ধুবর্গের ঠাট্টাফ কাটিয়া গেল। হরেণকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইল। পূর্ব্বেকার চাপল্য ভাব অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রকাশ করিতে পারিল না; অনেকটা হঠাৎ ভাল ছেলের মত হইয়া রহিল।

হরেণের আগমন-বার্ত্তা তাহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। একটা মহা কাব্যের ন্যায় তাহারা এই ঘটনাটী আলোচনা করিতে লাগিল, এবং শীঘ্রই ইহার সত্য এবং অসত্য ন্যায় এবং অন্যায় ও গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। অধিক উৎসাহিতেরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল এবং পশ্চিম ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। এই সব সৌখ্যতা তাহার অসহনীয় ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। সে তাহাদের সহিত আলাপ বন্ধ করিয়া দিল, এবং ভ্রূ-কুঞ্চন, আরক্ত চক্ষু, গম্ভীর বিরস বাক্য প্রভৃতি অস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত করিয়া, ফোর্ট উইলিয়মের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মত গৃহকোণে অধিষ্ঠান করিতে

লাগিল। পশ্চিমের কথা প্রসঙ্গেই তাহার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয় তাহাতে কোন প্রকার হাস্য-রস সম্ভবে না। প্রসঙ্গ মাত্রেই তাহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা উপস্থিত হইত। আপনার কাছে আপনাকে অত্যন্ত তুচ্ছবোধ করিত এবং সময়ে সময়ে উমার সম্বন্ধে তাহার নিশ্চেষ্ট ভাবকে ধিক্কার দিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে ক্ষণিক উত্তেজনা ব্যতীত আর কিছুই ফল হইত না।

হরেণের পিতা ধনী এবং মান্য গণ্য ভদ্রলোক, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্পদের অভাব ছিল না। ইহার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কাশীর সেই দরিদ্র কুটীর সামান্য তৈজস পত্রাদি হরেণের নিকট অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যোদ্ভুত গর্ব্ব শীঘ্রই আপন প্রভাব তাহার উপর বিস্তার করিল। কাশীর সেই পর্ণকুটীর অপেক্ষা তাহাদের বাগানের মালী অনেক ভাল ঘরে থাকে, সেই সামান্য গৃহে, হীন অবস্থায় তিনি কেমন করিয়া ছিলেন, তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইলেন। তিনি কি ভুলই করিয়াছিলেন! কি মোহেই না জানি বিজড়িত ছিলেন! তাহার জীবন ইতিহাসের এই পৃষ্ঠাটা কি মুছিয়া ফেলা যায় না?

হরেণ পূর্ব্বে কখন স্ত্রীজাতিকে সম্যকরূপে দেখে নাই। উমাকে যখন দেখিয়াছিল তখন রূপের বিচার করিবার অবকাশ ছিল না। পলাতক মনটা, শান্তির তৃষ্ণায় যাহা কিছু সম্মুখে পাইয়াছিল তাহাই শীতল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার কাঙ্গাল বাসনা উমাকেই দুর্লভজ্ঞানে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার যৌবন উৎস সেইখানেই উন্মুক্ত হইয়া এখন খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্যলালসা এখন বড়ই বেগমান। তাই, সে যেন স্ত্রীজাতিকে নূতন করিয়া দেখিল। ধনী গৃহে, গর্ব্বোজ্জ্বল, লাবণ্যময়ী, অলঙ্কার মুখরিত হাস্যোস্ফীত সম্পদ কন্যাগণের পূর্ণায়তনের প্রভাবে, দরিদ্র পালিত উমার মলিন মুখ, নিরাভরণ ক্ষীণাঙ্গ তাহার স্মৃতি হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া কম্পমান অস্পষ্ট ছায়ারূপে পরিণত হইল।

(৭)

হরেণের মাতা, পুত্রের বিবাহ দাও বলিয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন। জননীর স্নেহপূর্ণ মনটি সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিত পাছে হরেণ আবার তাঁহাদের মায়া কাটায়। হরেণ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে এখন পূর্ব্বেকার চাপল্য ভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, উচ্চ হাস্য নাই, নির্জ্জনে

থাকিতে ভালবাসে, কিছু অন্যমনা, কিছু ভারাক্রান্ত। মাতার সতর্ক দৃষ্টি এ সমস্ত লক্ষ্য করিল। দেখিলেন পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইতেছি না। ঠিক যেখান হইতে বিযুক্ত হইয়া গিয়াছিল সেখানে যেন মিশ খাইতেছে না। সুতরাং ছেলেটিকে বিশেষ কিছু বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে স্থির করিলেন। বিবাহ হইলে সে আর কোন রকমে শিকলি কাটিবে না, ইহা মনে করিয়া স্বামীর কাছে পুত্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তিনিও এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

যাহাদের ধন আছে, ঐশ্বর্য্য সম্পদ আছে তাহাদের পুত্রকন্যার, বিশেষতঃ পুত্রের বিবাহের জন্য ভাবিতে হয় না। শীঘ্রই রূপলাবণ্য সম্পন্ন কোনও এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যার সহিত হরেণের বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

হরেণের কর্ত্তব্য বুদ্ধি এই সময় একবার বড় সজাগ হইয়া উঠিল। বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই হরেণ অস্থির হইতে লাগিল। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে করিল সমস্ত কথা পিতার নিকট প্রকাশ করি, কিন্তু পরক্ষণেই এই কথা প্রচার হইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হইবে, এবং বাড়ীতেই বা কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এবং লজ্জা ও ধিক্কারে তাহাকে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে, এই সমস্ত চিন্তা প্রহরীর মত তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রহিল। অবশেষে যখন বুঝিল সে কোনও রূপ স্থিরতায় উপস্থিত হইতে পারিবে না, তখন কর্ণহীন তরণীর ন্যায় আপনাকে ঘটনা স্রোতে ভাসাইয়া দিল।

একদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত চিরপ্রথা মতে হরেণের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল এবং পরদিন সকালে একটি অলঙ্কার মণ্ডিত পূর্ণাঙ্গী চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সপ্তাহকাল পতিগৃহে বাস করিয়া নব পরিণীতা মনোরমা পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইহার পর হরেণ কয়েকবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, পুনরায় পূজা আগত হইলে মনোরমাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিল।

পূজা হরেণের নিকট কি স্মৃতি আনয়ন করিল তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু কয়দিন তাহাকে বড়ই অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখা গেল। বাড়ীতে সকলেই পূজার উৎসবে মগ্ন, কেহই সে ভাব লক্ষ্য করিল না।

অদ্য বিজয়া। অদ্য হরেণের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, কি একটি অমঙ্গল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছে।

গত বিজয়ার দিন, এইরূপ একটি আশঙ্কা, একটী ভয় হৃদয় বিচলিত করিয়াছিল, আজ কি তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। উমার সহিত পুনর্মিলনের আশা অল্প। তাহার প্রতি যে নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিত নির্দ্দয় ব্যবহার, যে কাপুরুষতা করা হইয়াছে তাহার মার্জ্জনা কোথায়। হরেণ জানিত এখনও এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই ; কিন্তু কি করিয়া উহা সম্পাদন করিবে তাহা ভাবিতে পারিল না ; অথবা কাপুরুষ যে তাহার এত হৃদয় কোথায়। অন্যদিকে এত পাপ, এত চিন্তা বহন করিয়া সে মনোরমার কাছেও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রেম কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া গিয়াছে। তাহাদের দাম্পত্য লীলার মধ্যে কিসের একটী ব্যবধান, একটী অভাব, একটী দূরত্ব আপন নির্ব্বাক রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিল। মনোরমাও এতদিন পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম নিবেদন করিয়া দিতে পারে নাই। তাই বলিয়া তাহার ভালবাসার কোনও অভাব ছিল না। সে স্বভাবতঃই কিছু স্বল্পভাষী ও গম্ভীর ভাবাপন্ন ছিল, হরেণ বুঝিতে না পারিয়া ভাবিত বুঝি তাহার মনে কি একটী সন্দেহ জাগিয়াছে, বুঝি সেই সন্দেহের বশে তাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে পারিতেছে না ! এই সব কারণে হরেণ তাহার সহিত একটু ভীতচিত্তে আলাপ করিত। ভয় হইত যদি সমস্ত কথা তাহার গোচর হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যত্ন, আদর, সোহাগ তাহার নিকট কিরূপ বীভৎসতা প্রকাশ করিবে ; তাহাকে কতই নারকীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে।

হরেণ দুই দিকেই মরুভূমি দেখিতেছিল। উমা দুষ্প্রাপ্য এবং মনোরমাকেও আকুল বাহু প্রসারণের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিতেছে না। সে চারিদিকে কেবল বিকট অশান্তি ঘোর শূন্যতা অনুভব করিতেছিল।

(৮)

এরূপ মহা শূন্যতা কেহই অধিক দিন বহন করিতে পারে না, হরেণও পারিল না, একটু কিছু অবলম্বনের জন্য প্রাণ স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আজ, বিজয়ার দিন, স্থির করিল যেমন করিয়া হউক সমস্ত জড়তা ভঙ্গ করিবে। আজ সকল বাধার শেষ কোনও ব্যবধান থাকিতে দিবে না। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া, প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়া সে হৃদয় পূর্ণ করিবে।

সে যখন শয়ন করিতে যাইল তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, বিছানায় প্রস্ফুটিত যৌবনা মনোরমা, জোছনায় মগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। হরেণ

তাহাকে জাগাইল না, ধীরে ধীরে পার্শ্বে যাইয়া করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া শুইয়া রহিল। এক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বিজয়ার দিনে সে এইরূপ অবস্থাতেই উমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল। স্ফটিক জ্যোৎস্না এইরূপেই উমার গাত্রে শান্তির স্নিগ্ধতা বিছাইয়াছিল। তাহার কিছু দিন পরেই সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! এখন সে কি অবস্থায় আছে! তাহার এই নির্দ্দয় ব্যবহার, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি শেলই না জানি বিদ্ধ করিয়াছে! আর তাহার সেই বৃদ্ধ পালক-পিতা, সেও কি এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়াছে! হায়! কেন সে এমন ভুল করিয়াছিল, কেন সে পূর্ব্বে ভাবে নাই; যদিই ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিল না কেন? সেই ক্ষুদ্র বালিকাটিকে কেন সে নির্ম্মমতার কঠিন শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া আসিল?

হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া জানালায় আঘাত করিল, একটা হু হু শব্দ বাহির দিয়া বহিয়া গেল, হরেণের মনে লইল বায়ু দূর দেশান্তর হইতে করুণ বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের একটি শেষ উচ্ছ্বাস তাহার কাছে পৌঁছিয়া দিয়া আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। হরেণ অনেকক্ষণ এই সব ভাবিল, ভাবিয়া যখন তাহার হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অধিক হইল তখন আর থাকিতে পারিল না, উন্মত্তের ন্যায় মনোরমাকে আলিঙ্গন করিয়া গাঢ় চুম্বন করিল, যেন তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া উমার প্রতি নির্দ্দয় অবহেলার স্খালন করিতে চায়। মনোরমা জাগরিত হইল, মনে করিল হরেণ তখনই জাগরিত হইয়াছে; সেই সময় পূর্ব্বদিক রক্তিম আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল, উহার সহিত রাত্রের কুহক, কাল্পনিক আশঙ্কার মত্ততা হরেণের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া গেল, তাহার আশা হইল মনোরমা আজ হইতে তাহার কাছে প্রকাশিত হইবে, তাহারা নিকটতর হইয়া সুখে থাকিতে পারিবে।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর একটা কিসের কোলাহল শুনিতে পাইয়া হরেণ সশঙ্কচিত্তে বাহিরে আসিল। নীচে নামিয়া বাহির দরজায় আসিয়া দেখিল কাহাকে ঘিরিয়া চাকরেরা কথা কহিতেছে। আরও নিকটতর হইয়া দেখিল শুভ্র জটাশ্মশ্রুধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহার হস্ত অবলম্বন করিয়া পার্শ্বে—কে? উমা মূর্চ্ছিত হইয়া হরেণের চরণতলে পতিত হইল। গোলমাল করিয়া চাকরেরা কর্ত্তাকে ডাকিয়া আনিল। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া কি বলিল এবং দুইবিন্দু তপ্ত অশ্রু মোচন করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

নিথর নিশ্চল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হরেণ যেন নিম্নে মৃতকল্প উমাকে দেখিতেছিল।

সে স্থান হইতে নড়িবার ক্ষমতা নাই, নয়ন তুলিবার ক্ষমতা নাই। ব্রাহ্মণ কখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হইতেছে সেই রুদ্রকল্প ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি অগ্নি বৃষ্টি করিতেছে।

উমার মূর্চ্ছাভঙ্গের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। এতদিন সে মরিত, কিন্তু হরেণকে—স্বামী দেবতাকে, একবার না দেখিয়া কেমন করিয়া মরিবে? শরবিদ্ধ মৃগ যেমন মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া ত্বরিত, চিরশান্তিপূর্ণ লতা গুল্মবেষ্টিত আপন আবাসস্থলে মৃত্যুর শয়ন রচনা করে উমাও সেইরূপ তাহার জর্জ্জরিত ভগ্নহৃদয়-টীকে বহুকষ্টে বাঁচাইয়া রাখিয়া বহন করিয়া আনিয়া হরেণের চরণ প্রান্তে ফেলিয়া দিয়াছে। যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, এতদিন যাহা নিদারুণ আতিশয্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী স্বামীর চরণপ্রান্তে শিথিল করিয়া দিয়াছে। আর তাহার জীবিত থাকিবার আবশ্যক নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ হইয়াছে।

হরেণের পিতার আদেশে, উমাকে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল, এবং চিকিৎসার উত্তম ব্যবস্থা করা হইল। মনোরমা সব শুনিল। শুনিয়া স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া উমার শুশ্রূষার সমস্ত ভার আপনি লইল। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বুঝি সে মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রসর হইতে উমাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে চাহিল।

হরেণ একদিন সন্ধ্যায় স্তিমিতালোকিত রোগীর গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, দূর হইতে সেই শায়িত আসন্ন মৃত্যুর মূর্ত্তি দেখিল, সেখানে মনোরমা হস্তে মস্তক স্থাপন করিয়া রোগীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। উমার আগমনের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ। মনোরমা তাহাকে কিছু বলিল না। একবারমাত্র হরেণের মুখের দিকে চাহিল। সেই চক্ষে হরেণ দেখিল তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা, সমস্ত পুরুষজাতির উপর একান্ত অবিশ্বাস এবং রমণীর অনন্ত ক্ষমা ধৈর্য্য। দেখিয়া যেমন আসিয়াছিল সেইরূপ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

একদিন প্রত্যুষে উমার মৃত্যু হইল। মনোরমার বদনে চিরকালের মত কালিমাময় গাম্ভীর্য্য স্থাপিত হইল। ইহার পর হরেণ তাহার হৃদয় উন্মুক্ত করিতে আর কখনও প্রয়াস পায় নাই। তাহাদিগের মধ্যে জনমের মত একটি মৃত্যুর ব্যবধান রহিয়া গেল।

শ্রীচন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দরিয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশ।

পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলিতে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সরস্বতীর ত্যাগস্বীকার যে অতুলনীয়! আয়েষা তিলোত্তমার নিকট জগত-সিংহকে "তোমার" বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই,—কিন্তু সরস্বতী প্রেমের মহান্ আহ্বানে আহুত হইয়া সংসার সাগরের যে শুকতারা, জীবনপথের যে বিশ্রাম স্থান, সংসারারণ্যের যে প্রাণারাম কুটীর, হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে আশা, আশায় যে সুখ, সুখে যে সেই, সেই হৃদয়সর্ব্বস্বের বারবনিতা উজ্জ্বলার দাসত্ব স্বীকার করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হন নাই। এবং শুধু ইহাই নহে, এমন কি যখন অলর্কের সহিত উজ্জ্বলার কলহ হইয়া বিচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইত, তখনও তিনি তাঁহাদের মিলন করিয়া দিয়া প্রেমের যাহাতে পরমা তৃপ্তি তাহাই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আয়েষার প্রেমে আমরা যেমন দীর্ঘ-শ্বাসের গভীর কাতরতা অনুভব করিতে পারি, সরস্বতীর প্রেমে কিন্তু আমরা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। সরস্বতীর প্রেম আর কিছুই চাহে না, সে চায় কেবল মাত্র তাহার—নারীর যাহা সার পদার্থ—সেই স্বামীসন্দর্শন ও তজ্জনিত অপার আনন্দ। সরস্বতীর অলর্ককে দেখিয়া আশা মিটিত না। তাঁহার সদাই ইচ্ছা হইত, যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু ফুটিয়া উঠুক, আর তিনি সেই চক্ষু দিয়া অলর্কের রূপ পান করেন। তাঁহার হৃদয় যেন রাত্রি দিনই বলিত :—

"জনম অবধি হাম্ ও রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

যখন মাধব সরস্বতীর ন্যায় কুলবালার পক্ষে প্রকাশ্য স্থানে আগমন করা অসঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তখন সরস্বতী স্বকার্য্য সমর্থনার্থ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই আমরা সরস্বতীর প্রেমের একাগ্রতা ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই। সরস্বতীর প্রেমে আমরা যে উদারতা, যে সরলতা, যে আত্মত্যাগ, যে তন্ময়তা দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকই বড় মর্ম্ম-স্পর্শী। সরস্বতী প্রেমের নিকট আত্মবলিদান দিয়াছিলেন; তিনি স্বামীকে যে উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা জগতে আর অধিকতর উচ্চাসন আছে কি না জানি না। তিনি তাঁহার স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যকেই সুন্দর দেখিতেন,

প্রত্যেক কার্য্যেতেই ধর্ম্মের ছায়া অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী বারবনিতাকে ভালবাসেন, সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী যাঁহাকে ভালবাসেন সে কখনই 'কুৎসিতা' 'কুটিলা' বা 'পাপ-সহচরী' হইতে পারে না। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, "মন্ত্রি আমি বেশ্যা হব।" এই কয়টী কথা যে সরস্বতীর মনের কতদূর উচ্চতা ও সরলতা বুঝাইতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! স্বর্গীয় প্রেমের পূর্ণ পরিচয় না কি বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, তাই সেই দৃঢ় বিশ্বাস, স্বামীতে সেই অকৃত্রিম অনুরাগ সরস্বতীর জীবন নাটকের প্রতি দৃশ্যে দৃশ্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রেমের মধ্যে যে একটা ধৈর্য্য, প্রেমের মধ্যে যে একটা আনন্দ, প্রেমের মধ্যে অতৃপ্তি রহিলেও শান্তির যে একটা বিমলছটা মানবনেত্রের সম্মুখে দীপ্যমান হইয়া উঠে, তাহা সরস্বতীর বিরহকাতর চিত্রে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আশাহতা সরস্বতী, স্বামী পরিত্যক্তা সরস্বতী, সকল প্রকার পার্থিব সুখ হইতে বঞ্চিতা সরস্বতী যদিও সকল প্রকার দুঃখের অসহ্য জ্বালায় দগ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্য হইতে শান্তির যে সামগান, আনন্দের যে কলহাস্য এবং বিষাদের যে অস্ফুট ছায়া মানবেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া উঠে, তাহা প্রকৃতই স্বর্গীয় প্রেমের এক অপূর্ব্ব সংজ্ঞা। দরিয়া বিরহ যন্ত্রণায় এতদূর জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল যে সে, সকল ঈশ্বরের যিনি পরম ঈশ্বর, সেই বিরাট নিখিলের বিশ্ববিধাতার বিচারের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে পারে নাই; এবং বোধ হইত যেন ন্যায়ান্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহার হৃদয়স্থিত প্রেমের অপচ্ছায়া পৈশাচিক কণ্ঠে তাহাকে বলিতেছে যে :—

"সয়তানী হেথা শুধু নাহি প্রেম প্রতিদান—
দুর্ব্বলেরে মৃত্যু যেথা দেয় শাস্তি হরি' প্রাণ;
পাপ পুণ্য মিথ্যা যেথা, সেই বিশ্ব কেন আর,
হয়ে যাক লয় তার, হ'ক তাহা ছারখার।"

কিন্তু প্রেমের পুণ্য প্রতিমা সরস্বতী আত্মত্যাগের উচ্চগ্রামে উঠিয়া, প্রেমের যাহা প্রাণ, সেই ধৈর্য্যের দ্বারা নিজের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া এবং সেই বাঞ্ছাকল্পতরুর, সেই প্রেমময়ের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া প্রীতির মধুর উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিল :—

"যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে ?
আমি ঘৃণ্য, কভু নহি দাসী যোগ্যা তার।"

উভয়েই প্রেমিকা, উভয়েই উপেক্ষিতা এবং উভয়েই সমাবস্থায় পতিতা, কিন্তু তথাপি উভয়ের প্রেমের মধ্যে ব্যবধান কি বিস্তীর্ণ, পার্থক্য কি গভীর!

সরস্বতী চরিত্রে আমরা যেরূপ সরলতা দেখিতে পাই, সেইরূপ সরলতা পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সরস্বতীর চরিত্র পাঠ করিলেই মনে হয় যে বুঝি সরস্বতী এ মর্ত্তধামের নয়, বুঝি বা স্বর্গের কোনও দেবী প্রতিমা এই মর্ত্তধামে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সরস্বতীর স্বভাব এতদূর সরলতাময় ছিল যে তাঁহার হৃদয়ে নিজেকে লুকাইবার জন্য প্রবল বাসনা থাকিলেও তিনি কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উজ্জলা যখন ছদ্মবেশিনী সরস্বতীকে নির্দ্দেশ করিয়া সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই একে সাজিয়ে এনেছিস নাকি?" তখন সরস্বতী বলিয়াছিলেন, "না, আমি আপনি সেজে এসেছি।" সরস্বতী পুরুষ সাজিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ সরলতা তো ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তিনি যাহা প্রকৃত তাহাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রেম হৃদয়কে সম্প্রসারিত করে এবং সেই সম্প্রসারণের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল সরস্বতীর স্বর্গীয় সরলতায়।

সাগর যেমন সহসা বিক্ষোভিত হয় না, অথচ বিক্ষোভিত হইলে প্রলয়কর ব্যাপার সংঘটন করে, তদ্রূপ সরস্বতীর প্রেমও সহসা বিক্ষোভিত হইত না, কিন্তু যখন তাহার প্রেমসাগর আকুলিত হইয়া উঠিত, তখন সেও সাগরের ন্যায় প্রলয়কর ব্যাপার ঘটাইত, তখন সেও প্রেমের অবমাননাকারীর প্রতি আপনার অভিশাপানল বর্ষণ করিয়া তাহাকে দগ্ধতরুর ন্যায় অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিত। সরস্বতীর চরিত্রে আমরা সংযমের যেরূপ ত্রিলোকমুগ্ধকর আদর্শ দেখিতে পাই, পূর্ব্ববর্ণিত চরিত্রগুলিতে তাহা ওরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত নাই। আয়েষা বা বিমলা তাহাদের হৃদয়ের আবেগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহারা প্রণয়ীদের নিকট হইতে হয় চলিয়া গিয়া, নয় প্রণয়ীর হস্ত ধারণ করিয়া, নয়নের তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া প্রলয়ের দুর্ব্বার গতিকে কথঞ্চিৎ শান্ত রাখিয়াছিল; কিন্তু সরস্বতী অলর্কের নিকট যখন প্রশ্রয় পাইয়া আপনার

হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন এবং উদ্যতা হইয়াই পূর্ণ উচ্ছ্বাসের মুখে যখন সহসা অলর্কের দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেন তখন তাঁহার স্বর্গীয় সুসংযত প্রেম তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কি বলিত না—

"ক্ষুদ্র ওই কুসুমটী পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তায়—
তেমনি পূজিয়া তারে, এ প্রাণ যাইবে হারে
তবুও লুকানো থাক এ কথা আমার।"

একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার সরস্বতীর হৃদয়ে এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারেই সরস্বতীর অসাধারণ হৃদয়শক্তি তাঁহার প্রবল বাসনাস্রোতকে রুদ্ধ করিয়া, তাঁহার চরিত্রকে উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ষতর, উৎকর্ষতর হইতে উৎকর্ষতমতে লইয়া গিয়া চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

দরিয়ার প্রেম ষোল আনা প্রতিদান চাহিত, সরস্বতীর প্রেম ঠিক তাহার বিপরীত; সরস্বতীর প্রেম আপনাকে দান করিয়াই সুখী থাকে, সে আর প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। দরিয়া মোবারকের সহিত জেব-উন্নীসাকে দেখিয়া জ্বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সরস্বতী আপনার স্বামীর পার্শ্বে উজ্জ্বলাকে বসাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দেই বিভোরা রহিত। সরস্বতীর প্রেম কখনও কাহারও হৃদয়ে হাহাকারের তীব্র নিনাদ তুলে নাই। সরস্বতীর হৃদয় যেমনি কোমল, যেমনি আপনহারা, সরস্বতীর প্রেমও তেমনি কোমল, তেমনি মৃদু, তেমনি নির্ম্মল, তেমনি আপনভোলা। প্রশান্ত বিজলীর ন্যায় সরস্বতীর প্রেম বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই দুরন্ত!

প্রেমের জীবিকা, বোধ হয়, আশা, নচেৎ সরস্বতীর প্রেম বার বার বিফল মনোরথ হইয়াও কি নিমিত্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই? দিন দিন তাঁহার ভালবাসাও যত গভীর হইতেছিল, তাঁহার হৃদয় রাজ্যে আশার মধুর অধিকার ততই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এবং পরিণামে এই আশা, সরস্বতী জীবনের এই একমাত্র বন্ধন, সফলতার পবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—সরস্বতী জীবনে যে প্রকার সুখ কখনো অনুভব করেন নাই—সেই পবিত্র সুখ, সেই স্বর্গীয় সুখ, সরস্বতীর সেই চিরবাঞ্ছিত সুখ তাঁহাকে অনুভব করাইয়াছিল।

সরস্বতী যাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই উদ্ধার বাসনায় যখন নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তখন সরস্বতীর মত সুখী কে? সরস্বতী যখন নিজের স্বামীর কোলে মস্তক রক্ষা করিয়া স্বর্গের উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সরস্বতীর মত ভাগ্যবতী কে?—তখন আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, সরস্বতীর হৃদয় বিগত দুঃখের যাবতীয় জ্বালাময়ী স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিল—

"All other pleasures are not worth its pain."

অর্থাৎ প্রেমের জন্য যে দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া লইতে হয়, তাহা অন্য সকল প্রকার সুখ হইতে মধুর, অন্য সকল প্রকার তৃপ্তি হইতে আনন্দদায়ক, অন্য সকল প্রকার শান্তি হইতে উজ্জ্বল!

জেলেখা, বিমলা আয়েসা তাহাদের অভিলষিত প্রণয়ীদের স্বামীরূপে পায় নাই সত্য, কিন্তু অলর্ককে স্বামীরূপে পাইয়াও তো সরস্বতীর অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আয়েসা, জেলেখা বা বিমলা তাহাদের ঈপ্সিত প্রণয়ীদের নিকট দুটা স্নেহপূর্ণ বাক্যও শুনিতে পাইত এবং তাহাদের একটা সান্ত্বনাও ছিল যে ইহজন্মে তাহাদের প্রণয়ীদের সহিত মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ তাহা নীতি বিরুদ্ধ, সমাজ বিরুদ্ধ,ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কিন্তু সরস্বতীর এইরূপ কোন সান্ত্বনাই ছিল না। তিনি ধর্ম্মের দ্বারা সমাজের দ্বারা যাঁহাকে স্বামীরূপে পাইয়াছিলেন, সেই সাগর সিঞ্চিত ধন, সেই আঁধার ঘরের মাণিক, সেই ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, সেই চিরদুঃখিনী সরস্বতীর চির আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বস্ব অলর্ক কোনও দিন তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণ করেন নাই, কোনও দিন তাঁহার অশ্রুবন্যার সহিত আপনার অশ্রুনদীর সংযোগ করিয়া দেন নাই, বরং তিনি তাঁহারই প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অবধি বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি সরস্বতীর অটল গাম্ভীর্য্য, অকূল, অতল প্রাণ কি কোনও দিন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিল? সুখের দিনে, সম্পদের দিনেও আমরা যেমন তাঁহার চিত্ত-স্থৈর্য্য প্রভৃতি মধুর ব্যবহার অবলোকন করি,দুঃখের দিনে,বিপদের দিনেও আমরা তাঁহাকে তেমনি ভাবশূন্য নিরীক্ষণ করি এবং আমাদের মনে হয় যে তখন যেন তাঁহার প্রেম আরও স্বর্গকান্তি লাভ করিয়াছে,আরও ঔজ্জ্বল্যময় হইয়া উঠিয়াছে, আরও প্রীতিপূর্ণ মধুর পবিত্রতাময় আকার ধারণ করিয়াছে!

বাস্তবিকই সরস্বতীর প্রেমের তো তুলনা নাই! সরস্বতীর প্রেম যে সম্পূর্ণ কামগন্ধশূন্য—সে প্রেমেতো নিবৃত্তি নাই,আবিলতা নাই, বিলাসতরলা নটলীলার

ক্ষণিক চাঞ্চল্য নাই, সে প্রেম তো ক্ষণিক সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, সে প্রেম তো মোহের ফেরে মুগ্ধ রহে না, সে প্রেমে তো একটা বিশ্বগ্রাসিনী আকাঙ্ক্ষা নাই, সে প্রেম তো নিরাশার অরুন্তুদ মর্ম্মঘাতনায় আকুলিত হইয়া উঠে না, সে প্রেম তো নিরাশার তীব্র পৈশাচিকতায় উন্মত্ত রহে না—সে প্রেম যে অনাদি, অনন্ত, অচল, অটল, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, সে প্রেম যে বিশ্বব্যাপী মহান বিশ্বপ্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী সোপান, সে প্রেম যে প্রিয়বিরহবিধুরার হৃদয়ে প্রীতির মহান গভীরতম সাগর সৃষ্টি করে, সুতরাং সে প্রেমের কি তুলনা আছে? সেই প্রেমই তো স্বামীভক্তির চরম বিকাশ! সুতরাং সরস্বতী চরিত্র পাঠ করিলেই আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে —

"দেখিলে—সে নারী, ছুঁইলে—সে নাই
ছুঁইলে পড়িবে ঢলে।
নয়ন ছাপিয়া, বদন প্লাবিয়া
বুকে সে যাইবে গলে।"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

সম্ভাষণ।

(১)

কল্যাণ দেশ জয় করি' আজি
উন্নত করি শির,
ফিরিছে দেশে মহা উল্লাসে
আবাজী মারাঠা বীর!
পশ্চাতে তার যতেক সেনানী
পদবিক্ষেপে কাঁপায়ে মেদিনী
গর্ব্বিত হৃদে চলিয়াছে সবে
নাশিয়া প্রতিদ্বন্দী;
তাদের মাঝে শিবিকা এক
চলিয়াছে লয়ে বন্দী।

(২)

ভাবিছে মুলানা বসিয়া একা,
রুদ্ধ শিবিকা দ্বার!
"কাফের হ'য়ে আমারি উপর
করিবে অত্যাচার!
রমণী আমি, মোগল রমণী—
করিবে মোরে কাফের ঘরণী?
ধিক্ শতবার জন্মে আমার—
কেন এ তুচ্ছ প্রাণ!
মরণ আজি বরণ করিব
করিয়া বিষপান!"

(৩)

বসি' সিংহাসনে ছত্রপতি
মারাঠা ভাগ্য বিধাতা ;
সেথায় আসি' আবাজী বীর
কহিল যুদ্ধ বারতা।
কহিল ফিরিয়া, করি নমস্কার,
"এই লহ দেব রতন-সম্ভার !
আরো এক রত্ন এনেছি প্রভো !
তুল্য তাহার নাই,
রত্ন সেই তোমারই যোগ্য
এনেছি তোমারি ঠাঁই।"

(৪)

"শিবাজী যোগ্য রূপসী যেই
সম্মুখে সেই বন্দিনী,
তুল্য নাই রূপের শুনি
ইনিই নবাব নন্দিনী !"
কহিল শিবাজী হেরি সে রমণী ;
"হইতে যদি মা আমার জননী
ও রূপের কণা শিবা শরীরে
হইত পুরস্কার !
যাও ফিরে দেবী সংসারে তব
লহ গো নমস্কার !"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে আমি গোবিন্দরামকে সে সময় নন্দনপুরের যে সকল বিষয় পত্রে লিখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। এই সকল পত্রের কেবল একটামাত্র পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে, নতুবা আর সমস্তই ঠিক আছে। নন্দনপুরে যাহা কিছু করিয়াছিলাম, যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই আমি এই সকল পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

প্রথম পত্র—প্রথমাংশ।

নন্দনপুরের গড়।

প্রিয় গোবিন্দরাম,

এই নির্জ্জন স্থানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই তুমি আমার পূর্ব্ব পত্রে জানিতে পারিয়াছ। এখানে যত অধিক দিন থাকিতেছি, ততই যেন এই নির্জ্জন মরুসম মাঠের নির্জ্জনতা আমার প্রাণের ভিতর বসিয়া যাইতেছে।

এরূপ ভয়াবহ নির্জ্জন স্থান যে সংসারে কুত্রাপি আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। তবে এই দুরতিক্রম্য মাঠের বিষয় বর্ণন করিবার জন্য তুমি আমাকে পাঠাও নাই, সুতরাং রাজা মণিভূষণ সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তাই লিখিতেছি।

এ কয়দিন যে, পত্র লিখি নাই, তাহার কারণ এ কয়দিন কিছুই লিখিবার মত ছিল না, তবে সম্প্রতি একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার বিষয় পরে লিখিতেছি, উপস্থিত অন্য দুই-একটা কথা বলি।

সুরীর জেল হইতে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাত পলাইয়াছে, তাহার নাম হারু। অনেক জেলার লোকেই তাহার উপদ্রবে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর হারু ধরা পড়িয়া সুরীর জেলে ছিল, তাহার বিচার হইতেছিল, এই সময়ে সে পলাইয়াছে।

সকলেই ভাবিয়াছিল যে, সে-ই এই দুর্গম মাঠের কোনখানে লুকাইয়া আছে। লুকাইয়া থাকিবার এমন চমৎকার স্থানও আর নাই। এই মাঠে এত গর্ত্ত খানা ডোবা আছে যে, এখানে কেহ লুকাইলে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। তবে প্রায় পনের দিন হইল, সে জেল হইতে পলাইয়াছে, এতদিন সে অনাহারে এই মাঠে কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাই সকলে ভাবিতেছে যে,সে কোন রকমে অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছে। তাহার ভয়ে এ দেশের সকলে সশঙ্ক ছিল, এখন তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নিদ্রা যাইতেছে।

আমাদের গড়ে তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না ; সে আসিলে আমরা অনায়াসেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, তবে সদানন্দ বাবুর জন্য আমি ও মণিভূষণ উভয়েই একটু চিন্তিত হইলাম। তিনি কেবলমাত্র একজন চাকর লইয়া এই নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করেন। হারু ডাকাতের ন্যায় ভয়ানক লোক তাঁহার বাড়ীতে কোন রাত্রে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। তাই রাজা রাত্রে সদানন্দ বাবুর বাড়ীতে থাকিবার জন্য দুইজন লোক সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু সদানন্দ বাবু তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, হারু ডাকাতের মত একশত ডাকাত তাঁহার কি করিবে ? বিশেষতঃ তাঁহার কি আছে যে, সে লইবে ?

নূতন রাজার, সদানন্দ বাবুর দিকে এত টানিবার একটা কারণও হইয়াছে। তিনি মঞ্জরীকে দেখিয়াছেন, মঞ্জরী সুন্দরী, রূপবতী, যুবতী, মণিভূষণের ন্যায় যুবকের মন যে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি তবে

সদানন্দ ভগিনীকে চোখে চোখে রাখেন ; যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে মঞ্জরীকে সচ্চরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। আরও যতদূর দেখিলাম, সদানন্দের ইচ্ছা নহে যে, নূতন রাজা কোনরূপে তাঁহার ভগিনীর সহিত আলাপ করিতে পান। আর ইহাও তাঁহার কর্ত্তব্য।

এখন সদানন্দ বাবু প্রায়ই গড়ে আসেন, আমরা দুইজনে তাঁহার সঙ্গে গড়ের চারিদিকে এবং এই নির্জ্জন মাঠের নানাস্থানে বেড়াইয়াছি। যে স্থানে মৃত রাজার দেহ পাওয়া গিয়াছিল, তিনি মণিভূষণকে তাহা দেখাইয়াছেন ; মাঠের এক স্থান দেখাইয়া বলিয়াছেন, "শোনা যায়, এইখানে নাকি আপনার সেই খুল্লতাত কুকুর-ভূতের হাতে মারা যান।"

মণিভূষণ বাবু সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনি এ সব বিশ্বাস করেন ?"

সদানন্দ বলিয়াছেন, "বিশ্বাস করি না—তবে কিছু বুঝিতেও পারিতেছি না।"

সদানন্দ বাবু ছাড়া ভূতনাথ বলিয়া একজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষকের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। তুমি নিকটস্থ সকল লোকের সন্ধান লইতে বলিয়াছিলে বলিয়া ইহারও সহিত আলাপ করিয়াছি। এই লোকটার চরিত্র অতি অদ্ভুত, ইহার বেশ জমি-জমাও আছে, বাড়ীতে পাঁচ-সাতটা ধানের মরাই—তবে ইহার এক মহা রোগ—মোকদ্দমা। সত্য মিথ্যা কোন-না-কোন মোকদ্দমা লইয়াই আছে—যেন মোকদ্দমাই তাহার জপমালা ; এখনও আসামী ও ফরিয়াদী হিসাবে বোধ হয়, সাত-আটটা মোকদ্দমা চালাইতেছে। কথায় কথায় মোকদ্দমা ও সর্ব্বদাই আদালত-ঘর করিয়া সে খুব সন্তুষ্ট আছে।

যাহা হউক, এখন হারু ডাকাত, সদানন্দ বাবু, ডাক্তার নলিনাক্ষ, আর এই ভূতনাথের কথা রাখিয়া তোমাকে এখন অনুপ ও তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে দুই-একটা কিছু বলিব। বিশেষতঃ কাল রাত্রে যাহা হইয়াছে, এখন তাহাই বলিতেছি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম পত্র—দ্বিতীয়াংশ।

প্রথমে সেই টেলিগ্রামের কথা হইতে আরম্ভ করি। সেদিন অনুপ গড়ে ছিল কি ছিল না, দেবগ্রামের পোষ্টমাষ্টারের কথায় কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায়

না। আমি মণিভূষণকে সমস্তই বলিয়াছিলাম। তিনি তখনই অনুপকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টেলিগ্রামখানা পাইয়াছিলে ?"

অনুপ বলিল, "হাঁ, পাইয়াছিলাম।"

"পিয়ন তোমার নিজের হাতে সেখানা দিয়াছিল ?"

অনুপ বিস্মিতভাবে মনিবের মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়া বলিল, "না, আমি তখন ভিতরে ছিলাম। আমার স্ত্রী পিয়নের কাছ থেকে লইয়া আমাকে গিয়া দিয়াছিল।"

"তুমি কি নিজে জবাব দিয়াছিলে ?"

"হাঁ, নিজে দিয়াছিলাম।"

তখন আর এ সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। সন্ধ্যার পর অনুপ নিজে আবার একথা তুলিল, বলিল, "আপনি কিজন্য টেলিগ্রামখানার কথা এভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি জানি না। আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করিতেছেন ?"

রাজা বলিলেন, "না—না—তোমায় অবিশ্বাস করিব কেন ? তোমরা আমাদের বংশের পুরাতন কর্ম্মচারী।"

তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মণিভূষণ নিজের অনেক ভাল ভাল জামা, কাপড়, জুতা বকসিস্ দিলেন। অনুপ অনেক আশ্বস্ত হইল।

অনুপের স্ত্রীর উপর আমি বিশেষ নজর রাখিয়াছিলাম ; তাহার মুখ দেখিলে তাহাকে ধূর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় না, তবুও তাহাকে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। সে-ই যে সেদিন কাঁদিয়াছিল, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু দুই-একদিন তাহার মুখ দেখিয়া ক্রন্দনের চিহ্ন দেখিয়াছি। কখনও আমার মনে হয়,সে কোন গর্হিত কার্য্যের জন্য অনুতাপে কাঁদে, কখনও আমার মনে হয় যে, অনুপ হয় ত তাহাকে গোপনে প্রহার করে, তাহার উপর অত্যাচার করে। ইহা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অনুপ লোকটা যে সন্দেহজনক তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর কাল রাত্রে সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই নয় বলিলেও হয়। তুমি ত জান যে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না, একটুতেই জাগিয়া উঠি। কাল রাত্রি দুইটার সময় সে আমার ঘরের সম্মুখের বারান্দা দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া যাইতেছিল, তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি নিঃশব্দে বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম, কে একজন একটা প্রদীপ হাতে লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া যাইতেছে। সে যেভাবে যাইতেছিল, তাহাতে তাহাকে দেখিলেই সন্দেহ হয় যে, নিশ্চয়ই তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে।

বারান্দাটা ঘুরিয়া বাহিরের দিকে গিয়াছে—লোকটাও সেইদিকে গেল, সে দৃষ্টির বাহিরে যাইবামাত্র, আমিও নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। ঘুরিয়া অন্যদিকে আসিয়া দেখিলাম, সে একটা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

বাড়ীর এই সকল ঘরে কেহ থাকিত না, সুতরাং এই খালি ঘরে অনুপকে এত রাত্রে আসাটা আরও সন্দেহজনক হইয়া উঠিল। আমি উঁকি দিয়া দেখিলাম, জানালার কাছে আলোটা রাখিয়া, সে জানালায় মুখ বাড়াইয়া মাঠের দিকে কি দেখিতেছে—যেন কি দেখিবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; প্রায় তিন-চারি মিনিট সে এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আলোটা নিবাইয়া দিল। আমিও অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

যখন আবার আমার তন্দ্রা আসিয়াছে, তখন যেন শুনিলাম, কে দূরে কোন একটা ঘরে চাবি লাগাইতেছে। কোথায় কে চাবি লাগাইতেছে, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। অনুপের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোনরূপ বিশদ তাৎপর্য্য গ্রহণে আমি আপাততঃ অক্ষম হইলেও সে যে এই বাড়ীতে কোনও গুরুতর রহস্যে জড়িত আছে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। এই রহস্য কি তাহা অবগত হইবার জন্য আমি বিশেষ ব্যগ্র হইলাম। আমি নিজে এ সম্বন্ধে কি ভাবিতেছি, তাহা বলিয়া তোমায় বিরক্ত করিব না, তুমি তাহা শুনিতেও চাও নাই। হয়ত তাহাতে আমি তোমাকে ভুলপথে লইয়া যাইতে পারি; সুতরাং নিজের মন্তব্য অনাবশ্যক। যাহা প্রকৃত পক্ষে এখানে ঘটিতেছে, আমি তোমায় তাহাই লিখিতেছি, তুমিও কেবল তাহাই শুনিতে চাহিয়াছ। আমি রাজা মণিভূষণকে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা বলিয়াছি, তাহার পর আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিয়াছি, সে কথা এখন বলিব না—পরে যে পত্র লিখিব, তাহাতেই সে সমস্ত লিখিব।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পত্র—প্রথম অংশ।

প্রিয় গোবিন্দরাম,

পূর্ব্বে তোমায় অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই, তাহার কারণ তখন বিশেষ কিছু লিখিবার ছিল না। এখন ঘটনার উপর ঘটনা, রহস্যের উপর রহস্য ঘটিতেছে। সুতরাং এখন লিখিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। আমার আগেকার পত্রে অনুপের গভীর রাত্রে নির্জ্জন ঘরে যাইবার কথা তোমায় লিখিয়াছিলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার হইয়াছে।

যাহা আমি কখনও ভাবি নাই, তাহাই ঘটিয়াছে—তুমিও শুনিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। এখন তাহার রহস্যজনক কার্য্যের অনেকটা অর্থ জানিতে পারা গিয়াছে—কিন্তু কোন কোন বিষয়ে রহস্য আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রে যে ঘরে অনুপ গিয়াছিল, আমি দিনের বেলায় সে ঘর ভাল করিয়া দেখিলাম। যে জানালায় সে উঁকি দিয়া দেখিতেছিল, দেখিলাম, সে জানালার একটু বিশেষত্ব আছে; অন্য জানালা হইতে মাঠটা দেখা যায় না, কিন্তু এই জানালা হইতে মাঠের শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাতে বোঝা যায় যে, অনুপ এই জানালা হইতে মাঠের মধ্যস্থিত কোন দ্রব্য বা কাহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল। রাত্রি ঘোরতর অন্ধকারে পূর্ণ ছিল, সেই অন্ধকারে দূরস্থ কিছু সে যে কিরূপে দেখিতে পাইত, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না। আমার মনে হইল যে, হয় ত অনুপ কোন প্রেমলীলায় মনোযোগ করিয়াছে, তাহার এইরূপ রাত্রে গুপ্ত অভিসার, তাহার উপর তাহার স্ত্রীর ক্রন্দন, ইহাতে এ সন্দেহ করা একেবারে অসঙ্গত নহে। রাত্রে যে দরজা খুলিবার শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে এ সন্দেহ আমার মনে আরও দৃঢ়তর হইল, নিশ্চয়ই অনুপ দরজা খুলিয়া কাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়াছিল।

আমার মনে যাহা হইয়াছিল, আমি সমস্তই মণিভূষণকে বলিয়াছিলাম; পরে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতে আমি যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

মণিভূষণকে অনুপের কথা বলায়, তিনি বিশেষ বিস্মিত হইলেন না। বলিলেন, "আমি জানি, অনুপ রাত্রে বাড়ীর ভিতর এই রকম ঘুরিয়া বেড়ায়। আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি, তাহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব। আমিও তাহার পায়ের শব্দ রাত্রে শুনিতে পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে সে প্রত্যহ রাত্রে ঐ জানালায় যায়।"

মণিভূষণ বলিলেন, "খুব সম্ভব। তাহা যদি হয়, আজ রাত্রেই তাহাকে বলিতে পারিব, সে কি করে, তাহাও জানিতে পারিব। আপনার বন্ধু গোবিন্দরাম বাবু এখানে থাকিলে, তিনি কি করিতেন, তাহাই আমি ভাবিতেছি।"

আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিতেছেন, বোধ হয়, তিনিও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনিও নিশ্চয় অনুপের পিছু পিছু গিয়া দেখিতেন যে, সে এইরূপ রাত্রে কি করে।"

"তাহা হইলে আমরাও তাহাই করিব।"

"সে আমাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া সাবধান হইয়া যাইতে পারে।"

"না, আমরা খুব সাবধানে যাইব, আর অনুপও কানে ভাল শুনিতে পায় না। আজ আপনি আমার সঙ্গে থাকিবেন, সে আমার ঘরের সম্মুখের বারান্দা দিয়া গেলে আমরা তাহার পিছু পিছু যাইব।"

রাত্রে এইরূপ কথা স্থির করিয়া আমি দেখিলাম, মণিভূষণ বাহির হইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তিনি অন্যদিন আপত্তি করেন না, আজ বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আপনিও যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "মাঠের দিকে গেলে আমাকে আপনার সঙ্গে যাইতে হইবে—গোবিন্দরামের হুকুম। আপনি কি মাঠের দিকে যাইবেন?"

"হাঁ—ঐ দিকে একটু বেড়াইব, মনে করিতেছি।"

"তাহা হইলে আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। গোবিন্দরাম আমাকে কি বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আমি কিছুতেই আপনাকে মাঠে একা যাইতে দিতে পারি না।"

মণিভূষণ হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু খুব বিচক্ষণ হইতে পারেন, তবে তিনি সবই কি বুঝিতে পারেন? ডাক্তার বাবু, বুঝিতেই ত পারিতেছেন—যাহা হউক, আপনাকে অধিক কিছু বলিতে হইবে না; যে উদ্দেশ্যে যাইতেছি, তাহাতে আমার একা যাওয়াই দরকার হইতেছে; আপনি অন্তরায় হইবেন না।"

এ কথার উপর কথা নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সদানন্দ যতই সাবধান হউন না কেন, মণিভূষণ মঞ্জরীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সুন্দরী মঞ্জরীর সহিত রাজা মণিভূষণ মধ্যে মধ্যে মাঠে নির্জ্জনে দেখা-

সাক্ষাৎ করেন। মণিভূষণ যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? আমার এ অবস্থায় কি করা উচিত, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি ছড়ী তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে গড় হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা কেবল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য আমাকে এই দূরদেশে পাঠাইয়াছ, বিশেষতঃ মাঠে কখনই মণিভূষণকে একাকী যাইতে দিতে নিষেধ করিয়াছ, আর আমি আজ তাঁহাকে অনায়াসে একাকী মাঠে যাইতে দিলাম। আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল; আমি মনে করিলাম, এখনও মণিভূষণ অধিক দূর যান নাই, এখনও গেলে তাহাকে ধরিতে পারিব, আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সত্বর গড় হইতে বাহির হইলাম।

বাহিরে আসিয়া মাঠের পথে মণিভূষণকে দেখিতে পাইলাম না। আমি মনে করিলাম, হয় ত তিনি অন্য কোনদিকে গিয়াছেন। তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য আমি একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপরে উঠিলাম। এই উচ্চস্থানে উঠিবামাত্রই আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম।

তিনি অনেক দূরে মাঠের এক নির্জ্জন স্থানে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন। দেখিলেই বোধ হয়, এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে—স্ত্রীলোকটীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে বিশেষ কোন গুরুতর কথা বলিতেছে, মণিভূষণ তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মস্তকান্দোলন করিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

পশু-পক্ষীর ভাষা।

যখন

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে

শ্রীহরি বিহার করিতেছিলেন তখন

উন্মীলন্তি কুহূ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ।

এই যে কাব্যমাত্রে প্রশংসিত পিকের ভাষা ইহা কি বাস্তবিক নিরর্থক? চণ্ডীদাস যখন লিখিয়াছিলেন—

"শুক পিকদ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।"

তখন কি তিনি কেবল শুক পিক ভ্রমরের বাক্যের চাতুর্য্যে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছিলেন না তাঁহার মনে মনে ধারণা ছিল মনুষ্যেতর জাতিও মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে, তাহাদের স্বরগুলার একটা অর্থ আছে। স্বর্ণহংস দময়ন্তীর জন্য যে প্রেমের বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছিল তাহা কি কেবল কবিকল্পনা প্রসূত না তাহার একটা অর্থ আছে? এরূপ চিন্তা আমাদের মনে প্রায়ই উঠে কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতাবশতঃ এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই। পাশ্চাত্যে যে পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় এক শতাব্দী পরে মোটামুটি রকমে বুঝিতে পারা যাইবে যে বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে বায়স, মূষিক, সিংহ, শৃগাল, বানর, হরিণ প্রভৃতিকে যেরূপ বাক্‌শক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বভাবের নিয়মানুসারে তাহাদের আছে কি না।

ইহজগতের তাবত সৃষ্টজীবের সম্রাটত্ব উপভোগ করিয়া আমরা ভাবি মনুষ্যেতর জীব চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তিহীন। সামান্য ঈশ্বরদত্ত পশুবুদ্ধিতে তাহারা কায়ক্লেশে এ জগতের জীবন সংগ্রামে প্রাণধারণ করে মাত্র। কেবল প্রাণধারণ করিবার একটা অব্যক্ত বৃত্তি এবং স্বজাতি বৃদ্ধি করিবার বৃত্তি ইতর শ্রেণীর জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং তাহারা যাহা কিছু কার্য্য করে এই দুইটা বৃত্তির বশে; ভূত বা ভবিষ্যতের চিন্তা তাহাদের নাই, সুতরাং পরস্পরকে পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করিবার কোন ক্ষমতা মনুষ্যেতর জীবে নাই।

ভাষা বা কথা কহিবার শক্তি বা নিজের মনোভাব পরকে বুঝাইবার ক্ষমতা মানবজাতির নিজস্ব ইহাতে অপর জাতির দাবীদাওয়া নাই। অবশ্য আমাদের এ ধারণার ভিত্তি আছে। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমানের অগ্রগণ্য সেও বানরের 'কিচিমিচি'র মধ্যে অর্থসূচক প্রেম সম্ভাষণ, বসন্ত বর্ণনা বা আম্র চুরির জল্পনা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধির বৃহস্পতি তাঁহারাও বলেন—পশু যতই কেন উন্নত হউক না, বাক্‌শক্তির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মানুষের সমান হইতে পারে না। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন—পশু জগতের সীমান্ত যতই কেন অগ্রসর হউক না—এমন কি এক সময় মানব জগতের ও পশু জগতের পার্থক্যের সীমা কেবল মস্তিষ্ক গঠনে একটা পরদার পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—তথাপি একটি প্রাচীর আছে যাহা এ পর্য্যন্ত কেহও স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই, সে প্রাচীর ভাষা। অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন—পশুরা চিন্তা করিতে পারে না।

বাস্তবিক পশুপক্ষীদিগের চিৎকারের মধ্যে একটা অর্থ আছে কি না, বায়সের বিরক্তিকর 'কা কা' রব অপরাপর বায়সের পক্ষে অর্থযুক্ত কি না, কোকিলের শ্রুতিমধুর 'কুহুরব' যাহা রোহিণীর হৃদয়ে কালকূট সদৃশ কার্য্য করিয়াছিল—অপর কোকিল বা কোকিলবধূর নিকট বোধগম্য কি না, যামঘোষের প্রতি প্রহরের বিকট চিৎকার তাহাদের হৃদয়ের ভাবের তরঙ্গ অপর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করিবার উপায় কি না—একথা বলা কঠিন। আমাদের ভাষায় অর্থ আছে কারণ আমরা অসমস্বর উচ্চারণ করি। শব্দের পার্থক্য না থাকিলে তো আর বিভিন্ন ভাব প্রকাশক শব্দের বিভিন্নতা থাকিতে পারে না। শিশুর একঘেয়ে চিৎকারে সুরের তারতম্য নাই। সুতরাং তাহা নিরর্থক তাহার বিভিন্নতা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। এই কষ্টিপাথরে যখন আমরা মনুষ্যেতর জীবের কণ্ঠস্বর কসিয়া দেখি তখন বুঝি সে স্বর একঘেয়ে—একজাতীয় জীব কেবল একই স্বর উচ্চারণ করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের কণ্ঠনিসৃত শব্দ ভাষার কার্য্য করিতে পারে না। বায়সের ভাষা কা কা কা—কখনও বা এই কা শব্দ বারকতক বৃদ্ধি কখনও বা জোরে কা-কা কখনও বা প্রথম কা'টা জোরে দ্বিতীয় কা'টা কমজোরে। কিন্তু ভাষার বর্ণমালায় দুই বর্ণ—স্বরবর্ণের মধ্যে 'আ' আর ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে 'ক'। ছাদের উপর বসিয়া কাকপুঙ্গব যতই কেন গলা সাধুক না এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়া গীত গাহুক না, এই দুইটি বর্ণেরই সংযোগ বিয়োগ, মিশ্রণ করিয়া তাহাকে সে গানের কথা বাহির করিতে হইবে।

কোকিলেরও প্রাণভুলান পঞ্চমস্বরের মধ্যে সেই এক কথা—'কুহু কুহু কুহু।' সুতরাং আমরা সহজে মানিতে চাহি না যে মিনির ম্যাও ম্যাওয়ে, কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ে, গাভীর হাম্বা হাম্বায়, হাঁসের প্যাঁক প্যাঁকে এবং বীর হনুমানের হুপ্ হাপে একটা কোনও ভাষা আছে।

পশুর ভাষা আছে কি না এ মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা ভ্রমে পতিত হই; তাহার কারণ আমরা মনে করি আমাদের ভাষা যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সকল ভাব প্রকাশক, পশু পক্ষীর যদি ভাষা থাকে তাহা হইলে উহাও সেইরূপ বিশদ হওয়া কর্ত্তব্য। হিংসা, দ্বেষ, প্রশংসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সকল মনোভাব জ্ঞাপন করিবার উপায় ভাষা। সুতরাং কেবল মাত্র 'ক' আর 'আ'র দ্বারা এত প্রকার ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। বলা বাহুল্য, জন্তুরাজ্যে আমাদিগের মত ভাবের বিকাশ, ভাবের শ্রেণী বা ভাব বৈচিত্র্য নাই। জম্বুককুল মধ্যে কেহ নিউটন জন্মগ্রহণ করে না যে তাহাকে মাধ্যাকর্ষণের গূঢ়তত্ত্ব বিবৃত করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, পশুর মধ্যে এমন কেহ নাই যে বারম্বার হতাশ হইয়া মনের দুঃখে বলে—

"সুখের লাগিয়ে এঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।"

মৃগীর প্রেমে বিরক্ত হইয়া কোনও মৃগ বোধ হয় বলে না—"মরণরে তুঁহু মোর শ্যাম সমান।"

পশু জগতের অভাব অল্প, হৃদয়ের বাসনা সীমাবদ্ধ, উচ্চাশা দুই টুকরা খাদ্য সংগ্রহ করা অবধি, সুতরাং যদি তাহাদের ভাষা থাকে তাহা অল্প সংখ্যক কথা লইয়া হইবে মাত্র। যখন আমাদের গ্রামের মধ্যে একটা অপরিচিত লম্বাচওড়া লাঠি হস্তে কাবুলি প্রবেশ করে তখন গ্রাম্য পথে শায়িত কুকুরগুলা সহসা ভীমদর্শন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। তাহার অর্থ বোধ হয়—"কেরে এ গাঁয়ে পালা, কামড়াব।" এইটুকু বলিতে পারিলেই কুকুরের বাক্‌শক্তির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা হয়। একথা সকলেই জানেন যে সামান্য কৃষকের ভাষা অতি অল্প কিন্তু মোক্ষমুলার সদৃশ সর্ব্বদিকস্পর্শী প্রতিভাবান দার্শনিক পণ্ডিতের ভাষা তদপেক্ষা অনেক বিশদ। অসভ্য বর্ব্বর জাতির ভাষা অতি অল্প সংখ্যক কথার সমষ্টি মাত্র; কিন্তু সুসভ্য জাতির ভাষায় কথার সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং যদি পশুপক্ষীর ভাষা থাকে তাহা হইলে তাহা অতি অল্প সংখ্যক কথার দ্বারা ব্যক্ত হইবে।

তাহার পর আর একটা কথা আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পশুপক্ষীর স্বর একঘেয়ে; একই রকম শব্দ সকল সময়ে সকল পশুপক্ষী করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভিতরও স্বরের একটা পার্থক্য আছে। কাক 'কা কা' করে বটে কিন্তু কখনও চারিবার 'কা' শব্দ উচ্চারণ করে, কখনও দুইবার করে, কখনও বা দুই মিনিট ধরিয়া 'কা কা কা' করিয়া মানবজাতীয় শ্রোতার ধৈর্য্য পরীক্ষা করে। কে বলিতে পারে যে চিৎকারের সময়ের উপর তাহার অর্থ নির্ভর করে না। হয়ত একবার 'কা' অর্থে খাদ্য, 'কা কা' অর্থে খাদ্য কোথা? 'কা-কা-কা' অর্থে পালা বেটা শত্রু, কা-কা-কা-কা' অর্থে ছেলে ভাঙ্গে বাসা ইত্যাদি। এইরূপ একটা অর্থ তাহাদের ভাষায় নাই, একটা কাক কথা কহিলে অপর একটা কাক তাহা বুঝিতে পারে না, একথাটা অনুমান করিলে ভগবানের সৃষ্টিমাহাত্ম্যে যেন একটু দোষারোপ করা হয়। একই রকম স্বর হইতে উচ্চারণের বিভিন্নতা বশতঃ পৃথক অর্থ প্রকাশিত হওয়াও কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। যাঁহারা টেলিগ্রাফের সঙ্কেতমালা জানেন না, তাঁহাদের নিকট টেলিগ্রাফ্-শিগন্যালারের "টেরে টোক্কা, টেরে টোক্কা" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক শব্দ একঘেয়ে ও অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। অথচ আমরা জানি এই একই রকমের খট্ খট্ শব্দ দ্বারা মানব হৃদয়ের সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় নানা যুগান্তরকর সমাচার এই একঘেয়ে শব্দে সমগ্র সুসভ্য জগত মধ্যে নিত্য ছুটাছুটি করিতেছে।

ইংরাজি রোমানস্ কথাটির প্রথম বর্ণের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে রোমান জাতি বুঝায় এবং দ্বিতীয় বর্ণের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে উপন্যাস বুঝায়। কন্জার (conjure) কথার পূর্ব্ব বর্ণে জোর দিলে ভোজবাজী করা অর্থ হয় এবং পরবর্ণে জোর দিলে নিবেদন করা অর্থ প্রকাশ পায়। এইরূপ object, august, minute, gallant, premises, প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণের পার্থক্যবশতঃ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রফেসার মোক্ষমুলার বলেন—চীন, আনাম, সায়াম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের ভাষায় একটি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন—বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইলে আনামের ভাষায় 'বা' শব্দের অর্থ—(১) স্ত্রীলোক (২) পূর্ব্বপুরুষ (৩) রাজানুগ্রহজীবি (৪) ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে (৫) ফলের ছোব্ড়া (৬) তিন (৭) কাণে ঘুসি মারা। সুতরাং ঠিক করিয়া উচ্চারণের বিভিন্নতা দেখাইতে পারিলে কেবল 'বা' শব্দযুক্ত নিম্নলিখিত পদের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ হয়।

বাবা বাবা=তিনজন স্ত্রীলোক রাজানুগ্রহজীবির কাণে ঘুসি মারিলেন। ইহা যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে—

গা সা সাসা গা—।—।

কা কা কাকা কা আ আ

অর্থে "সন্ধ্যা হ'ল চল প্রিয়ে ঘরে" হওয়া বিচিত্র কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে পড়িয়াছিলাম যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আমেরিকায় বনমানুষ 'জাম্বুমান' হনুমান প্রভৃতির ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন এবং নানাপ্রকার যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের ভাষার উচ্চারণের বিভিন্নতাদি নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আশা করা যায় যদি মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হয় তাহা হইলে ইতর শ্রেণীর জীবের ভাষা আছে কিনা তাহার নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকরূপে মীমাংসা হইবে।

জন্তুদিগের সম্বন্ধে অপর একটা কথা ভাবিলে তাহাদের ভাষায় অর্থ নাই এ ধারণাটা লোপ পায়। এক একটি জীব সমাজ যেরূপ যন্ত্রীকৃত ও তাহাদের কর্ত্তব্যের গণ্ডী এরূপ দৃঢ় যে সে সকল সমাজে পরস্পর পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারে না একথা বলিলে যেন কেমন একটু অপ্রকৃত বলিয়া মনে হয়। পিপীলিকা, উই, মৌমাছি প্রভৃতি জীব দলবদ্ধ হইয়া, সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। মৌমাছির চাকের দ্বারে একজন প্রহরী থাকে সে কেবল দলস্থ ব্যক্তিকে চাকের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, অপর দলের ব্যক্তিকে দেয় না। মধুচক্রের রাণী সম্মানিতা হয়, কতকগুলা মধুকর কাজ করে—পুরুষগুলা জাতিবৃদ্ধি ভিন্ন অপর কোনও কার্য্য করে না। এসকলের মধ্যে কেবল যে কলের চাকার আবর্ত্তনের মত একটা কার্য্য হয় তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের একটা উপায় নাই ইহা অসম্ভব। কপোত কপোতীর প্রণয় যেরূপ মধুর তাহাতে কপোতের প্রগল্‌ভ বক্‌ বকুমে একটা প্রেমের ভাষা নাই ইহা ত বোধ হয় না। আমি দেখিয়াছি প্রেমমুগ্ধ কপোত প্রথমে যখন অপরিচিতা কপোতীর নিকট বকৃবকুম কুম্ করিয়া হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করে তখন সে কেবল উপেক্ষিত হয়। স্থান বিশেষে প্রত্যুত্তরে দুই একটা চঞ্চুর আঘাত তিরস্কাররূপে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাতে সে ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় বকিতে থাকে। শেষে জয়ী হয়। তাহার শব্দে একটা অর্থ না থাকিলে কি বাক্য দ্বারা হৃদয় জয় করিতে পারিত?

পশুপক্ষীর ভাষা ঠিক মনুষ্য ভাষার মত অর্থবাচক হউক বা না হউক বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাপন করাইবার জন্য যে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে তাহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। প্রভু বাহির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পালিত কুক্কুর যে প্রকার শব্দ করে এবং গৃহে অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সে যে শব্দ করে তাহাতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কপোতী গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ করিবার সময় কপোতের কণ্ঠস্বর একরূপ। তাহার নীড়ে শত্রু ঢুকিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তাহার স্বর অন্য প্রকারের হয়। আমরা মনুষ্য হইয়া যখন এই সকল পার্থক্য বুঝিতে পারি তখন তাহাদের সমজাতীয় জীব যে ইহাপেক্ষা সূক্ষ্ম পার্থক্য তাহাদের স্বরে বুঝিতে না পারে তাহা কে বলিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই পরস্পরকে বুঝাইবার একটা ভাষা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ না হইলেও ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করাটা সঙ্গত নহে। তাহাদের ভাষা বিশদ ও বহু শব্দ সমন্বিত না হইতে পারে।

অপর একটা কথা স্মরণ করিলে বরং মনে হয় পশুপক্ষীর নিশ্চয় একটা ভাষা আছে। পশুর হিতাহিত জ্ঞান না থাকিলেও, পশুগণ একেবারে চিন্তাশক্তি বিরহিত একথাটা বলা যাইতে পারে না। তাহাদের গভীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু সামান্য মোটামুটি ভূত হইতে একটা ভবিষ্যতের ধারণা করিতে তাহারা একেবারে অক্ষম নহে। চিন্তার প্রধান উপকরণ স্মৃতি তাহাদিগের আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই স্মৃতি হইতে সরল সিদ্ধান্ত তাহারা করিতে পারে ইহাও আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মানুষে জন্তুকে বশীভূত করে ইহাই এই সত্যের প্রমাণ। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান জীব হস্তী অবাধে দুইটা বৃহৎ মহীরুহ উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আপনার মাহুতকে দেখিলে আজ্ঞাবহ ভৃত্যাপেক্ষাও দীন হইয়া যায়। ইহা কি স্মৃতির কার্য্য নহে? তাহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে এ কথা তাহার সাক্ষ্য। তাহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া হউক অথবা মাহুতের প্রহারের ভয়ে হউক তাহাকে দেখিলেই হস্তীর স্মৃতি জাগরিত হয় অমনি সে সিদ্ধান্ত করে যে ইহার আজ্ঞাবহ হইলেই লাভ। কর্ম্মস্থল হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হইলেই কুকুর দরজায় বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করে এদৃশ্য নিত্যই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন পশু মস্তিষ্কের চিন্তা করিবার সামর্থ্য নাই তাঁহারা পশু জগতের নিয়মগুলা মোটেই অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া বোধ হয়।

মোক্ষমুলার প্রমুখাত দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে ভাষা ব্যতিরেকে চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং উক্ত পণ্ডিত যখন বলেন যে ইতরশ্রেণীর জীবের ভাষা নাই তখন তিনি বোধ হয় বলেন যে পশুর চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। পশুর চিন্তা করিবার শক্তি আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং তাহার ভাষা নাই একথাটা বিশ্বাস্য নহে। পরস্পরের মধ্যে মনোভাব জ্ঞাপন করিবার একটা উপায় মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে নাই বলিলে ভগবানের সৃষ্টি-মাহাত্ম্যে দোষারোপ করা হয় বলিয়াই আমার ধারণা।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

শ্রীপঞ্চমী।

প্রথম বসন্তে আজি মলয় অনিল
ধীরে বহে কুঞ্জবনে শিহরি কোকিল,
কল কণ্ঠে গায় কুহু, কোরক সকল
আপনি ফুটিয়া উঠে পূর্ণ পরিমল।
জল স্থলে জেগে উঠে জীব সমুদয়
পশু পাখী তরুলতা মানব নিচয়
শীতান্তে মেলিয়া আঁখি নিরখিল যবে
চারিদিক যেন এক নূতন গৌরবে
শোভিছে প্রকৃতি আর আনন্দ-সঙ্গীত
আপনি উঠিয়া বিশ্ব করিছে ঝঙ্কৃত।
পঞ্চমীর খণ্ড চন্দ্রে মৃদু শুভ্র করে
ভারতীর পদ্মাসন ভাতিছে অম্বরে
প্রকৃতির উপচার দেখি হৃষ্ট চিতে
গঠিল প্রতিমা কার শ্রীশ্রীপঞ্চমীতে।

শ্রীমতী অম্বুজা ঘোষ

অনিত্যে নিত্য।

আসিতে আসিতে উষা তখনি মিলায়—
প্রভাতী শীতল বায় দুদ'ণ্ডে ফুরায়—
প্রচণ্ড মধ্যাহ্নতার দীপ্ত হুহুঙ্কার—
সতেজ যৌবন খেলা পূর্ণ ক্ষমতায়—
'পরাহ্ন মরণ কোলে পড়ে গো ঢলিয়া—
সন্ধ্যার আঁধার মাঝে যাইতে ডুবিয়া—
সকলি অনিত্য নিত্য—অনিত্যের খেলা
নিত্য ক্রোড়ে চিরদিন—তব গূঢ় লীলা!
তেমতি কি বিশ্বপিতঃ! এ ক্ষুদ্র মানব—
কোথা হ'তে আসে যায় ক'দিনের তরে—
খেলিতে জীবন খেলা তুচ্ছ যার সব—
এই হাসা—এই কাঁদা মায়া মোহভরে
তারি হৃদে ভক্তি প্রেম নিত্য বিদ্যমান
জানে না মরণ ক্ষয় অনন্ত সমান!

শ্রীউমাচরণ ধর।

কে তুমি !

ওই যে উদাস হৃদি, মলিন বদন—
কলঙ্ক-পশরা শিরে, আনত নয়ন—
নাহি শুনি মুখে বাণী, শূন্য আঁখি
নাহি পানি,—
ভাবিতেছে বুঝি বসি "এহেন পতন—
দেব দৈত্য কভু কার ঘটেনি কখন !"
তুমি কি সেই পুণ্য মূর্ত্তি হৃদয় রঞ্জন !
কি মন্ত্র নিহিত তোমা' বিশ্ব-বিমোহন
নাহি কপটতা লেশ, পূর্ণ সরলতা বেশ,
মনমুগ্ধকর ছবি, নয়ন -রঞ্জন—
তুমি কি সেই পুণ্য মূর্ত্তি হৃদয় রঞ্জন !

একি হায় ঘুমঘোর ! একি অচেতন !
একি সেই প্রিয় মূর্ত্তি !—সকলি স্বপন !!
দেবত্বের তিরোধান, পিশাচের অধিষ্ঠান—
পূত হৃদি-মন্দিরে, তাণ্ডব নর্ত্তন !
ভাবিতে সে কথা হায়,বুক ফেটে
ভেঙ্গে যায়,
তুমি কি সেই পুণ্য মূর্ত্তি নয়ন রঞ্জন !
অনুতাপ ! অনুতাপ ! শুধু অনুতাপ !
অনুতাপ বিনা কভু ঘুচিবে না পাপ—
কর কর দৃঢ়চিত্ত, নিশিদিন প্রায়শ্চিত্ত—
লভিবে বল পুন, ঘুচিবে সন্তাপ
ঘুরিবে অদৃষ্টচক্র, যাবে অভিশাপ।

সাহিত্য-সমাচার।

ভীষণ প্রতিশোধ।—একখানি ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু এই পুস্তকের প্রণেতা ও বিখ্যাত ডিটেকটীভ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে ইহার সম্পাদক। লেখকের ডিটেকটীভ উপন্যাস লিখিবার বেশ হাত আছে, তাহার উপর পাঁচকড়ি বাবুর সম্পাদনে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

পুস্তকখানির ঘটনা-তরঙ্গ এত বেশী যে পাঠ করিতে করিতে পাঠককে 'হাবুডুবু' খাইতে হয়। গল্পাংশ পড়িতে বসিলে ছাড়িয়া উঠা যায় না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে ঘটনাটীর অনেক স্থল অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন। উদাহরণ স্বরূপ জাহাজে জাহাজে যুদ্ধের বিষয় আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর একটা কথা বলিয়া রাখি যে, যে বৈরী দুইটী নরহত্যা করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আয়োজন করিয়াছিল এবং ঐ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শত শত পারদর্শী লোক নিয়োগ করিয়াছিল, সেই সমস্ত লোককে বিখ্যাত ডিটেকটীভদ্বয় মিঃ বার্টন ও কৃষ্ণজী রঘুপন্থ উপর্য্যুপরি "বেকুব" বানাইয়াছিলেন, একথা পাঠ করিতে করিতে মনে আনন্দ হয় বটে কিন্তু কেমন একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

চরিত্রগুলির মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেমিক এলবার্ট উইলিয়মের চরিত্রটী আমরা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ক্লীওপেট্রা ও লর্ড পেমব্রোকের চরিত্রদ্বয়ও বেশ ফুটিয়াছে।

মোটের উপর পুস্তকখানি উপন্যাস পাঠকের প্রিয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

৮ম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৭। [১ম সংখ্যা।
February, 1911.

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র] [এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

মাসিক পত্রিকা

সমালোচনী।

৮ম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৭। [১ম সংখ্যা।

প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গ।

তরঙ্গান্বিত সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া বেলাভূমির উপর ক্রীড়রত উত্তাল অম্বু-রাশির প্রতি অবলোকন করিতে করিতে দৃষ্টিসীমার শেষাংশে লক্ষ্য করিলে যেমন পয়োধির তরঙ্গজনিত অসমতলতা নয়নগোচর হয় না, তেমনি বহুদিন পরে প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে কোনও উন্নতিশীলা প্রাচীন জাতির জীবনের বাধা বিঘ্ন দ্বন্দ্ব সংগ্রামের গুরুত্ব গুলা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নস্তুপের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমরা প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের যেরূপ সমাজচিত্র অঙ্কন করি তাহাতে মোটা মুটি স্থূল রেখা সম্পাত করিতে পারি মাত্র, যে সকল সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা আধুনিক সভ্য জাতির সমাজ আলেখ্য দৃষ্টিসুখকর হয় প্রাচীন জাতি-দের সে সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কন আমরা করিয়া উঠিতে পারি না। দেশ কালের পার্থক্য বিষম পার্থক্য। মনুষ্যচরিত্র বড় জটিল। আমরা এ কালেই এক দেশে বাস করিয়া অপর দেশের অধিবাসীবৃন্দের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের মূলস্থিত মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। যে সকল জাতি বহু যুগ পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সার সংগ্রহ করা, তাহাদের আধুনিক কাল হইতে ভিন্ন প্রকৃতির মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কথা

নহে। অন্যান্য বিষয়েও যেমন নানা মুনির নানা মত, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও তেমনি নানা মুনির নানা মত। যে সকল প্রতিভাবান মনীষীদিগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা প্রাচীন জাতিদিগের লুপ্ত ইতিহাস পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক সময় তাঁহারা আপনাদের মতের পোষকতা করিবার জন্য ঠিক নিরপেক্ষ ভাবে প্রাচীন জাতিদিগের আলোচনা করেন নাই। ফলে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বাকৃযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধে আধুনিক কালে ইতিহাস সাহিত্য পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আমার বোধ হয় এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণ্ডগোল বাধিয়াছে এক একটি প্রাচীন জাতির অভ্যুত্থানের কাল নিরূপণ লইয়া। আর্য্যাবর্ত্তের বৈদিক কাল খৃষ্ট জন্মিবার কত সহস্র পূর্ব্বে ছিল,রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিনা, বেদব্যাস মহামুনি বদরিকাশ্রমের তুষার রাশির মধ্যে বসিয়া কবে সাধনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি গবেষণা লইয়া কত প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের রচনাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

তাহার পর গোল বাধে প্রাচীন সভ্যতার এক একটা অঙ্গের মূল নিরূপণ করিতে গিয়া। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে জ্যোতিষ জ্ঞান কিরূপ ছিল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ কেবল তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না। এই জ্যোতিষ জ্ঞানটি কোনও বিদেশী জাতির নিকট হইতে তাঁহারা পাইয়াছিলেন অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলন ভারতবর্ষের স্বদেশজাত, জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যবহৃত নানা পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত শব্দ না তাহারা সংস্কৃতের পরিচ্ছদে বিভূষিত গ্রীক কথা, সিদ্ধান্তকার পুলিস গ্রীক না হিন্দু, এইরূপ তর্ক লইয়া এই সকল পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক সময় রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার এবং তাঁহাদের আত্মীয়বর্গকেও বিভিন্ন প্রদেশে অন্বেষণ করিবার প্রয়াসে ইঁহারা যথেষ্ট শক্তি ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ফলে মতানৈক্য বশতঃ আমরা পূর্ব্বেও যে তিমিরে ছিলাম আজও সেই তিমির মধ্যে অবস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় হিন্দু, পারসী, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান, ব্রিটন এক আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত কেবল এই মতটাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনীষী ঐক্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সেই আদিম আর্য্য-জাতি কোথায় বাস করিত, এই প্রশ্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বা মিশরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তে

মোহিত হইতে হয়। যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহারা প্রাচীন কালের লুপ্তরত্নে আধুনিক মানবজাতিকে ধনবান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রতিভা ও পরার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা যে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই একথাও বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহাদের অশেষ প্রকার মত প্রকাশ জন্য সাধারণ ইতিহাস পাঠককে বিব্রত হইতে হয়। কিছুদিন পরে মনে হয় প্রাচীন মানবের ইতিহাস আমাদিগের আদৌ হস্তগত হয় নাই। যাহা একজনে ইতিহাস বলিয়াছেন তাহা অপরের মতে কল্পনা, যাহা একজন সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হয়ত তাঁহারই মত সমান প্রতিভাবান কোনও মনীষী মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্ববিদদিগের পরিশ্রম ফল বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদের সত্যানুসন্ধান প্রয়াস একেবারে বিফল হইয়াছে, এ কথা আদৌ সারবান বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা আপনাপন উদ্যমের দ্বারা সাহিত্য-কানন যেরূপ ফল পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিচরণ করিলে আনন্দ ও শিক্ষালাভ অনিবার্য্য। তাঁহারা সকলেই তমসাবৃত প্রাচীন রত্ন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছেন। তবে প্রত্যেকে সেই সকল রত্ন লইয়া নিজ ইচ্ছামত মালা গাঁথিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য সেই সকল রত্ন লইয়া এক একটিকে পর্য্যবেক্ষণ করা এবং আপনাপন জ্ঞান ও প্রবৃত্তি অনুসারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রকৃত পক্ষে গৌতম বুদ্ধ দেবের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে একশত দুই শত বা দুই হাজার বৎসরের ভুল হইলেও মানব জাতির বিশেষ অপকার হইবে না। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার উপদেশ, তাঁহার অমৃতময়ী উন্নত ভাষা যদি তৃষিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের চরিত্র হইতে সামান্য মাত্রাতেও রাগদ্বেষহিংসা কাম ক্রোধ লোভ বিদূরিত করিতে পারে তাহা হইলেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন অনেকটা সফল হইবে। এ উপকরণ আমরা পাইয়াছি। সুতরাং বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তির্ব্বতের পথ দিয়া জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বা সিংহলবাসীদিগের উদ্যমে জাপানী দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, এ গবেষণার ঠিক মীমাংসা হইল না বলিয়া আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা বিড়ম্বনা, এ সিদ্ধান্ত বড় বিঘ্নকর।

আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও জাতিই বর্ব্বরতার তিমির গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াই সভ্যতার উচ্চশিখরে সমাসীন হয় নাই। বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার শিখরে উঠিতে হইলে

অতি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়। আর এই সুদীর্ঘ পথের যাত্রা শেষ করিতে অনেক যুগের আবশ্যক হয়। এই যুগব্যাপী ঊর্দ্ধ যাত্রায় উন্নতিশীল জাতিকে কত বাধা কত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। একটি বিপদের সহিত সংগ্রামের পর জয়ী হইয়া উঠিতে না উঠিতে বিপদ অপর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া জাতীয় জীবনের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আবার সেই নূতন বিপদটিকে পরাজয় করিলে তবে সেই জাতি উন্নতিমার্গে একস্তর উঠিতে পারে। পুরাকালেও এইরূপ মুহুর্মুহু সংগ্রামে জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইত এবং তাহাদিগের অবস্থান্তর ঘটিত। শেষে যখন নষ্টোত্তম হইয়া তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না তখন অপর জাতি আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে নেতৃত্ব কাড়িয়া লইত।

প্রাচীন ইতিহাসের অভাবে প্রাচীন জাতিদিগের ক্রমোন্নতির প্রত্যেক স্তরের পদচিহ্নগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা যখন প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া বলি প্রাচীন হিন্দুজাতি পশ্বাদি বধ বিষয়ে বেশ উদার নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহারা অপর জীবের মাংসে নিজ দেহ পুষ্ট করিত না, তখন আমরা এক বিশিষ্ট কালের হিন্দুজাতির বর্ণনা করি মাত্র। তাহার পূর্ব্বকালের হিন্দুজাতি পশু পক্ষীর মাংসে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিত। ঠিক কিরূপ উপায়ে হিন্দুজাতি আমিষান্ন ত্যাগ করিয়া নিরামিষাসী হইল, কোন্ কোন্ মনীষীর ক্রমিক উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' এ নীতি কার্য্যে পরিণত করিল, তাহার কোনরূপ নির্ভুল তথ্য আমরা ইতিহাসে পাই না। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীবৃন্দ গঠিত মন্দিরাদিতে মিশরবাসীদিগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন দেখিয়া আমরা মিশরবাসীদিগের শিল্পবিদ্যার প্রশংসা করি। অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিয়া তবে মিশরবাসী পিরামিড নির্ম্মাণে বা স্ফিঙ্কসগঠনে পারদর্শী হইয়াছিল। আমরা তাহাদের ক্রমোন্নতির স্তর গুলা দেখিতে পাই না বলিয়া তিন সহস্রবর্ষ ধরিয়া যত অসভ্য অর্দ্ধসভ্য বা সুসভ্য লোক নাইলনদতীরে বাস করিয়াছে, তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করি।

আমরা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে কালের দৈর্ঘ্য উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহার ফলে আমাদের নিকট প্রত্যেক প্রাচীন জাতিই স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উন্নতিশীল জাতি কখনও একেবারে স্থিতিশীল হইতে পারে না। অবস্থান্তর ব্যতীত উন্নতি হইতে পারে না। যাহা জাপান আজ

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া আধুনিক জগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছে তাহা প্রাচীন সভ্যজাতিদিগকে অনেকবার করিতে হইয়াছে। অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক নববিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া তবে প্রাচীন জাতিগণ ভূমণ্ডল মধ্যে আপনাদের যশসৌরভ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগের এই সকল কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রাচীন গ্রীসে জ্যামিতি শাস্ত্রের অনুশীলন হইয়াছিল বলিলেই আমরা যেন সিদ্ধান্ত না করি যে তাহাদের জাতীয় জীবনের সকল কালেই গ্রীকজাতি জ্যামিতি শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিল। কিরূপ যন্ত্রীকৃত উদ্যমের দ্বারা প্রত্যেক জাতি এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় উপনীত হয়, সেই বিষয়ে জ্ঞান পাইবার জন্য আমরা প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি। যে স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের পরিশ্রম সত্বেও আমরা এই ক্রমবিকাশের স্তর গুলির নিদর্শন না পাই, সে স্থলে প্রাচীন ইতিহাস অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে আমরা যেন একথা বিস্মৃত না হই।

প্রাচীন জাতিদিগের কার্য্যকলাপ রীতিনীতি বিচার করিতে বসিয়া অনেক লেখকই সে গুলিকে আপনাদের সমাজে প্রচলিত আদর্শ কার্য্যকলাপের সহিত মিলাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, ইহাপেক্ষা অবিচার আর নাই। প্রাচীন কালের অবস্থার সহিত আধুনিক কালের অবস্থা মিলিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন জাতিকে বিচার করিতে হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান গুলিকে ঘৃণা করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের, প্রাচীন মিশরের ও প্রাচীন পারস্যের ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাখ্যা লইয়াও নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক কোন্ বিধি কোন্ নীতির পরিপোষণ করিত, কোন্ কথার কিরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া কোন্ প্রাচীন জাতি কিরূপ আত্মোন্নতি লাভ করিত, একথা বলা কঠিন। সুতরাং এ সকল কঠিন বিষয়ে আমাদের পক্ষে বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করাই শ্রেয়।

ডাক্তারের ভুল।

(১)

অবিনাশ সন্ধ্যার পর আসিয়া জোরে ঘা দিয়া দরজা খুলিল। ঘরে ঢুকিয়া রুষ্টস্বরে বলিল, "সরলা, আবার তোমার কাপড় আমার আন্‌লার উপর রেখেছ, তুমি কি কিছুতেই আমার কথামত চল্‌বে না?" এই বলিয়া স্ত্রীর কাপড় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সরলা ধীরস্বভাবা যুবতী। কোমল স্বরে বলিল, "আমার ভুল হয়েছে,আমাকে মাপ কর, দেখ এ রকম ভুল আর—"

অবিনাশ স্ত্রীর উত্তর শেষ হইতে না দিয়া বিরক্তভাবে আহার-স্থানের আসনের উপর গিয়া বসিল। থালের চারি দিকের বাটীগুলির দিকে চাহিয়াই উত্তেজিত ভাবে বলিল, "সেই মুগের ডাল, মাছের ঝোল! রবিবারে মুগের ডাল মাছের ঝোল, বুধবারে মুগের ডাল মাছের ঝোল! খাওয়ার কোন বদল নাই। এতে আমার শরীর যে ভাল থাক্‌বে না, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

সরলা (প্রশান্ত মৃদুস্বরে)। আমার ভয় হচ্ছে তোমার কি অসুখ করেছে। নহিলে আর কিছু হয়েছে কি?

অবিনাশ (উত্তেজিত স্বরে) "আর কিছু হয়েছে কি?" "আর কিছু হয়েছে কি?" তুমি বল দেখি, কোন্ দিন না আমার কিছু না কিছু হয়? আমি দেখ্‌ছি, সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে লেগেছে, আমার সুখ শান্তি নষ্ট কর্‌ছে। আমার শেষ না হলে নিস্তার নাই। আজ আফিসে গিয়ে একশ্চেঞ্জ গেজেটে দেখলুম কাগজের এক আনা করে দর নেমেছে।

সরলা (শান্তভাবে) আমার এরকম হলে আমি চিন্তিত হতুম না। তার পর আজ দর নেমেছে, কাল আবার উঠ্‌তে পারে। আর তোমার পাঁচশ টাকার ত কাগজ, তাতে তোমার পাঁচ আনা মাত্র ক্ষতি।

অবিনাশ। "পাঁচ আনা মাত্র!" পাঁচ আনা কিছুই নয়, কেমন না? তুমি সর্ব্বদা মনে রেখ, এ রকম করে যে টাকা উড়ে যায়, তা আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। আর তুমি যে বল্‌ছ কাগজের দর কাল উঠ্‌তে পারে, তা আমি বিশ্বাস করি না, আমি না বেচ্‌লে কাগজের দর উঠ্‌বে না। আর তুমি এসব বিষয়ের কি বোঝ যে কথা কহিতে এস? যারা মূর্খ মেয়েমানুষ, তাদের কোন কথা না কয়ে চুপ করে থাকা উচিত।

সরলা স্বামীর স্বভাব জানিত, সুতরাং কোন উত্তর করিল না।

অবিনাশ। তার পর আজ আফিসে যেমন ঢুক্‌ছি, আমার জুতার ফিতে খুলে গিয়ে রাস্তায় কাদা চট্‌কান হল। তোমাকে বার বার বল্‌ছি, ভাল ফিতা এনে আমার জুতায় লাগিয়ে রেখ, তা তুমি কিছুতেই শুন্‌ছ না।

সরলা। ভাল ফিতেই ত লাগিয়ে দিছি। গত সপ্তাহে নতুন ফিতে আনিয়েছি, আমার বোধ হয় সকালে তাড়াতাড়ীতে তুমি ভাল করে বাঁধনি।

অবিনাশ। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি জুতার ফিতে বাঁধ্‌তে জানি না? আমি এই উনত্রিশ বছর—

সরলা। উনত্রিশ বছর থেকে অন্ততঃ ন বছর বাদ দাও।

অবিনাশ। ও, দেখ্‌ছি তোমার খুব হিসাব জ্ঞান আছে। এত যদি হিসাব জ্ঞান, তবে সংসারের একটু খরচ কমাতে পার না কেন? বাহিরে সমস্ত দিন নানা লোকে নানা বিষয়ে বিরক্ত করে, তার পর যেমন বাড়ীতে পা দিলুম, অমনি তুমিও জ্বালাতে লাগলে! আজ আফিস বন্ধ হলে যেমন ষ্টেশনে এলুম, অমনই ট্রেণ ছেড়ে দিল, নোঙরা ছোটলোক ভরা একটা থার্ড-ক্লাস গাড়ীতে কোনমতে লাফ দিয়ে উঠ্‌লুম।

অবিনাশের বাটী কলিকাতা পটলডাঙ্গায়, কর্ম্ম-স্থল হাবড়ার পরবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনে রেলওয়ে কোম্পানির ওয়ার্কষপ বা কারখানা।

সরলা। সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

অবিনাশ। সৌভাগ্য! তার চেয়ে যে ৫০খানা ট্রেন ফেল হওয়া ভাল ছিল। আমি তাড়াতাড়ী উঠে একটা জায়গা খালী দেখে যেমন বস্‌লুম, অমনই একটা ছোটলোক মাগী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। আমি তার ডিমের ঝুড়ীর উপর বসেছিলুম। তাতে, ঐ দেখ, কেবল আমার কাপড় যে খারাপ হল তা নয়, সে মাগী ২৪টা ডিমের দুপয়সা করে আমার কাছ থেকে বার আনা আদায় কর্‌লে, এক একটা ডিমের দাম দুপয়সা! মাগী ফাঁকি দিয়ে বেশ লাভ করে নিলে! পৃথিবীতে আমার কপাল কেবল মন্দ বই ভাল দেখ্‌ছি না। আমার যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।

সরলা। (ক্রন্দন স্বরে) ওগো তুমি অমন কথা বোলোনা, আমার ওতে বড় ভয় হয়। আজ সকালে তুমি যেভাবে ছুরী শাণাচ্ছিলে! আমাদের চেয়ে পৃথিবীতে যে লোকের হাজার হাজার অধিক অমঙ্গল হয়।

অবিনাশ। আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি না, আমি সম্পূর্ণ অন্তরের সহিত

বল্‌ছি, যাহা কর্‌বার, তাহা কর্‌তে আমি দৃঢ় ভাবে স্থির করেছি। পৃথিবীতে সকলেই আমার বিরুদ্ধে, আফিসের ছোঁড়া চাকর হ'তে রেলের টিকিট কলেক্টর পর্য্যন্ত, এই বেটা রোজ আমাকে দেখে তবুও আমার পাশ না দেখে ছাড়ে না। সকলে আমার এরূপ শত্রু হলে আমি কি করে টিকে থাকি। দুচার দিনের মধ্যে আমার একটা শেষ কর্‌ব, তাতে সকলেরই মঙ্গল হবে।

সরলার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—অমন নিষ্ঠুর কথা তোমার বলা উচিত নয়। আমাকে বে করে তুমি যে সুখী হও নাই, তা আমি জানি, কিন্তু তোমা বিনা আমি কি করে বাঁচ্‌ব বল দেখি। তোমার জীবনের এই যদি শেষ সপ্তাহ হয়, ভেবে দেখ সে কি ভয়ানক কথা।

নিষ্ঠুর অবিনাশ। খুব ভেবেছি, কিন্তু তার চেয়ে আমার আর অধিক মঙ্গল নাই।

(২)

শ্যামবাজারে সরলার পিতৃগৃহ। তাহার কাকা নিরঞ্জন মিত্র ডাক্তার, মেডিক্যাল কলেজে চাকরী করেন। পরদিন স্বামী অফিসে গেলে সরলা পিতৃগৃহে গিয়া কাকার নিকট সমুদয় ব্যাপার বলিল, এবং আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিল— ওঁর মাথা কি কিছু খারাপ হয়েছে ?

নিরঞ্জন। না মা, সে ভয় কোরোনা। বাবাজীর মাথার কিছু খারাপ হয় নাই। লিভারের কোন দোষ হয়েছে বলে বোধ হয়। কিন্তু মা, জামাই যত কথা বলে, সে সব সে কর্‌বে বলে তুমি বিশ্বাস কোরোনা। যারা মুখে অত আত্মহত্যা কর্‌ব বলে, তারা কখন আত্মহত্যা কর্‌তে পারে না। যা হউক আমার কাছে ঐ রোগের ঠিক ওষুধ আছে।

নিরঞ্জন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল পরে কাগজ মোড়া এক শিশি ঔষধ ভ্রাতুষ্পুত্রীর হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও মা, এই শিশির সমস্ত ওষুধ আজ রাত্রে ঘুমুবার আগে জামাই বাবাজীকে খেতে বল্‌বে, দেখ্‌বে সে শীঘ্র ভাল হয়ে যাবে।

বেলা থাকিতে থাকিতে সরলা বাটীতে ফিরিয়া আসিল এবং স্বামী আফিস হইতে আসিলে প্রতিদিনের মত যথারীতি পরিচর্য্যা করিল। আজ স্বামীর কোন কথায় সরলা উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না। খাওয়ার পর স্বামী চৌকিতে বসিলে সরলা ভয়ে ভয়ে বলিল—আজ বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম। কাকা

বাবুকে তোমার অসুখের কথা বলাতে তিনি ওষুধ দিয়েছেন আর বলেছেন এতে তুমি শীঘ্র ভাল হবে,আজ রাত্রে শোবার আগে এই ওষুধ সবটা খেতে হবে।

অবিনাশ। ওতে কিছু হবে না। কোন ওষুধেই কিছু হবে না। আমার ভাল হবার সম্ভাবনা নাই, আর সে ভালই কথা।

পরিশেষে, মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগী যেমন শেষ ঔষধ সেবন করে, সেইরূপ কি ভাবিয়া অবিনাশ শিশিশুদ্ধ ঔষধ আপন গলার ভিতর ঢালিয়া দিল।

পরদিন অফিস হইতে বাটী আসিয়া অবিনাশ যখন খাইতেছে, তখন নিরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে এক চিঠি আসিল। সরলা পড়িল, "ভয়ানক দরকার, এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র যে অবস্থায় থাক সেই অবস্থাতে চলিয়া আসিবে, শ্রীনিরঞ্জন মিত্র।"

অবিনাশের মুখ একেবারে শুখাইয়া গেল, নানা দুশ্চিন্তা তাহার মনে উঠিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে বলিল—"আমার সঙ্গে তোমার কাকার কি এত দরকার!" সরলা, তুমি আন্দাজ কর্‌তে পার কি কেন তিনি আমায় ডাকছেন?"

সরলা। আমি ত কিছুই বুঝ্‌চি না। কিন্তু তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন?

অবিনাশ। মুখ শুক্‌ন! কই আমার মুখ ত শুকোয় নাই, কেন শুকুতে যাবে, আমি কি করিছি যে তোমার কাকার কাছে যেতে আমার মুখ শুকিয়ে যাবে। আমার ছাতা চাদর আন।

(৩)

চকিত গতিতে বাহির হইয়া ট্রামে আরোহণ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে অবিনাশ শ্যামবাজার শ্বশুর বাড়ীতে উপনীত হইল। কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া একেবারে খুড়-শ্বশুরের ঘরে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

নিরঞ্জন। কেমন আছ বাবাজী? আমার বোধ হচ্চে তুমি কাল্‌কের চেয়ে আজ ভাল আছ। তোমার এত দিন অসুখ হয়েছে, আমাকে জানাও নাই, এতে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

অবিনাশ। কাকা মশায়, বাহিরে আমাকে একটু ভাল দেখালেও বাস্তবিক আমি ভাল নই। কাল আপনি আমাকে যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তাতে সমস্ত রাত্রি আমার একটুও ঘুম হয় নাই।

নিরঞ্জন। শুনে দুঃখিত হ'লুম, কিন্তু তুমি আর কোন মন্দ ফল পাবে না, অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য যে পাবে না, তা আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি।

এখন আমার পত্রের কথা। তোমাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু বল্‌বার আছে, কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা তোমায় কর্‌তে হবে যে তুমি তা আর কাকেও, আমাদের মেয়েকেও, বল্‌বে না।

অবিনাশ। আপনার যে আদেশ, তা অবশ্যই মান্‌ব।

নিরঞ্জন। বেশ বাবাজী। তোমাকে এই বল্‌বার জন্য ডেকেছিলুম যে, আমি এক ভয়ানক ভুল করেছি, যে ভুলের জন্য আমার জীবনেও দুঃখ যাবে না। তবে তোমার প্রতি আমি এক অনুগ্রহ করেছি, যা লক্ষ টাকা পেলেও অন্য লোকের জন্য কর্‌তুম না।

অবিনাশ। আপনারা আমার অভিভাবক, আপনারা অনুগ্রহ কর্ব্বেন না তবে কে কর্‌বে। কিন্তু আপনার কথা যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

নিরঞ্জন। তবে খুলে বলি শুন। তুমি অবশ্য জান কাল আমাদের সরলা এসেছিল। তার কাছে শুন্‌লুম, তুমি না কি জীবনে বিরক্ত হয়েছে, তাই আত্ম-হত্যা করতে চাও, ক্ষুর চালাও, বিষ খাবার কথা বল, আর ঐরূপ কত কি বল। এ সকল কি সত্য কথা ?

অবিনাশ। হাঁ, সত্যই বটে।

নিরঞ্জন। তুমি মনে ভেব না, তুমি ও সব কর বলে তোমাকে বারণ কর্‌তে আমি ডেকেছি। তবে এ কথা আমি বল্‌ব যে, মর্‌বার আগে ঐ রকম করে আপনার স্ত্রীকে ভয় দেখান কাঁদান অত্যন্ত অন্যায়। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমার আত্মহত্যা করতে কখন সাহস হবে না, এই বলে সরলাকে শান্ত করেছি।

অবিনাশ। (একটু রুষ্ট ভাবে)। আপনার যা ইচ্ছা বিশ্বাস কর্‌তে পারেন। তবে আপনার বিশ্বাসটা অন্যের কাছে প্রকাশ না করাই উচিত ছিল। আর শীঘ্রই এমন দিন আস্‌বে তখন দেখ্‌বেন আপনার ভুল বিশ্বাস। আমি যা স্থির করেছি তাহাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

নিরঞ্জন। (প্রশান্ত ভাবে) তুমি এই যা বল্‌লে তাই ত আমার জান্‌বার ইচ্ছা ছিল। তা বেশ, তুমি সত্য সত্যই আত্মহত্যা কর্‌তে চাও। তা হ'লে সে বিষয়ে তোমাকে আর কোন ঝঞ্ঝাট পোওয়াতে হবে না, এমন অনুগ্রহ আমি করেছি। তোমাকে আমি বলেছি আমি এক ভয়ানক ভুল করেছি, সেই ভুলের ফলে পৃথিবীতে তুমি আর এক সপ্তাহ মাত্র থাক্‌বে।

অবিনাশ। (ভয়ে চমকাইয়া হাঁপাইয়া) বলেন কি, আমি আর এক সপ্তাহ মাত্র বাঁচ্‌ব। কাকা বাবু, আমার সঙ্গে রহস্য কর্‌বেন না।

নিরঞ্জন। তুমি কি আমার রহস্য কর্‌বার লোক! আমি প্রকৃতই অন্যায় কার্য্য করে ফেলেছি। তুমি অফিস থেকে এসে সরলাকে না দেখ্‌তে পেলে তখনই বা এক কাণ্ড করে ফেল, এই ভয়ে মেয়েটা বড়ই ব্যস্ত হল, তাই তাড়াতাড়ীতে একটা ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি। অনেক দিন হতে একটু নূতন ওষুধ তৈয়ার করিতে চেষ্টা কর্‌ছি, সেটা নির্দ্দোষরূপ বার কর্‌তে পার্‌লে এত বিক্রী হবে যে আমি বড় মানুষ হয়ে যাব। সেই নূতন ওষুধের বোতলটা তোমার রোগের আসল ওষুধের পাশে ছিল, আমি তাড়াতাড়ীতে সেই বোতল হ'তে ঢেলে দিয়েছি। এই ভুলের জন্য যে আমার কত দুঃখ হয়েছে তা আর কি বল্‌ব। এখন এই ওষুধের আশ্চর্য্য গুণ ও কার্য্য শোন। এই ওষুধ খাবার পর এক সপ্তাহ বা সাত দিন বা ঠিক ১৬৮ ঘণ্টা যাবৎ রোগীর মনে সতত মহা উল্লাস হইবে, রোগী মনের অতুল আনন্দে বেড়াবে। ঐ ১৬৮ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া ১৬৯ ঘণ্টা আসিলে রোগীর শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলিতে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হবে, হার্ট কুঁকড়ে যাবে, তার চলা বন্ধ হবে। কিন্তু এ কথা আমি বলি যে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটু সামান্য যন্ত্রণাও বোধ হবে না। যারা আত্মহত্যা কর্‌তে চায়, তারা ত ঐ রকমেই মরা চায়। সুতরাং তোমার পক্ষে ভাল বই মন্দ নয়। আমি ছাগল কুকুর বেড়ালের উপর পরীক্ষা করেছি, দেখেছি ঠিক প্রক্রিয়া মত কাজ হয়েছে। তুমি যে এক শিশি ওষুধ খেয়েছ, তাতে কুড়িটা গরু মর্‌তে পারে—আঁ, তুমি অমন কর্‌ছ কেন, তোমার কি হয়েছে?

অবিনাশের মাথা হতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ ভয়ানক কাঁপিতেছিল, মুখ মরার মত হয়ে গিয়েছিল। তোতলাইয়া অতি ভীত স্বরে বলিল—হা পরমেশ্বর! এ কি সত্য। আমার কি কোন আশা নাই?

নিরঞ্জন। না, আমার বিশ্বাস কোনও আশা নাই! কিন্তু তুমি কি আশা চাও? তুমি ত আত্মহত্যা কর্‌তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অবিনাশ। না না, আমি বোকা পাগলের মত যা তা বলেছি। আমি ও কার্য্য কখন কর্‌তুম না। কাকাবাবু, আমাকে আপনার যে রূপেই হোক্‌ রক্ষা কর্‌তে হবে। আর আপনারও ত খুব বিপদ আছে, আমার মরণের পর পোষ্ট মর্টন পরীক্ষা হলে আপনি খুনের দায়ে পড়্‌বেন তা জানেন।

নিরঞ্জন। পাগলের মত বোক না। তোমাকে কি আমি বলিনি যে ওষুধ দিতে ভুল হয়েছিল। ওষুধ ভুলের জন্য ডাক্তারের কোন দণ্ড হয় না। তার পর যখন তোমার শরীর চেরা হবে (অবিনাশ কাঁপিয়া উঠিল) তখন পরীক্ষায়

হার্টফেলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন সিদ্ধান্ত হবে না। আর এও জেন যে হাঁস-পাতালে তোমাকে চেরার ভার খুব সম্ভবতঃ আমারই উপর পড়্‌বে।

অবিনাশের চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ যাবৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল—আপনি কোন কিছু দিয়ে কি আমাকে বাঁচাতে পারেন না? আপনারই ভুলের জন্য এই কাণ্ড হতে চল্‌ল। সুতরাং আপনার ধর্ম্মজ্ঞানের উপরই আমি নির্ভর কর্‌ছি।

নিরঞ্জন। (কলম হস্তে টেবিলের দিকে মুখ করিয়া গম্ভীর ভাবে) বাবাজী, কি বল্‌ব, দৈবের কাণ্ড কে নিবারণ কর্‌তে পারে। যা হউক, যত দূর ভাব্‌ছি, তাতে তোমার জন্য কোন আশা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তবে তোমার স্ত্রী আমাদের মেয়ের জন্য আমার যত দূর সাধ্য তা কর্‌ব। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয় জান্‌বে, তা তোমারই উপর অনেকটা নির্ভর করে। তুমি বড় মানুষী চাল ছাড়্‌বে, কোনরূপ নেশা কর্‌বে না, তোমার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, সকলের সহিত মিষ্ট ভাবে কথা কহিবে ও ভাল ব্যবহার করিবে। একবারও যদি তোমার মনে কোন দুশ্চিন্তা উঠে আর গোঁ হয়ে থাক, তাহ'লে কিছুতেই তোমাকে রক্ষা করতে পার্‌বে না। আমি দুঃখিত হয়ে বল্‌ছি, স্ত্রীর প্রতি মন্দ ব্যবহারই তোমার সাজা স্বরূপ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

(৪)

কিরে আবার এর মধ্যে এসেছিস্ কেন?

কাকাবাবু,তোমার ওষুধের গুণের কথা বল্‌তে এলেম। তোমার জামাই এখন আর সে মানুষ নয়, একেবারে বদ্‌লে গেছে। এমন দয়ালু ঠাণ্ডা বিবেচক লোক আর দেখি না। তার ব্যাম হয়েছে বল্‌লে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে তার মত ভাল শরীর আর কারও নাই, খাবার যা দিই তাই সন্তুষ্ট হয়ে খায়, বরং আরও প্লেন খাবার কর্‌তে বলে। কাকাবাবু, এ রকম হঠাৎ বদল যেন যাদু বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন দিন রাত্রে ঘুমুতে কেমন দুই একবার গোঁ গোঁ করে, তাতে আমি চম্‌কে যাই ও বড় ভয় পাই। কাকাবাবু, আমি এখানে এসেছিলুম, তা তাকে বল্‌বেন না।

নিরঞ্জন। (হাস্য মুখে) আশা করি জামাইএর ওটাও শীঘ্র ভাল হয়ে যাবে। জামাইএর জন্য কোন ভাবনা করিস্‌নি। অবিনাশ রোজ রাত্রে আমার কাছে আসে, তাতে দেখ্‌ছি সে ক্রমেই ভাল হচ্চে। আর তুই যে এখানে এসেছিলি, তা কখন তাকে বল্‌ব না।

এক সপ্তাহ অর্থাৎ ১৬৮ ঘণ্টা অতীত হইতে অল্প বাকী এমন সময়ে অবিনাশ খুড়শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল, এবং দরজা ভেজাইয়া দিয়া টেবলের সম্মুখে এক চৌকীতে ভয়ে ভয়ে বসিল।

অবিনাশ। (করুণ স্বরে) কাকাবাবু, কিছু করতে পারলেন কি? আপনি একবার বলুন করেছেন। দিনের বেলা আমার মন হ'তে সব খারাপ চিন্তা বেশ দূর করে রাখতে পারি, কিন্তু রাত্রে ঘুমুলে স্বপ্নের সঙ্গে আমি পারি না। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলুম যেন আমার গায়ের চার দিকে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন মারা আছে, তাতে লেখা আছে "এই নিশ্চয় শেষ রাত্রি।" কি ভয়ানক কথা, আমি ভয়ে আঁতকে উঠেছিলুম।

নিরঞ্জন কোন উত্তর না দিয়া আলমারী হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া তাহার খানিক গ্লাসে ঢালিয়া বলিলেন—এই টুকু খেয়ে ফেল।

অবিনাশ এক চুমুকে তাহা পার করিয়া বলিল—কাকাবাবু, আপনি আগে যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তার মত ঠিক এর স্বাদ। আপনি ত ফের একটা ভুল করে বসেন নি?

নিরঞ্জন। সেই ওষুধ আর এ ওষুধ একই, আমি কোন ভুল করিনি।

অবিনাশ (অত্যন্ত ভীতভাবে) "কোন ভুল করেন নি।" আপনি বলেন কি?

নিরঞ্জন। আমি বলছি, যাতে তোমার জ্ঞান হয়, তোমার সংসারে সুখ হয়, তার জন্য আমি একটা মিথ্যাকথা বলিছি ও মিথ্যা অভিনয় করিছি। যখন এক সপ্তাহ আগে সরলা তোমার আত্মহত্যা করার নিষ্ঠুর ভয় দেখান আমাকে বললে, তখন তার হাবভাব দেখে আমি বুঝলুম, যদি শীঘ্র একটা ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে মেয়েটা মারা যাবে। সে প্রথমে তোমার খালী অসুখের কথা বললে, কিন্তু আমি বুঝলুম ভিতরে আরও কথা আছে, এইজন্য ভয় দেখালুম যে সব ব্যাপার যদি খুলে না বলে, তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না। তখন সে বাধ্য হয়ে সব প্রকাশ করল। তখন আমার মনে উঠল, তোমাকে কোনরূপে শোনাতে হবে যে এই জীবন কত সুখের দ্রব্য, তা তুমি মিথ্যা দুশ্চিন্তায় নষ্ট করছ। আর সংসারে থাকতে হলে সামান্য খুঁটী নাটী জ্বালা যন্ত্রণা হতে বড়মানুষ গরিব বৃদ্ধ যুবা কাহারও নিস্তার নাই। ঐ সকল না ধরে, দুঃখ বিলাপ না করে সংসারসুখে নিজে সুখী হওয়া ও অন্যকেও সুখী করা উচিত। দেখ অবিনাশ, জীবন অল্প দিনের জন্য, আপনাকে

অসুখী করে ও তৎসহিত অন্যকে অসুখী করে জীবন উড়াইয়া দেওয়া উচিত নয়। এখন আমি আশা করি তোমার শিক্ষা যেন মিথ্যা হয় না।

অবিনাশ (বিস্মিত ভাবে) কিন্তু কাকাবাবু, আপনার ওষুধটা কি আপনার পায়ে পড়ি তা বল্‌তে হবে। আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

নিরঞ্জন। ওষুধ কিছুই নয়, সাধারণ জলে একটু লুণ ও পেট ভাল রাখবার জন্য জোয়ানের আরক দুই চারি ফোঁটা দেওয়া।

অবিনাশ তখন খুড়শ্বশুরের পদপ্রান্তে পড়িয়া নমস্কার করিয়া ও পদধূলি লইয়া বলিল, আপনি আমার যা কর্‌লেন, তা আর কি বল্‌ব। আপনার সামান্য ওষুধে আমার যা করেছে, হাজার টাকা দামের ওষুধ তা কর্‌তে পার্‌ত না, আমার চোক ফুটিয়ে দেছে, আমাকে মানুষ করেছে। আমি কি মূর্খ বোকাই ছিলাম। এই এক সপ্তাহে আমি জান্‌তে পেরেছি জীবন কি, উহার কত মূল্য, আর আমি কি ভাল ভালবাসার স্ত্রীই পাইয়াছি। কাকাবাবু, আমি যদি অজ্ঞানেও তার প্রতি কখনও কোন খারাপ ব্যবহার করি, তখন যেন আপনি সত্যি ভুল করে আমাকে একেবারে ঠিক করে দেন। নমস্কার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।

ইতিহাসের উপকরণ।

যখন আমরা অতীতের কোন গৌরবোজ্জ্বল কার্য্য বা কোন মহৎ ব্যক্তির জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, তখন সম্মুখে কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক লইয়া বসি। যখন আমরা পরবর্ত্তী বংশধরগণের জন্য বিদ্যমান কালের একখানি সম্পূর্ণ আলেখ্য রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তখনও আমরা কালি, কলম ও কাগজ লইয়া বসি এবং ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হই। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে তাহা ছাপাখানায় পাঠাই। ছাপাখানায় তাহা মুদ্রিত এবং সহস্র খণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। তখন আমরা নিশ্চিন্ত। আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম, আমার সমাজ, আমার সংসার এবং আমার বা আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা আর অচিরস্থায়ী রহিল না। বহুযুগ পরে, যদি আমাদের কথা জানিবার জন্য কাহারও মনে আগ্রহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না,

মদ্রচিত পুস্তক তাহার সকল আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবে। ইহাই হইল একালের রীতি। এবং সম্ভবতঃ বহুশতাব্দী বা বহু সহস্র শতাব্দী পরেও এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রীতির আবিষ্কার হইবে না। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বের রীতি কিরূপ ছিল?

বিগত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুস্তক কেবল কাগজ আর কলম আর কালির সাহায্যেই প্রণীত হয় না। ধ্বংসভগ্ন প্রাসাদ বা দেবালয়, তাহার প্রাচীর, তাহার ইষ্টক, তাহার স্তম্ভাবলী ও তাহার কারুকার্য্য এবং এমন কি দৃশ্যমানা প্রকৃতির স্বহস্তগঠিত শৈলমালাও আমাদিগকে পুস্তকের তুল্য জ্ঞান দিতে পারে। পরন্তু সে জ্ঞান যতদূর বিশদ হইতে হয়!

কিন্তু সাধারণ পুস্তকের মত ইহা তেমন সহজপাঠ্য নয়। বর্ণপরিচয় হইয়া গেলে, একটী শিশুও সাধারণ পুস্তক পাঠ করিতে পারে। কিন্তু বিগত যুগের ইতিহাস,—কেবল বর্ণপরিচয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাঠ করা যায় না। তাহা পড়িতে গেলে প্রৌঢ়োচিত অভিজ্ঞতার আবশ্যক—যে অভিজ্ঞতা জ্ঞান-বিযুক্ত নয়—যাহা আপাত দৃষ্টিপ্রিয় নয়। সুধু কি তাই? ইহার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় চাই, কষ্টসহিষ্ণুতা চাই, ধৈর্য্য চাই, অধ্যবসায় চাই। এতগুলি গুণ বা শক্তির একত্র-সম্মিলন যেখানে হয়,—সেখানেই অতীত যুগের একখানি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, মরজগত হইতে মহাপ্রস্থান করিবার আগে, মানব মাত্রই ধরাপৃষ্ঠে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। এবং এই চেষ্টা সৃষ্টির পর হইতেই আছে। যে আদৌ চিন্তাশীল নয়—সেও ফটোগ্রাফ তোলায়—তাহা যে সুধুই আত্মবিনোদনার্থ, এমন মনে করিও না,—পরন্তু পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহ ভস্মসাৎ বা কবরস্থ হইবার পরেও—পৃথিবীতে যে তাহার অস্তিত্বের একটু ক্ষীণ রেখা রহিল,—ইহা ভাবিয়াই সে নিশ্চিন্ত।

আবার যখন মানব সৃষ্টি হয় নাই—তখনকার ইতিহাসও আমরা পাইতে পারি। তখন প্রকৃতি আমাদের সহায় হন। ভূগর্ভের স্তরে স্তরে বহু প্রাচীন যুগের যে সকল চিহ্নের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহাই আমাদের সকল সন্দেহ নিবারণ করে। ভূগর্ভের বহু নিম্নস্তরে নানা প্রকার চূর্ণীকৃত বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাই। তখন আমরা সহজেই ধরিয়া লইলাম, ভূপৃষ্ঠে আগে বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার উপরের স্তরে দেখি বহুজাতীয় শম্বুকের দেহাবশেষ রহিয়াছে। তখন বুঝিতে কষ্ট হইল না, যে পৃথিবীতে প্রাণপ্রসার কোন জাতীয় জীব হইতে। আরো উপরের স্তরে কত আকারের মাছ, কত আকারের কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর জীবের চিহ্ন। হয় ত আগে তাহারা সাগরে বিচরণ করিত। কালক্রমে

তাহাদের মৃত্যু হইল, তাহাদের অস্থি গুলা জলতলে পড়িয়া রহিল। তাহার কত যুগ পরে সাগর শুকাইয়া গেল, এবং সেই শুষ্ক সাগরের উপরে মৃত্তিকাস্তর সঞ্চিত হইল। ঐতিহাসিক আসিয়া সেই মাটী খুঁড়িলেন এবং ভিতর হইতে বহুযুগপূর্ব্বে মৃত জীবের কঙ্কাল বাহির করিলেন। জীবদেহ-তত্ত্ববিদ্ কঙ্কালের গঠন হইতে তাহার পূর্ব্বাকৃতি, তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন। তখন সে সকল জীবের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণীত হইল। পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন আনুমানিক চব্বিশ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি হইয়াছে। ভূগর্ভের যে স্তরে নরকঙ্কালের সর্ব্বশেষ চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। আগে তাঁহারা দেখিয়া লইলেন, সর্ব্বশেষ মানবস্তরের উপরে, ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি স্তর সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার পর তাঁহারা এক একটী স্তর পড়িতে কত বৎসর লাগে, সে বিষয়ে একটা হিসাব ঠিক করিয়া ফেলিলেন। কথাটা সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ক		ভূপৃষ্ঠ
খ	ভূগর্ভস্থ	১ম স্তর
গ	"	২য় স্তর
ঘ	"	৩য় স্তর
ঙ	"	৪র্থ স্তর
চ	"	৫ম স্তর
ছ	"	৬ষ্ঠ মানব স্তর। এ স্তরের পরে আর মানবের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই।
জ	ভূগর্ভস্থ	৭ম নানাজাতীয় বানরের স্তর
ঝ	"	৮ম নানাজাতীয় স্থলচর, জলচর, আকাশচর ও উদ্ভিদ জীবের স্তর।
ঞ	"	৯ম জলচর জীবের স্তর
ট	"	১০ম শম্বুকাদির স্তর
ঠ	"	১১শ বৃক্ষ স্তর

মনে কর "ছ"—মানবের শেষ স্তর। ইহার আগে আরো পাঁচটী স্তর আছে। এখন, ধর, ভূপৃষ্ঠে একটী মৃত্তিকাস্তর পড়িতে ১ লক্ষ বৎসর লাগে। তাহা হইলে পাঁচটী স্তর পড়িতে পাঁচ লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অতএব, এখন অনুমান করা কঠিন নয়, যে ছয় লক্ষ বৎসর আগে মানবের সৃষ্টি হয়।*

* আমরা যে দৃষ্টান্তটী দিলাম, অবশ্য তাহা সম্পূর্ণ নয়,—কেবল বক্তব্য বিষয়টী একটু বিশদ করিয়া দিলাম। ৭ম ও ৯ম স্তরের মধ্যে আমরা একটী স্তরেই স্থলচর আকাশচর প্রভৃতি নানাজাতীয় জীবসৃষ্টি দেখাইয়াছি। কিন্তু ফলতঃ তাহা নয়। অত গুলি জীব সৃষ্টি হইয়া আবার লয় প্রাপ্ত হইতে অনেকগুলি স্তর লাগিয়াছিল। এ বিষয়ের দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল আভাস দিলাম মাত্র।

কিন্তু সুধু কাল নির্ণয় করিলেই, ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইল না। এখন জানিতে হইবে, যে আদিম যুগে মানবের সভ্যতা কিরূপ ছিল, আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, ঘর বাড়ী কিরূপ ছিল। শারীরতত্ত্ববিদ্ আসিয়া, প্রথম যুগের মানবের দাঁতের গঠন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহারা কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইত।" লাঙ্গুলের অস্তিত্ব দেখিয়া বলিলেন, 'ইহারা সুচারুরূপে লাফ মারিত।' ইত্যাদি। ৬ষ্ঠ স্তরে মানবের প্রথম যুগ। ৫ম স্তরে হয় ত দেখা গেল নানাবিধ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, মাটীর পাত্র প্রভৃতি প্রোথিত রহিয়াছে। সুতরাং সহজেই স্থির হইল, অমুক সময়ে তাহারা দরকার মত জিনিষ পত্র তৈয়ারি করিতে পারিত। এমনি করিয়া অলিখিত ইতিহাসের উৎপত্তি। এইরূপে, কখনও মানবের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যফলে আমরা বহুযুগের ইতিহাস জানিতে পারি আবার কখন—যেখানে ইচ্ছা বলিয়া কোন বৃত্তির অস্তিত্ব নাই—সেখানে প্রকৃতি ঠাকুরাণীর সাহায্যে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না।

মানব যখন সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইল,—যখন সে সভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইল, যখন সে চিন্তাশীল হইল,—তখনকার ইতিহাস পাইবার জন্য আমাদিগকে বেশী কষ্টস্বীকার করিতে হয় না। সে এমন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল, বৃদ্ধ কাল আজ অবধি তাহা ধ্বংস করিতে পারে নাই। অনেক স্থলে, গিরিগাত্রে সে এমন লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছে,—যাহা চিত্তোত্তেজক উপন্যাস অপেক্ষা অল্প হৃদয়-গ্রাহী নয়। সাধারণ লিখিত ইতিহাস সুপাঠ্য হইলেও অনেক স্থলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তকালয়ে অনেক শতাব্দীর শিক্ষা ও শ্রম কয়েক মুহূর্ত্তে অগ্নির লেলিহান জিহ্বার নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির বক্ষে যাহা ক্ষোদিত, তাহার বিনাশ এত সহজে হয় না।

প্রমাণস্বরূপ, অনেক দেশের নাম করা যায়। ইজিপ্তের এক একটী পিরামিড অতীতের এক একখানি সুস্পষ্ট লিপি। অশোকের অনুশাসনলিপি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ধৌলীর বিজন গিরিপৃষ্ঠে ক্ষোদিত থাকিয়া আজ অবধি সর্ব্বমানবের সম্মুখে ধর্ম্মাশোকের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সিরিয়ার অধুনা-বিজন প্রান্তরে, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীসের তরঙ্গবিধৌত দুকূলে পুরাতন সভ্যতার গৌরবাবশেষের উপরে এবং প্রাচীন রোম ও গ্রীসের স্থাপত্য কর্ম্মে আজ অবধি ঐতিহাসিকের বিস্ময় বিহ্বল চক্ষু নিত্য নূতন উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। সেই সকল ধ্বংস কোথাও ইষ্টকচূর্ণে পরিণত, কোথাও এখনও তাহার সুদর্শন অলিন্দ; সুদৃশ্য স্তম্ভাবলী আকাশ চুম্বনোদ্যত, কোথাও তাহার

নিপুণকরগঠিত নরমুণ্ড—যদিও ধূলায় বিলুণ্ঠিত তথাপি মূক নয়—তাহার পাষাণ চক্ষু অদ্যাপি অতীত গৌরবের আভাসে ভাবরম্য !

আবার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য চিহ্ন না পাইলে, যে কোন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, আমাদিগকে এক একখানি ইতিহাসেরই মত জ্ঞানদান করে। কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, যে "Every country makes its own people" সাগর মধ্যস্থ দ্বীপে যদি কোন জাতির আবাস থাকে এবং সে জাতি যদি যথার্থ সভ্য হয় তবে কল্পনা করা কঠিন নয়, সে জাহাজ প্রস্তুত করিতে জানে। কোন পার্ব্বত্য জাতিকে না দেখিলেও আমরা বলিয়া দিতে পারি, তাহাদের দেহ সুদৃঢ় এবং কষ্টসহ। সমুদ্রপারস্থ জাতি যেমন পরিচ্ছদ পরিধান করে, যেমন আহারে পরিতৃপ্ত হয়, পার্ব্বত্য জাতি তাহা হইতে বিভিন্ন পোষাকে সজ্জিত হয় এবং বিভিন্ন আহারে উদর পোষণ করে। তাহাদের উভয়ের বাসবাটী, উভয়ের রাজপথ, উভয়ের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির গঠনপ্রণালী কখনও পরস্পরানুসারী হয় না। এমনি পৃথক বাসের জন্য উভয়ের মনোবৃত্তিও ভিন্ন প্রকার। এবং এইরূপেই কোনো জাতির দেশ দেখিয়া, সেই দেশবাসীর ইতিহাসসম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

এখানে আমি কতগুলি দৃষ্টান্ত দ্বিতে পারি। ইংলণ্ড ও জাপানের অধিবাসীরা সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপে অবস্থান করে। সেইজন্য, এই উভয় জাতিই, তরঙ্গ-উদ্বেল সাগরের উপরে কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা ভালো রূপেই শিখিয়াছে। তাই উভয়েই নৌবলে অজেয়। জাপানে ভূমিকম্প একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই তাহাদের ঘরবাড়ী যতদূর হাল্কা, যতদূর ছোট হইতে হয়! তাহারা জানে কম্পমান ভূখণ্ডের উপরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা অট্টালিকার স্থায়িত্ব অল্প। ল্যাপল্যাণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে বরফ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া দায়। যেদিকে চাও, কেবল বরফ আর বরফ আর বরফ! কাজেই, তাহারা বাধ্য হইয়া সেই বরফকেই কাজে লাগাইয়াছে, তাহাদের ঘরবাড়ী সব বরফের!

বহু যুগ পূর্ব্বে, পারস্য উপসাগরের কূলে যাহারা বাস করিত, তাহাদের ঘরবাড়ী কিরূপ ছিল? এখানে আমাদিগকে আগে দেখিতে হইবে, তাহারা হাতের কাছে বাড়ীঘর তৈয়ারি করিবার উপযুক্ত এমন কি জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে পাইত? "* * nothing but reeds of enormous size, which grew there, as they do now, in the greatest profusion." *

* "The Story of the Nations.—Chaldea." By Zenaide A. Ragozin. P. 38.

তাহার পর দেখিলাম, তাহারা তখন সবে মাত্র সেখানে আসিয়াছে, পরন্তু তাহারা সভ্যতার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। কাজেই বুঝিতে হইবে, তাহারা হাতের কাছে যাহা সুলভ সেই শরবন দিয়াই বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিত! সেখানকার শরবন "cover the marshes in the summer-time, rising often to the height of fourteen or fifteen feet. The Arabs of the marsh region form their houses of this material binding the stems together and bending them into arches, to make the skeletons of their buildings; while, to form the walls, they stretch across from arch to arch mats made of the leaves." *

কিন্তু ঐ দেশে পরে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত কারুশিল্পবিচিত্র প্রাসাদ ও দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানেও আমরা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি। যখন তাহারা অধিক সভ্য হইল,—তখন তাহাদের বাসনা আরো উচ্চে উঠিল। এবং ইহাই জাগতিক সভ্যতার চিরন্তন রীতি। তাহারা দেখিল, এখন যে সকল সামান্য ও তুচ্ছ পদার্থ দ্বারা মাথা রাখিবার ঠাঁই হইতেছে, একটী সমৃদ্ধি-সুন্দর নগর স্থাপন করিতে বা রাজার বাসোপযুক্ত প্রাসাদ বা উপাস্য দেবতার জন্য দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে, তাহা আদৌ উপযুক্ত নয়। সভ্য মানবের পক্ষে আরও বেশীর দরকার। "And they said to one another, Go and let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone and lime for mortar." † অভাবই উন্নতির সোপান। এবং সেই অভাবের জন্য চেতনা, মানবের মনের উপরে, কিরূপে একের পর আর এক—এমনি ভাবে ক্রমান্বয়ে আঘাত করিতে থাকে,—তাহাও আমরা একটু বেশী চিন্তাশীল হইলেই ধারণা করিয়া লইতে পারি। এই ধারণা-শক্তির উপরেই অতীত যুগের ইতিহাস রচনার সাফল্য নির্ভর করে। নতুবা, সুধু তত্বানুসন্ধিৎসা থাকিলেই এই কাজে সফলমনোরথ হইতে পারা যায় না।

সাধারণ লিখিত ইতিহাস সকল সময়ে আমাদিগকে ধ্রুবের পথে লইয়া যাইতে পারে না। অনেক সময়ে ভ্রমপ্রমাদে তাহা অপাঠ্য। অনেক সময়ে জাতিগত বিদ্বেষে তাহা অস্পৃশ্য। অনেক সময়ে মিথ্যা কথায় তাহা কলঙ্কিত।

* "Rawbinson's" Five Monarchies Vol. I. P. 46.

† Genesis. XI. 3

হয় ত কেহ নিজে না দেখিয়া, কেবল পাণ্ডিত্য, কল্পনা ও অপরের গ্রন্থের সহায়তায় অন্য কোন দেশের একখানি ইতিহাস রচনা করিলেন। এরূপ স্থলে, সে ইতিহাসে অনেক সিদ্ধান্তেই ভ্রম থাকা সম্ভব, এবং তাহা থাকেও। হয়ত, বিজেতা কর্ত্তৃক কোন বিজিত দেশের ইতিহাস রচিত হইল। সেখানে বিজিত দেশের যাহা ভালো, তাহা মন্দ রূপেই চিত্রিত হয়। অন্ততঃ, এই নিয়মই সাধারণতঃ দেখা যায়। ইহার ব্যত্যয় থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার্য্য নয়—কিন্তু তাহা কয়েকটি স্থানে? হয় ত কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক, আপনার বিষম পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য, মিথ্যার পরে মিথ্যাবাক্য সাজাইয়া, তাহার উপরে সত্যের প্রলেপ মারিয়া দেন। ফলে পরবর্ত্তী লেখকেরা ভ্রান্ত-মতের ইন্দ্রজালে আলোচ্য বিষয় হারাইয়া ফেলেন। সাধারণ লিখিত ইতিহাসে এমনি অনেক ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতি কখনো মিথ্যাবাদিনী নন। তিনি যাহা বলেন, যাহা দেখান তাহা তাঁহার আলোক ছায়ার স-লীল আবর্ত্তনেরই মত সত্য, তাহা তাঁহার কানন-রবাবের অশ্রান্ত মর্ম্মর রাগিণীরই মত ধ্রুব। যদি তাহাতে ভ্রমের রেখাপাত দেখা যায়, তবে তাহা আমাদেরই বুঝিবার ভুল। নির্জ্জন ও শান্তস্তব্ধ গিরির পাষাণ বক্ষে অদ্যাপি যে অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া যায়—তাহা অতীতযুগের অমলিন দর্পণ!—সে মৌন পাষাণ কখনো জাতিগত বিদ্বেষকে সত্য বলিয়া প্রচার করে না—মিথ্যা কাহিনীকে কখনো সত্যের ছদ্মাবরণে ঢাকিয়া রাখে না। সে যাহা সত্য বলে, তাহা সত্য,—যাহা মিথ্যা বলে,—তাহা মিথ্যা। মানবের আবশ্যক মত তাহা রূপান্তরিত হয় না—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা বিভ্রমের রহস্য সৃষ্টি করে না। এই যে অযুত শিল্পকীর্ত্তি—নভোচুম্বী প্রাসাদ—স্বর্গপ্রতিম দেবধাম, তরুচ্ছায়াসুপ্ত প্রাচীন রাজপথ—অমলজল জলাশয়—ইহারা আজ মহাকালের ত্রিশূলপ্রহারে পূর্ব্বগৌরবচ্যুত বটে,—কিন্তু তথাপি ইহারা সেই শিবের শাশ্বত নির্ম্মাল্যে পূতঃ—ধ্রুবের অনাহতা বাণীতে চিরমান্য! ইহাদের আলেখ্যে যে লেখাটী অর্পিত আছে—আজ বা কাল কেহ তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না।

ঐতিহাসিকের নিকটে আর একটী অনুধাবনযোগ্য বিষয়,—জনপ্রবাদ বা প্রাচীন কাহিনী। যেখানে লিখিত ইতিহাস মূক,—সেখানে জনরব অবলম্বন করিলে, অনেক সময়ে স্থির সিদ্ধান্তে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। যদিও, প্রাচীন অবদানে কল্পনার অভাব নাই—তথাপি অনেকগুলি কাহিনী একত্র করিলে যদি

তাহারা এক বিষয়ক হয়,—তবে তাহার ভিতরে একটী আলোচনা যোগ্য সারূপ্য পাওয়া যায়। এই যে সারূপ্য,—একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে, ইহার ভিতরে প্রকৃত ঘটনার একটী মূলসূত্র পাওয়া যাইতে পারে, এবং যেখানে এই মূলসূত্র পাওয়া যায়—সেখানে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। পরন্তু, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বহুদেশের প্রাচীন ইতিহাস এই নিয়মেই সংগৃহীত হইয়াছে।

আবার এই জনপ্রবাদ বা প্রাচীন কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান আছে। চিতোর যখন শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তখন চিতোরের দৃপ্ত সামন্তগণ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ কিরূপে অম্লান সাহসে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, রাজর্ষী প্রতাপ, কিরূপে রাজভবনের প্রমোদোৎসব পরিত্যাগ করিয়া দীনের মত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, দুরারোহ গিরিকন্দরে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, এবং চিতোরের বীরপ্রসূ রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার্থ কিরূপ আনন্দ সহকারে অগ্নির সর্ব্বনাশী বিসর্পিত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাহা আজও রাজপুত ভট্টকবিগণের উদাত্তকণ্ঠে গীত হয়। টড সাহেব যদি এই ভট্টকবিগণের সাহায্যপ্রাপ্ত না হইতেন,—তাহা হইলে তাঁহার "রাজস্থানে"র অমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সম্পাদন আমরা দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৬০৬ বৎসর আগে নাইনিভে নামক বিখ্যাত নগরী ধ্বংসমুখে পতিত হয়। বহু শতাব্দী সে পূর্ণ আত্মগৌরবে দণ্ডায়মানা ছিল। টাইগ্রীসের স্বচ্ছসলিলে তাহার গঠনসুন্দর প্রাসাদ সকল প্রতিবিম্বিত হইয়া এক স্বর্গশোভার সৃষ্টি করিত। সৈন্যের পর সৈন্যদল তাহার সিংহদ্বার দিয়া বহির্গত হইত এবং বিজিত দেশের মূল্যবান সম্পদ লইয়া আবার ফিরিয়া আসিত। আবার যখন তাহার কাল পূর্ণ হইল, তখন কিরূপে বিদেশাগত শত্রুসৈন্যগণ তাহার উপরে পতিত হইয়াছিল, কিরূপে দুই বৎসর কাল সে অবরুদ্ধা ছিল, কিরূপে উচ্চ নদী তরঙ্গ তাহার প্রাচীর ভাসাইয়া দিয়াছিল এবং কিরূপে তাহার স্বাধীনতাদীপ্ত ও আত্মসমর্পণবিমুখ শেষ রাজা অগ্নিদ্বারা আপনাকে ও আপনার রাজধানীকে ভস্মীভূত করিয়া দিয়া পরাজয় অপমান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন,—প্রাচীন জনপ্রবাদ অদ্যাপি লোকমুখে সগর্ব্বে উচ্চারিত হইয়া, তাহা বর্ণন করে।

এইরূপ সর্ব্বত্র। এতক্ষণে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম, সাধারণ লিখিত ইতিহাসই, ঐতিহাসিকের একমাত্র অবলম্ব নয়। ধ্বংসভগ্ন প্রাসাদাবশেষ

বা চূর্ণিত দেবালয় বা প্রাচীন শিলালিপিও অনেক তথ্য প্রদান করিতে পারে। কোন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান দেখিতে পাইলেও আমাদের উদ্দেশ্য কিয়ং পরিমাণে সফল হইতে পারে, এবং সাধারণ লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা, এই পন্থাই ঐতিহাসিকের পক্ষে অধিক নিরাপদ। পরন্তু প্রাচীন জনপ্রবাদ বা অবদানেও আমরা ইতিহাসের বহু উপকরণ পাইতে পারি। কেবল, এই নিয়মানুবর্ত্তী হইলে একটু পর্য্যবেক্ষণ শক্তির আবশ্যক।

আমরা বাঙালী ঐতিহাসিকগণকে এই পথে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা বৃথা চর্ব্বিত চর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপন্থার পথিক হইলে, এবং স্বাধীন গবেষণাশক্তির পরিচয় প্রদান করিলে, বঙ্গসাহিত্যের একদিকের অভাব অচিরেই দূর হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর

সভ্যতার আদিভূমি, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় ক্ষেত্র, বর্ব্বরতার তমসাবৃত্ত প্রাচীন জগতের দেদীপ্যমান যশোজ্জল আর্য্যাবর্ত্ত ও মিশরের স্মৃতি কোন্ ইতিহাস পাঠকের নিকট মনোরম নহে? সংখ্যাতীত সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়ের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যসলিলা গঙ্গা যমুনা যেমন আমাদিগের নিকট আজিও পূজ্য, মিশরদেশপ্রবাহিত প্রসিদ্ধ নাইল নদও তেমনি জাতীয় জীবনের উন্মেষ ও অধঃপতনের নীরবদ্রষ্টা—নাইলও একদিন সহস্র সহস্র উপাসকের পূজা গ্রহণ করিয়া শস্য শ্যামল মিশরের ভিতর দিয়া সাগরসঙ্গম প্রয়াসে ছুটিত। হিন্দুস্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পার্ব্বতী প্রভৃতি বহু নামে ভগবান যেমন লক্ষ লক্ষ ভক্তের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন, মিশরেও তেমনি তিনি আইসিস,অসিরিস প্রভৃতি বহু নামে আরাধ্য হইয়াছিলেন। আর্য্যজাতি অধঃপতিত হইলেও এখনও জগত হইতে হিন্দুর নাম লোপ পায় নাই। মিশরে তথাকার মহাপুরুষের বাক্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই মহাজন হারমিশ ট্রিসমেজিষ্টস (Hermes Trismegistus) গ্রন্থপ্রণেতা একদিন গম্ভীরমন্দ্রে বলিয়াছিলেন—"মিশর,মিশর, তোমার ধর্ম্মের কেবল মাত্র অস্পষ্ট গল্প বর্ত্তমান থাকিবে, সে সব কথা ভবিষ্যতে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না, আর

তোমার পবিত্রতার কথা প্রস্তরে খোদিত থাকিবে মাত্র। তোমার ঈশ্বরত্ব স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে। দেব ও মানব বর্জ্জিত মিশর মরুভূমিতে পরিণত হইবে।"

প্রায় একই কালে * ভারত ও মিশর যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই দুই প্রদেশের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ চেষ্টায় তাঁহাদিগকে বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের বেদ বেদান্ত, সাহিত্য উপনিষদ, জ্যোতিষ গণিত, কাব্য ও কবিতা, রামায়ণ মহাভারত এমন কি পাণিনি মুগ্ধবোধের রাশি রাশি উদাহরণের মধ্যে কোথাও তাঁহারা এ সম্বন্ধের একটু ক্ষীণ সূত্রও খুঁজিয়া পান নাই। ভারতের প্রাচীন সৌধ প্রাচীরে, জীর্ণ দেব মন্দিরে বা গিরিগুহায় যে সকল স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন আছে তাহাদের মধ্যে কোথাও মিশরীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত নাই। অপর পক্ষে মিশরের পিরামিড দেব মন্দির বা গিরি খোদিত চিত্রাদিতে কোথাও হিন্দুজাতির নামোল্লেখ নাই। এতদুভয় জাতি আপনাপন মাতৃভূমিতে বসিয়া আপনাদের সভ্যতার পরিণতি করিয়াছিল।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক বিষয়ে পৃথিবীর বহুজাতিকে একই প্রকারের অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তিত করিতে দেখা যায়। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে প্রাচীন মিশরবাসী ও প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনুরূপ প্রথা প্রচলিত বলিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই। জ্ঞান ও শিল্পে উভয় জাতিই সমান ভাবে উন্নত হয় নাই। কোন বিষয়ে মিশরবাসী অপেক্ষা হিন্দু এবং অনেক বিষয়ে মিশরবাসী হিন্দু অপেক্ষা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

হিন্দুস্থান যেমন বহুভাগে বিভক্ত ছিল প্রাচীন মিশর তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত ছিল না। প্রথমে মিশর দেশ মেম্ফিস ও থিব্‌স্‌ দুই প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সেই এক সম্মিলিত মিশর জাতি প্রায় তিন সহস্র বৎসর নাইল নদতীরে বাস করিয়া প্রভূত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিল। মিশরবাসীগণ আপনাদের মাতৃভূমিকে মিশর বা ইজিপ্ট বলিত না। এ দুইটিই বিদেশীয় শব্দ। ইজিপ্সিয়গণ আপনাদিগকে "রোমেতু" বা মনুষ্য বলিত এবং তাহাদের স্বদেশকে কমিট বা কৃষ্ণদেশ বলিয়া অভিহিত করিত। মিশর শব্দ আরবী মিশর ও হিব্রু মিস্‌রেম হইতে প্রাচ্যের সকল দেশে প্রসিদ্ধি লাভ

* পণ্ডিতগণ বলেন ইজিপ্টের ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ, ৪৪০০ বৎসর হইতে আরম্ভ এবং বেদ ২০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রচিত। আমাদিগের গণনায় বেদ আরও প্রাচীন।

করিয়াছে। আর ইজিপ্ট শব্দ গ্রীক ইজিপ্টস (Aeigyptoo) হইতে সকল ইয়ুরোপীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইজিপ্ট বহুগুণ ক্ষুদ্র। সেই কারণেই সমগ্র মিশর একচ্ছত্রীভূত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু তথায় এই সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়াই প্রায় তিন সহস্র বৎসর এই সুসভ্যজাতি চতুর্দ্দিকের কম সভ্য জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ পরস্পর বিরোধী গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গে বিভক্ত ছিল বলিয়া বিদেশী আক্রমণের সময় ভারতবাসীর কি লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছে।

বলা বাহুল্য সাধারণহিসাবে এই দুই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন জাতির কোনও ইতিহাস নাই। কাহার পর কোন্ রাজা সিংহাসনে বসিলেন, তিনি কোন্ দেশ পরাজয় করিয়া আপনার রাজত্বের সীমা বর্দ্ধিত করিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে কি নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইল,জাতীয় জীবনের এইরূপ ধারাবাহিক গল্প ভারতবর্ষে একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাব্য ও জ্যোতিষ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রকম সাহিত্য ও বিজ্ঞানের রাশি রাশি পুস্তক কিন্তু প্রাচীন আর্য্যজাতি আপনাদের হতভাগ্য সন্তানদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের হস্তনির্ম্মিত শিল্প ও স্থাপত্য কালের ও বিদেশী বিজেতৃবর্গের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া আজিও সমগ্র ভারতবর্ষে হিমাচল ও সাগরবেষ্টিত পুণ্যভূমির প্রতিভাবান প্রাচীন অধিবাসীবৃন্দের যশ ঘোষণা করিতেছে। চীন, গ্রীক ও আরব পরিব্রাজকদিগের লেখনী হইতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মাহাত্ম্যের ভূরি ভূরি বর্ণনা প্রাপ্ত হই। এই সকল উপকরণ হইতে অধুনা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, এই প্রাচীন প্রাচ্যজাতির রাজনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং সেই চিত্রে প্রতিফলিত আদর্শ জীবন দেখিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ চমৎকৃত হইয়াছেন।

মিশরের ইতিহাসের যে সকল উপকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা প্রায় তিন সহস্র বৎসরের মিশরাধিপতিদিগের নাম জানিতে পারি এবং মিশরবাসিদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কতক আভাস প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু তাহাদের মানসিক ক্রমোন্নতির ও জ্ঞানোন্মেষের সোপানগুলির পরিচয় আগেই দেখিতে পাই না। ইজিপ্টের ইতিহাস প্রণয়নের উপকরণ তাহাদিগের চিত্রলিপি (hieroglyphics) স্মৃতিমন্দির ও দেবমন্দির খোদিত চিত্রাবলী ও চিত্রলিপি, মিশররাজদিগের সমাধিমন্দির এবং তাহাতে খোদিত

নরপতিদিগের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ। অস্মদ্দেশীয় ভূর্জ্জপত্র লিখিত পুঁথির মত, মিশরে প্যাপিরস বৃক্ষের বল্কলে লিখিত কতক দেশীয় সাহিত্য আধুনিক ইতিবৃত্ত-কারদিগের হস্তগত হইয়াছে। এ সকল প্যাপিয়স পুঁথিও মিশরের ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত মিশর ভ্রমণকারী, গ্রীকদিগের লেখনী মিশরের বর্ণনায় পূর্ণ।

এই দুই জাতির ইতিহাসের উপকরণ তুলনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ইতি-বৃত্তকার রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের ইতিহাসের উপকরণ ও অপরজাতির ইতিহাসের উপকরণে বিশেষ প্রভেদ আছে। "মিশরের চিত্রলিপি হইতে রাজা-দিগের ও পিরামিড্ নির্ম্মাতাদিগের নাম ও রাজবংশের এবং যুদ্ধের তালিকা ব্যতীত বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।" প্রস্তর খোদিত কাহিনী বা প্যারিরাস লিখিত বর্ণনায় কেবল বিশেষ ঘটনার উল্লেখ থাকে মাত্র। "কোনও জাতির গীত স্তোত্র বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উচ্ছ্বাস তাহাদের সভ্যতার এবং ভাবের সুন্দর অথচ প্রকৃত প্রতিচ্ছায়া। হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রথম উচ্ছ্বাসরাশি লিখিত হয় নাই সুতরাং সে গুলি সম্পূর্ণ এবং অপ্রতিহত বলিয়া মনে হয়। তাহারা জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় ভাবের স্বাভাবিক ও প্রকৃত ভাষা।"

আমরা মিশরের ইতিহাসে জাতীয় জীবনের বহির্ম্মুখী প্রতিভার পরিচয় পাই কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই মহৎ জাতির হৃদয়ের আভাস প্রাপ্ত হই, তাহাদের ক্রমিক ভাবোন্মেষের পরিচয় পাই এবং সে কাহিনী হইতে সেই মহৎ জাতি কিরূপে আধুনিক অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারি।

রাজশক্তি সম্বন্ধে মিশরবাসী এবং হিন্দুদিগের ধারণা প্রায় অনুরূপ ছিল। এতদুভয় প্রাচীন দেশে রাজ্যশাসনের প্রণালী প্রায় একই রকম ছিল। কেবল এই দুই প্রদেশে কেন চীন পারস্য আশীরিয়া প্রভৃতি সকল প্রাচীন দেশ মাত্রেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা এ সকল দেশে কখনও প্রজাবৃন্দের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। সময়ে সময়ে অত্যাচারী নরপতির বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহ হইয়াছে বটে, প্রজামণ্ডলী রাজবংশের অপর একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে রাজ-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া দেশের অভিষিক্ত রাজাকে সিংহাসনচ্যুতও করিয়াছে। কিন্তু সেই সিংহাসন শূন্য রাখিয়া আপনাদের প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসন করি-বার বাসনা এ সকল জাতির মনোমধ্যে কখনও উদিত হয় নাই। তাহারা এক নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে অপর ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত

করিয়াছে। নরপতিবিহীন রাজত্বের ধারণা প্রাচ্যের লোক কখনও মনোমধ্যে আনিতে পারে নাই। এ ধারণার সৃষ্টি প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীস হইতে রোমে এই ভাব প্রবেশ লাভ করিয়া শেষে সমস্ত ইয়ুরোপে ইহা বিস্তৃত হয়। সে ভাব মিশরে বা ভারতে কোনও কালে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে যেমন যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতোনৃপঃ এ ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ছিল ইজিপ্তে লোকও তেমনি জানিত যে দেশের রাজা জগদীশ্বরের প্রতিনিধি।

নরপতি পবিত্র, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁহার শক্তি সর্ব্বপ্রধান ইত্যাদি ধারণা দেশ মধ্যে বিস্তৃত থাকিলেও রাজশক্তি ভারতবর্ষে বা মিশরের অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতে পারিত না। রাজার স্বেচ্ছাচারিতার একটা সীমা ছিল। রাজশক্তি দমনের কতকগুলা উপায়ও রাষ্ট্র মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিত। ভারতে রাজ্যেশ্বরকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মন্ত্রণা লইয়া কার্য্য করিতে হইত, তাঁহাকে মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের বিধান মানিয়া চলিতে হইত, রাজকুলোদ্ভূত অপরাপর রাজকুমারদিগের ষড়যন্ত্র ও রাজ্যলাভের চেষ্টার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যও তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রজারঞ্জন হইতে হইত *।

প্রফেসার আরমান (Erman) মিশরের রাজশক্তির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের মত প্রাচীন মিশররাজ সর্ব্বজন পূজ্য হইলেও অপ্রতিহত প্রভাবে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া রাজদণ্ড পরিচালিত করিতে পারিতেন না। তিনি বলেন অত্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিকেও সর্ব্বদা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণজাতি রাজার উপরেও আধিপত্য করিত মিশরেরও যাজকগণ সততই আপনাদের শক্তিদ্বারা রাজশক্তি দমন করিবার চেষ্টা করিত। বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাজপুরুষগণও একটা শক্তি লাভ করিত। ইহা ব্যতীত সমর বিভাগের নেতাগণকেও মিশররাজ অশ্রদ্ধা দেখাইয়া যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্যে নরপতিরা অধিক সম্মান পাইতেন বলিয়া তাঁহারা ঠিক ইংরাজী অর্থে প্রাচ্য যথেচ্ছাচার বা oriental despots ছিলেন। আমাদের দেশের মত মিশর দেশেও রাজভক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

---

* এ বিষয়ে ২য় বর্ষের অর্চ্চনায় "ভারতে রাজশক্তি" নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ধারাবাহিকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

অস্মদ্দেশে যেমন রাজন্যবর্গ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় হইতেন, মিশররাজ কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। অবশ্য মিশরে ভারতবর্ষের মত জাতিভেদ প্রচলিত ছিল না। তবে সাধারণতঃ লোকে পিতৃবৃত্তি অবলম্বন করিত। মিশরের রাজা প্রত্যেক ধর্ম্মকর্ম্মে প্রধান পুরোহিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন,* তিনি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ছিলেন। মিশরে কেবল রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইত না। মৃত্যুর পরেও তাঁহার প্রতি ইজিপ্সিয়গণ যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। মিশরে মৃত্যুর পর মৃতদেহ ঔষধাদি লেপিত হইয়া শবগৃহে সুরক্ষিত হইত। এই সকল রাজন্যবর্গের প্রাণ পরিত্যক্ত দেহ অতি পবিত্র বিবেচনা করিয়া মিশরবাসীগণ সুগঠিত অট্টালিকা পিরামিড মন্দিরাদির ভিতর রাখিয়া দিত। কালের অত্যাচারকে পরাজিত করিয়া ঐরূপ কতকগুলি শবদেহ অধুনা ইয়ুরোপীয় মিশরতত্ত্ববিদ (Egyptologist) দিগের হস্তগত হইয়াছে। প্যারিস ও লণ্ডনের মিউজিয়মে সে গুলি রক্ষিত হইয়াছে।

সিংহাসন মিশরেও বংশজাত ছিল। রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার নিকট আত্মীয় রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন। মিশরে স্ত্রীলোকের অধিক সম্মান ছিল বলিয়া রাজার কন্যা রাজপুত্র অবর্ত্তমানে সিংহাসনাধিরোহণ করিতেন।

প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মত প্রাচীন মিশরবাসী শান্তিপ্রিয় ছিল। অবশ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মিশরাধিপতি ফারাওদিগকে একদল সেনা সর্ব্বদা সজ্জিত রাখিতে হইত। অর্থের লোভ দেখাইয়া বিজাতীয় বা দেশীয় মায়া মমতাহীন বন্ধনহীন বেতনভোগী যোদ্ধা দ্বারা স্বদেশ রক্ষা বিধিমতে হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রাচীন মিশরবাসীগণ সৈনিকদিগের অন্তরে স্বদেশহিতৈষণা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ভূমি দান করিত। সুতরাং দেশের স্বার্থের সহিত তাহাদিগের স্বার্থ বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিত। সৈনিক শ্রেণী দেশমধ্যে বেশ সম্মানিত হইত। ইতিবৃত্তকারেরা বলেন, যাজন ও যুদ্ধ মিশরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজবংশের যুবকগণ এতদুভয় বৃত্তির একটি অবলম্বন করিতেন।

কোন কোন গ্রীক লেখক বলেন যে মিশরে জাতীয় সৈনিক ব্যতীত বেতনভোগী বিদেশী সৈন্যও নিযুক্ত হইত। অনেক লেখক বলেন যে তাহারা ঠিক বেতনভোগী সৈন্য নহে; তাহারা মিশর কর্ত্তৃক পরাজিত করদ ও মিত্র রাজন্যের চমূ এবং মিশরকে সমরে সাহায্য করিত।

সৈনিকদিগকে স্ব স্ব অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। প্রাচীন ভারতবাসীর মত তাহারা সাধারণতঃ তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত। ইহা ব্যতীত তাহারা বল্লম সড়্‌কী, খড়্গ তরবারী, ছোরা ছুরি, কুঠার গদা প্রভৃতি লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিত। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা বৃহৎ চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল ও ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্ম ব্যবহার করিত।

ভারতে হস্ত্যশ্বরথপদাতি চতুরঙ্গ সেনা প্রসিদ্ধ, মিশরে রথ ও পদাতি দুই শ্রেণীতে সৈনিকগণ বিভক্ত হইত। রণক্ষেত্রে হস্তী এবং অশ্বের ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। সমর প্রাঙ্গনে সাধারণতঃ প্রত্যেক রথে দুইজন করিয়া আরোহী থাকিত, একজন সারথী, একজন যোদ্ধা। হিন্দুদের রথশিরে উড্ডীয়মান পতাকা যেমন আরোহীবীরের পদমর্য্যাদা ঘোষণা করিত, মিশরের রথের পশ্চাদ্ভাগে দোদুল্যমান নিশান রথীর পরিচয় প্রদান করিত। প্রত্যেক রথী নিজ নিজ রথ লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইতেন।

মিশরের মন্দির প্রাচীরে যে সকল যুদ্ধের চিত্র আছে তাহাতে নৃপতি স্বয়ং একাকী এক রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন ইহা বুঝা যায়। তাঁহার শরীরে অশ্ববল্গা জড়াইয়া দুই হস্তে তিনি তীর ধনুক লইয়া শত্রু ক্ষয় করিতেছেন এইরূপ চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের রথ কাষ্ঠনির্ম্মিত। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে দুই দলের সৈন্য নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা রথ হইতে অবতরণ করিয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিত।

পাঠান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরের মধ্যে যে সকল যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহাতে অযথা নরহত্যা বা পরাজিত শত্রুর লাঞ্ছনা বা বর্ব্বরতার লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু মামুদ গজনীর আক্রমণে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন, নিরপরাধীর রক্তপাত প্রভৃতির কাহিনী ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এস্থলে মিশরের বিদেশী কর্ত্তৃক স্বাধীনতা অপহরণের ইতিহাসের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। এই ঘটনার পর মিশরবাসীগণ কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছিল। কিন্তু মিশরের সে দীপ্তি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা সদৃশ ক্ষণিকপ্রভা।

মিদিয়া, চালদী প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অগ্নি উপাসক প্রাচীন পারসিকজাতি সবেমাত্র পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সাইরসের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ক্যামবাইসস মিশর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিতেছিলেন। তিনি মিশরপতি দ্বিতীয় আহমেশের (Aahmes) নিকট বিবাহ

করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার এক কুমারী কন্যা চাহিয়া পাঠাইলেন। মিশর গৌরবজ্যোতিঃ তখন ম্লান হইয়া আসিতেছে এবং তরুণ তপন সদৃশ পূর্ব্বদিকে দিনে দিনে পারস্য রাজ বলবীর্য্যে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছেন। গর্ব্বিত ইজিপ্সিয় জাতি একদিকে বিদেশী সম্রাটকে রাজকুমারী দান করা যেমন ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিল অপর দিকে তাহারা তেমনি উদীয়মান পারস্যজাতির সহিত শত্রুতা করিতে সাহসী হইল না। আহমেশ একটি অমাত্যের কন্যাকে নিজ তনয়া বলিয়া পারস্যে পাঠাইয়া দিলেন।

স্ত্রীচরিত্র সকল দেশেই সমান। এই যুবতী পারস্যাধিপের স্নেহে ভুলিয়া অধিক প্রেম লাভের বাসনায় তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিল। ইতিমধ্যে আহমেশ ইহলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার পুত্র তৃতীয় সামটেক (Psamthek III.) মিশরের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন। কামবাইসস মিশরে অভিযান করিলেন। কোন কোন মুসলমান যোদ্ধা হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ইনি, ধর্ম্মপ্রাণ মিশরবাসীদিগকে সেই কৌশলে পরাস্ত করিলেন। তিনি সৈন্যব্যূহের সম্মুখে বিড়াল কুক্কুর গবাদি পশুর পাল লইয়া অগ্রসর হইলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে গরু যেরূপ অবধ্য ইহাদিগের নিকট ঐ সকল পশু তেমনি অবধ্য ছিল। মিশরীয় সেনাগণ সভয়ে তীর নিক্ষেপ করিতে পারিল না। যুদ্ধে পারস্যাধিপতি জয়ী হইলেন। মিশররাজ বন্দী হইলেন।

যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়ী কামবাইসস তাঁহার প্রতি অবমানের প্রতিশোধ লইলেন। রাজকন্যাকে ক্রীতদাসীর পরিচ্ছদ পরাইয়া অন্যান্য সম্ভ্রান্তা কুলললনাদের সহিত কলসী কক্ষে জল আনাইতে পাঠাইলেন। বন্দী মিশররাজ শত্রুপুরীতে বসিয়া নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে তাঁহার সম্মুখ দিয়া তাঁহার পুত্র ও তদীয় সমবয়স্ক দ্বিসহস্র যুবককে মুখে লাগাম দিয়া কটীদেশে রজ্জু বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

এই দুই জাতির বিদেশীয়দিগের দ্বারা পরাজয়ের কাহিনী হইতে একটা অতি উত্তম শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দী শত্রুর বল বুঝিয়া তাহাদের সহিত সাহস বিক্রম কৌশল সকল বিষয়ে সমকক্ষ হইতে না পারিলে পশুবলে তাহাদিগকে পরাজয় করা অসম্ভব, এ নীতি উপেক্ষা করিয়া মিশর ও ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সমসভ্যজাতির সহিত সমর করিবার সময় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দূষণীয় হইতে হয়, কম সভ্য জাতির সহিত রণকালে যে সকল নিয়ম মানিতে

গেলে বিধ্বস্ত হইতে হয়। প্রত্যেক মানবের পক্ষে যাহা সত্য সভ্যজাতির পক্ষেও তাহা সত্য। দেহ ও মন উভয়ের সমান অনুশীলন ব্যতীত মানব যেমন সুখে প্রাণধারণ করিতে পারে না তেমনি কেবলমাত্র পশুবল বৃদ্ধি করিয়া বা কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশীলন করিয়া কোন জাতি সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক ইউরোপ এ শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিয়াছে বলিয়া আজ ইউরোপীয়েরা জগতের নেতা।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য।

এ যুগের উপন্যাস।

[লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।]

ইংরাজী সাহিত্যের সে গৌরবোজ্জ্বল যুগ গত। কোথায় এখন সার ওয়াল্টার স্কট, কোথায় এখন চার্লস ডিকেন্স, কোথায় এখন লর্ড লিটন! যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা আর আসেন নাই। যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সে শক্তি নাই। কিপ্‌লিং এখন "বাঁশবনের শিয়াল-রাজা", —হ্যাগার্ড এখন পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থে মহাধনী। এই পর্য্যন্ত! এ যেন এক রূপার কাটির স্পর্শে অকস্মাৎ ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কে জানে, এ ঘুম যুগান্তে ভাঙ্গিবে কি না!

সম্প্রতি, ইংলণ্ডে এই সাহিত্যিক সাম্রাজ্যে উপন্যাস দুর্ভিক্ষের কারণানুসন্ধানের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা একজনের রচনা হইতে কতক অংশ তুলিয়া দিলাম।

"এ যুগের অধিকাংশ উপন্যাসের মধ্যে, যে কোন একখানা গ্রহণ করিলে,—সর্ব্বাগ্রে একটী বিষয় চোখের সামনে পড়িয়া যায়। তাহা ঘটনা বৈচিত্র্য। বিগত যুগের উপন্যাসেও যে ঘটনা-বৈচিত্র্য ছিল না, তাহা নয়। ছিল,—কিন্তু একসুরে বাঁধা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে, উপন্যাস ক্ষেত্রে ঘটনা বৈচিত্র্য অসাধারণ। পড়িতে পড়িতে বেশ বোঝা যায়,—যেন চরিত্র সৃষ্টি বা কোন একটা চরিত্রে সম্পূর্ণতা প্রদান, লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান ঘটনা; তিনি চান পাঠকের চিত্তোত্তেজনা, তিনি চান শ্রোতার আগ্রহ বাহুল্য! এবং যিনি এই কার্য্যে যত বেশী সিদ্ধহস্ত, তাঁহার উপন্যাসের প্রচারও তেমনি অধিক! এক এক জন প্রসিদ্ধ লেখক একেবারেই কষাই—তাঁহাদের উচ্চ নীচ বাছাই নাই—তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছেন,—একটা খুনখারাপি—একটা রক্তারক্তি করিতেই হইবে,—যাহাতে পাঠকের রোমহর্ষণ ঘটিবে—যাহাতে দুদিনে একলক্ষ কপি বিক্রয় হইবে।

তবে একটা উপকার,—যাহা বিগত যুগে ছিল না—বিদ্যমানকালে উপন্যাস ক্ষেত্রের প্রসার বাড়িয়াছে। নায়ক এখন সুদূর ভারতে বা তিব্বতে গিয়াও প্রণয়িনী সংগ্রহ করে। বাষ্পীয় যান—এখন সুদূরকে নিকট করিয়াছে। যে দেশ অজ্ঞাত ছিল,—তাহা এখন মণ-দর্পণে প্রতি-

ভাত। কিন্তু ইহার সহিত, উপন্যাসরাজ্যে একটী দোষও প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল-কার এক একখানা উপন্যাস যেন আগ্রহবর্দ্ধক ভ্রমণ-কাহিনী! তাহার নায়ক নায়িকা যেন কেহ নয়,—লেখকই যেন সব। যেখানেই অবসরের সুযোগ,—সেখানেই নূতন দেশের নূতন আচার, নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্য, (কিন্তু প্রকৃতি তাহাতে নাই,—আছে কেবল কতকগুলি নূতন গাছ গাছড়ার তালিকা।)—অশ্রুতপূর্ব্ব সামাজিক ব্যবহার,—তাহার সমালোচনা,—এই লইয়াই লেখক আত্মহারা! গ্রন্থকারের পক্ষে এতটা আত্মপ্রকাশ ভাল কি?

কি গত যুগ, কি বিদ্যমান যুগ,—দু'যুগের অধিকাংশ উপন্যাসেই কয়টী বিষয় নজরে পড়িয়া যায়,—যাহা ব্যবহারেও পুরাতন হয় নাই,—অন্ততঃ গ্রন্থকারগণের পক্ষে। যেমন, নায়ক হইলেই তাঁহাকে সর্ব্বগুণাধার হইতে হইবে। যেমন, উপন্যাস হইলেই তাহাতে দানব ও দেবতার চরিত্র পাশাপাশি আঁকিতে হইবে। তার্কিকগণ এখানে বলিবেন, প্রকৃতির প্রধান সৌন্দর্য্য আলোক ও ছায়ায়। স্বীকার করি। কিন্তু সেই আলোক ছায়ার যথানিবেশের শক্তি না থাকিলে, তাহার বিচিত্র লীলা দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয় কি? যে যুগে শক্তি ছিল, প্রতিভা ছিল, সে যুগে এই আলোক ছায়ার সমাবেশ মনোহারী হইত, তাহা অস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যিনিই উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—তিনিই সোৎসাহে তথাকথিত আলোক ছায়ার লীলা দেখাইতে বসিয়া গিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সংসারকে তিনি কতটুকু চিনিয়াছেন? এই যে বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত, ইহার মূল কোথায়? আসল কথা,—এখন আর মৌলিক প্রতিভা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসার দেখিয়া, কেহ যে উপন্যাস রচনা করেন তাহাত বোধ হয় না। বরং মনে হয়—তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন উপন্যাস ক্ষেত্রে, চিরাচরিত প্রথা রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা গতানুগতিক মাত্র। ফলে, উপন্যাসগুলি ক্রমেই একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে বিশাল মানব হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ঘাতপ্রতিঘাত, তাহার পরিবর্ত্তনশীলতা, তাহার আনন্দ, তাহার বিষাদ, তাহার আলোক, তাহার আঁধার,—ইহাতেও কি কম বৈচিত্র্য! যে ক্ষেত্রে, আমরা একটী মানুষের মনে পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারি, সে ক্ষেত্রে দুজন মানুষ,—একজনকে দেবতা ও আর একজনকে দানবরূপে আঁকিয়া খাড়া করিয়া দিবার দরকার কি?"

হয়ত, বিদ্যমান কালে এরূপ উপন্যাস রচনায় শক্তিবান লেখকের অভাব নাই; কিন্তু অর্থপ্রার্থী প্রকাশকগণের ধৃষ্টতা ও অন্যায় আবদার তাঁহার প্রতিভার আদর্শ বিকৃত করিয়া দিতেছে। মনোবৃত্তিমূলক উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা অধিক নয়। কারণ, পাঠক যখন জীবন চক্রের নিষ্পেষণে মন লইয়া ক্লান্ত, অবসাদ ও জড়তাগ্রস্ত,—তখন বিরলপ্রাপ্ত অবসরে তিনি মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চান না; তিনি চান ঘটনা—যাহা আগ্রহকে ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া তুলিবে—যাহা অর্থ-চিন্তা ভুলাইয়া দিবে, এবং যাহা আত্মচিন্তার অবকাশ দিবে না। যে যুগে অবসর ছিল, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ ছিল এবং অর্থের ভাবনা কম ছিল, সে যুগ গত। তাই উপন্যাসও এখন কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য নয়—চরিত্র অঙ্কনের জন্য নয়, পরন্তু অর্থের জন্য—বড়মানুষ হইবার জন্য।"

পাঠককে একবার বঙ্গসাহিত্যের দিকে চাহিতে বলি। ইংরাজী সাহিত্যের এমন শোচনীয় অবস্থা এক যুগে হয় নাই। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ঠিক এমনি অবস্থা অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্য-শিশু, কিন্তু সে একেবারেই "এঁচড়ে পাকিয়াছে।" ইংরাজী উপন্যাসগুলি যতই মন্দ হউক, তথাপি স্বাধীন চিন্তা প্রসূত। তাহাতে পূর্ব্বযুগের ছায়াপাত দেখা যাইতে পারে—অনুকরণ দেখা যাইতে পারে—কিন্তু চুরি নাই। আর বঙ্কিম যুগের পরে, বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ উপন্যাসে—লেখকের উপরি উক্ত দোষগুলিই যে সুধু দেখা যায়, তাহা নয়; পরন্তু চুরি পর্য্যন্ত নজরে পড়িয়া যায়। আর সে চুরি কিরূপ পুস্তক হইতে? ইংরাজী সাহিত্যের যে উপন্যাসগুলি সমালোচকগণকর্ত্তৃক একবাক্যে নিন্দিত,—তাহা হইতে। সুসংবাদ,—সন্দেহ নাই।

চন্দনা।

১

কতনা আয়াসে ধরেছিনু মোরা
ফাঁদ পেতে দু'টি চন্দনা ;
কারু কাজ করা চারু পিঞ্জরে
রেখেছিনু মোরা কতই আদরে,
পড়িতে শিখাব বন্য পাখীরে
আছিল মোদের কল্পনা !
বহুল আয়াসে ধরেছিনু মোরা
ফাঁদ পেতে দু'টি চন্দনা !

২

যখন উষায় বধূর ভূষায়
দাঁড়াইত দিক্ অঙ্গনা,
যখন প্রভাতী সমীর মন্দ
বহিয়া আনিত পরাগ গন্ধ,
পিঞ্জর মাঝে সহসা চমকি
নয়ন মেলিত চন্দনা—
কোথায় শ্যামল বন তরুরাজি
কোথা সে প্রভাত-বন্দনা।

৩

দুলিত যখন নবীন মুকুল
দোয়েল কোকিল কূজনে,
পাপিয়া যখন বাজাত বাঁশরী
মুগ্ধ লতায় কুঞ্জ মুখরি,
নাচিত কোমল শষ্পের দল
সুধা ভরা সেই স্বননে ;
চন্দনা দু'টি পিঞ্জরে বসি
চেয়ে র'ত দীন নয়নে!

৪

সমীর পরশে কানন কাহিনী
ফিরিত বুঝিগো স্মরণে,
বকুল কলাপে হেমফল রাশি,
পাতায় পাতায় অরুণের হাসি,
মৃদু কম্পিত কাননের শির
ভেসে চলে যেত নয়নে !
দু'জনার পাখা উড়িতে চাহিত,
স্পন্দিত হ'ত সঘনে।

৫

দুপুরে যখন দূর তরু শাখে
ডাকিত কপোতী কাতরে,
রবি বরষিত সুতীখণ তীর
ক্লান্ত কুসুম লতানত শির,
চন্দনা দু'টি হইত অধীর
ভুলিত না কারো আদরে।
দুপুরে যখন দূর তরু হ'তে
ডাকিত কপোতী কাতরে।

৬

পড়িলে হিলিয়া শ্রান্ত তপন
পাটল জলদ শয়নে
আসিত সন্ধ্যা ধূসর বরণ
ঝিল্লী নূপুর মুখর চরণ,
করিয়া নিখিল চিত্ত হরণ
উজ্জ্বল তারা নয়নে,
ফিরিত বিহগ, গাহি শেষ গান
আপন কুলায় কাননে।

৭

বন্দী দু'জনে ঠোঁটে শিক ধরি
ভাঙিতে চাহিত সবলে
ঘন হয়ে এলে সাঁঝের আঁধার
ভাবি ঘরে ফিরা হ'বেনাক আর,
আঁধার আকাশে পথ চেনা ভার
ফিরে গেল সাথী-সদলে,
ছুঁইত না ফল বাটি ভরা জল,
ডুবিত বিষাদ অতলে!

৮

কত দিন গেল পিঞ্জর মাঝে
শিখিল না তবু পড়িতে,
কাছে গেলে মোরা শিখাইতে বুলি
বাঁকাইয়া গ্রীবা লাল ঠোঁট তুলি,
পিঞ্জর ধারে গর্জ্জি আসিত
সরোষে যুদ্ধ করিতে,
বন্দী জীবনে চলে গেল শোভা
পালখ লাগিল ঝরিতে!

৯

হিমানি রজনী শিশির অশ্রু
ফেলিল যখন গোপনে,
প্রভাতে প্রদোষে যখন কুহেলি
নামিল ধূমল অঞ্চল মেলি,
দেখিলাম মোরা একদা প্রভাতে,
আছে পাশাপাশি শয়নে!
বন্দী মোদের চন্দনা দু'টি
মুক্তি পেয়েছে মরণে!

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

জাতি ও বর্ণসঙ্কর।

জাতি-বিবরণ সংগ্রহ করিবার মত, কোন ইতিহাস না থাকায়, কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কোনও জাতির পূর্ব্ববিবরণ সংগ্রহ করার মত দুরূহ কার্য্য আর নাই। ইতিহাস-বর্জ্জিত ভারতের মত দুর্ভাগ্যদেশে, নিত্য নূতন রাজশক্তির অভ্যুদয়ে, একাল পর্য্যন্ত অনেক জাতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে, অনেক গুলি নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। একেত' ইহার মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার শিক্ষাপ্রাচুর্য্যে সাধারণকে বুঝাইতে যাওয়াও কঠিন। এমন একদিন ছিল যে দিন বিদ্যা কেবল ব্রাহ্মণের আয়ত্ত, আর অন্ধ বিশ্বাস যখন লোকসমাজের অস্থিমজ্জাগত; যখন একটা অনুস্বার বিসর্গেই লোকে চমকিত হইত, সংস্কৃত শ্লোক শুনিলেই, দেবতার মুখের বাণী বলিয়া নীরব থাকিত, দুই একটা যুক্তিপূর্ণ কথা একটু গুছাইয়া বলিতে পারিলেই অবাক্ হইয়া শুনিত, তেমন দিনে সাধারণ লোককে সহজে প্রতারিত করা কঠিন ছিল না। "যো

যস্থ প্রতারকঃ, স তস্থ অধ্যাপকঃ” এ প্রবচনটী এখন আর খাটে না; এখন আর আজগুবি কথা কেহ বিশ্বাস করে না; প্রতি বাক্যের কারণ অনুসন্ধান করে; যে কোন কথায় চমকিত হইবার মত সুবোধ ব্যক্তি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; “চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্থষ্টং” ভগবানের মুখের এমন সত্য কথাটাও তাহারা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। বলিতে চায় যে, “জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥” এই নীতিসত্যানুসারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই, একদিনেও হয় না; প্রকৃতির রীতি বাহিয়া, চলিতে চলিতে, ক্ষুদ্র হইতে মহত্তর হইয়াছিল। এবং ইহা কখন স্থিরভাবে থাকে না; কালের মত রূপান্তর ইহার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।” এখন উদারনীতির রাজত্ব, সাম্যনীতির মন্ত্রিত্ব; একালে যুক্তির একাধিপত্য; কেহ তাহার বিন্দুমাত্র অপচয় সহ্য করিতে পারে না।

যখন মধ্যভারতে দুর্নীতির অত্যন্ত অভাব, স্বেচ্ছাচারিতা যখন সুনীতি-বন্ধনে আবদ্ধ, সমগ্র জগৎ সম্পূর্ণ সুশাসিত; যখন চিকিৎসা-তন্ত্র-স্মৃতি-জ্যোতিষ-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্যক্ পরিপুষ্ট ও উন্নত হইতেছিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্মও তখন পূর্ণকলেবর যুবাপুরুষটীর মত,আপন সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, জনসমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। ঋত্বিকেরা বেদমাতার গর্ভে গর্ভাধান সংস্কার করিয়া, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে দ্বিজ করিতেছিলেন। ঋক্-সাম-যজুষ্ এই ত্রিবেদের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, কেহ এক পাও অগ্রসর হইতে পারিত না। শূদ্রেরা তখন প্রাচীরের বাহিরে ছিল; ভিতরে প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না। সম্ভবতঃ সত্যযুগের শেষাবস্থা হইতে, পরশুরামের দিগ্বিজয় পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল; এবং ত্রেতায় রামচন্দ্রের অভ্যুত্থানের কিয়ৎ পূর্ব্ব হইতে, তাহাতে মলিনতার সঞ্চার হইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত অনুরাগ কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের সীমার একটী রেখাও লঙ্ঘন করিব না, এই শাস্ত্রবিশ্বাসের মূলে সন্দেহ আসিয়া, শ্রদ্ধার হ্রাস করিতেছিল।

ইহা অসম্ভব নহে যে, ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রাধান্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িয়া যায়, হঠকারিতা আসিয়া পড়ে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যদেশেও পুরোহিত কর্ত্তৃক রাজ্যনাশ ও তাহাদের মতের বিপরীত পথে চলিত ব্যক্তির প্রতি নিদারুণ অত্যাচার কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এবং স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা যখন ছাপাইয়া উঠে, তখন মনুষ্যসমাজ যে কোন উপায়ে, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লয়।

শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিয়া, যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভগবৎকৃতই স্বীকার করা যায়, তাহাতেও কারণ দেখান হইয়াছে। "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" এটী কি তাহারই ইঙ্গিত নহে? যে আপনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অন্যের হিত কামনা করে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধা আপনা হইতে আসে, সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক সমাজ গঠিত না হইয়া, প্রকৃতি তাহা প্রস্তুত করিয়া লয়, তাহাকেই ভগবানের কৃত বলা যায়। জ্ঞানধর্ম্মানুশীলন পরতন্ত্র যে সকল নিরাকাঙ্ক মহাত্মারা সামান্যতঃ স্ত্রীপুত্রাদির পোষণোপযোগী বৃত্তি লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া, স্বেচ্ছায় রাজাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধন করিতেন—ঐহিক পারত্রিকের সহায়তা করিয়া সাধারণ লোকের নিঃস্বার্থ সৌহৃদ্য ও অকপট আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রাজারা তাঁহাদিগের নিকট কর লইতেন না, বেশীর ভাগ বাহুবলে তপশ্চর্য্যার বিঘ্ন দূর করিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। স্বার্থশূন্য পরোপকার-পরায়ণ নির্ব্বিকার ব্রাহ্মণ কেন না শ্রদ্ধেয় হইবেন? কেহ শিখাইয়া না দিলেও জনসমাজ ব্রাহ্মণের পদানত হইত।

সেই ব্রাহ্মণ যখন নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়া, দুরাকাঙ্ক্ষা হইল, স্বেচ্ছাচারিতার অধীন হইয়া, সম্ভবাতিরিক্ত করস্বরূপ প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় দুখানি কর প্রসারিত করিল, ব্রাহ্মণের একান্ত লোলুপদৃষ্টি যখন স্বার্থের দিকে নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িল, প্রকৃতি তখন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, ব্রাহ্মণ্য কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হইতে, ব্রাহ্মণের প্রতি নির্ব্বাক্-ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইল। ব্রাহ্মণত্বকে ব্রাহ্মণ যতটুকু তফাৎ করিলেন, লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিও ততটুকু কমিয়া গেল। প্রকৃতির খেলা কে বুঝিবে? তার পর যখন সামান্য কারণে উত্তেজিত পরশুরাম, ক্ষত্রিয়ের প্রতি অযথা অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন ব্রাহ্মণের প্রতি প্রতিবাদশূন্য ভক্তিবিশ্বাসে তখনই বিষম আঘাত লাগিল। সে আঘাতে ব্রাহ্মণত্বের মেরুদণ্ড মুডাইয়া পড়িল, বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরও বাঁধন শিথিল হইয়া গেল।

তার পর যখন পরশুরাম ব্রাহ্মণের চিরনির্দ্দিষ্ট সহধর্ম্মিণী ক্ষমাকে বিদায় দিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বনে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন কি আর ক্ষত্রিয় জাতি ছিল? এরূপ একবার নয়, একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় শূন্য করিবার বিবরণ ভারত-ইতিহাসেই উক্ত হইয়াছে। ইহাতেও কি ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংস হয় নাই? বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় আর ছিল না, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে জাতি উৎপন্ন

হইল, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, তাহারাই রাজন্য। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সংঘর্ষণে জাতির শৃঙ্খলা রশ্মিশূন্য অশ্বিনীর মত অবাধ্য হইল, আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটী নূতন ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইল, বর্ণসঙ্কর প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এই বিসদৃশ সংযোগে যে জাতি উৎপন্ন হইল, কালে তাহার তেজে পৃথিবী কম্পিত করিয়াছিল। বল বীর্য্য বাহুবলে, অন্যের অজেয় ভাবিয়া, জনে জনে অন্তর্গূঢ়বহ্নি পোষণ করিতেছিল, একদিন সেই অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া নিজের গৃহ ভস্মসাৎ করিল। সেইদিনে, সেই চিরস্মরণীয় সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়সূচক লোমহর্ষকর কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ক্ষত্রিয় তেজের প্রখর-মধ্যাহ্ন-রবি-রশ্মি সম্পাতে পৃথিবী দগ্ধ হইতেছিল, আর একদিকে তেমনই ভারতের ভাবী দীর্ঘনিশার অন্ধকার-রাশি ঘনাইয়া উঠিতেছিল। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে,জাতীয়তা, সামাজিকতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাম্যনীতি, যাহা কিছু ছিল স্বাধীনতার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সহিত সেটুকু সেই অন্ধকারে চিরদিনের মত ডুবিয়া গেল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল, অনেক পুরুষের অভাব হইল, স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল, অগত্যা বিষম সংযোগে অনেক নূতন জাতি গঠিত হইল। কালে বর্ণসঙ্করের প্রভাব দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া, ধরিত্রী আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ একজন রাজা না থাকিলে, যাহা হয়, দুর্ভাগ্য ভারতের তাহাই হইল। জনে জনে রাজা, "জোর যার মুলুক তার"। বিদ্যা-ধর্ম্ম-জ্ঞান-শক্তির অপচয়ে, প্রতারণার প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যার বাহুবল আছে সে দস্যু হইল ; বাক্যবল, ছলবল, কলকৌশল, হিংসাদ্বেষে দেশ উৎসন্ন-প্রায় হইল ; নৃপবিহীন ধরণী কর্ণহীন তরণীর মত সাগরতরঙ্গে ভাসিয়া চলিল, তরঙ্গকুল তুমুল আন্দোলনে তরণী ডুবাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এমন সময়, এমন একজন ধর্ম্মবীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন, যাঁহার নবোদ্ভাসিত সুধাময় শীতল কিরণ সংস্পর্শে মলিন হইয়া, মুখরিত-কোলাহল, অকারণ কলহ, ব্রাহ্মণের বিকৃত প্রলাপ, পৌরুষের উত্তরাধিকার-আন্দোলন অহেতুক-অশান্তি একেবারে নিবিয়া গেল। শাক্যসিংহের শীতল ছায়া মাথায় করিয়া শান্ত শীতল বোধি-বৃক্ষ মূলে সকলে সমবেত হইল। এইখানে জাতীয়তার সমাধি, এইখানেই পুরাতন যুগের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ; নূতন যুগের নব অভ্যুদয়।

এই নূতন যুগ প্রায় দুই সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া, সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার

করিয়াছিল। নবনীতিবলে জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হইল; ব্যবসায় অনুসারে শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও যে কোন জাতির সহিত, যে কোন জাতির সম্মিলন হইত। অন্নপানাদিরও কোন বিধি ব্যবস্থা ছিল না, উচ্চসম্মানিত ব্যক্তিও অপ্রতিপন্ন নীচব্যবসায়ীর রূপগুণবতী কন্যাকে বিবাহ করিত, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"। যেহেতু ভেদজ্ঞান তিরোহিত ও বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত হইয়াছিল। "হিংসা মহাপাপ" হিংসা অর্থে জীবহত্যা ও জীবের প্রতি বিদ্বেষ দুই-ই বুঝাইত। জাতিগত কৃত্তি না থাকায়, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, শিল্প-কার্য্যাদি নিরঙ্কুশ হইল, কোন কার্য্যই অকরণীয় ছিল না। "হিংসা মাত্র করিও না" ইহাই বুদ্ধের মূল মন্ত্র; এই ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রশক্তি প্রভাবে তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। হিংসার অভাবে দেশের শিল্পবাণিজ্যাদির যেরূপ উন্নতি ও বহুল প্রচার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল জানিনা, কিন্তু জাতীয়তা যে ছিল না, কর্ম্মকাণ্ড যে গা ঢাকা দিয়াছিল, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের মত, একথা ধ্রুব সত্য। কারণ এই অবতারপ্রধান দেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব-তিরোভাব কখন মুছিয়া যায় না। শ্রুতিপরম্পরায় সে ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব, অসাধারণ শক্তিবলে বেদোক্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা স্থাপন এবং অত্যল্পকালান্তে ধর্ম্মকর্ম্মময় জীবনের অবসান কে না অবগত আছেন?

অতঃপর বৌদ্ধধর্ম্মে অনাস্থা, নরলোকের অস্থিমজ্জার মাঝখান হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। বঙ্গদেশের শেষ বৌদ্ধনৃপতি পালবংশের অবসানে, সেনবংশ যখন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া, ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইতেছিল, তখন কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম সূচয়িতা আদিশূরের রাজত্বকাল ঈর্ষাকলুষিতের উপহাস্যের মত দর্পভরে দাঁড়াইল। তাহার ফলে ভবিষ্য ইতিহাস কেমন গোলমাল হইয়া গেল; কিন্তু কর্ম্মবীর আদিশূরের অন্তঃকরণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগর তরঙ্গের মত, ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, গর্জ্জিয়া উঠিল।

যজ্ঞ কর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা আদিশূর যখন যজ্ঞ করিবার বাসনা করিলেন, তখন যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার মত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ছিল না। সহস্রবর্ষের অনভ্যাসে কর্ম্মশূন্য বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণত্বকে বিদায় দিয়া, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ছিল। শুনা যায় তখনও সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ এদেশে বাস করিত, কিন্তু তাহারা কর্ম্মকাণ্ড ভুলিয়াছিল, জাতিভেদ প্রথা সেখানেও ছিল না; যে কোন জাতির কন্যা বিবাহ করা, তখন বিধিসিদ্ধ হইয়াছিল, ভোজ্যাদিরও প্রতি বন্ধন ছিল না।[৮] অগত্যা

কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া, আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রথম কার্য্য আদিশূরের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করাইয়া ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বঙ্গদেশে আসার জন্য উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে স্থান পাইলেন না। পুনরায় বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আদিশূর সসম্মানে তাঁহাদিগকে বৃত্তিদান করিলেন এবং উপরোক্ত সপ্তশতীর মধ্যে বিবাহাদি সঙ্ঘটন করাইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের স্থাপনা করিলেন।

বহুকাল পরে বল্লালসেন যখন নিগু‍‍র্ণ ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট করিয়া গুণ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং" এই নবধা কুল লক্ষণে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন, সেই সময়েই অন্যান্য যাবতীয় জাতিবিভাগ সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীন যুগের কোন জাতি তখন ছিল না, ক্ষত্রিয়ও নির্ম্মূল হইয়াছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণেতর যাবতীয় জাতিকে শূদ্র বিভাগে ন্যস্ত করিয়া, ব্যবসায় অনুসারে নানা জাতিতে বিভক্ত করিলেন। যথা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, মোদক প্রভৃতি কার্য্যানুগত উপাধিকে শতশত উপাধিতে পরিণত করিলেন।

জাতিস্রোত ফিরিয়া ফিরিয়া, এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পুরাকালের অনার্য্য মধ্যযুগে আর্য্য হইল। কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া এককালে একাকার হইয়া জাতিভেদ উঠিয়া গেল। আবার এক রকমের জাতিভেদ বল্লালের সময় হইতে নূতন প্রবর্ত্তিত হইল। এখন শিক্ষা দীক্ষায় পুনরায় নূতন আন্দোলনে, জাতি লইয়া অনেকেই উন্মত্ত হইয়াছেন। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইতেছেন, কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইতে চাহে, সুবর্ণ বণিক বৈশ্যত্বের দাবী করে, শৌণ্ডিকেরা সুবর্ণ বণিকের সঙ্গে একজাতি হইতে চায়। জাতিত্ব জগতে মহাঝড় উঠিয়াছে, কোথায় যাইবে বলা যায় না!

মহোদয় ঋত্বিকগণ! পুরাকালের আর্য্য ঋষি যোগী বিশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দা তোমরা কোথায়! মৃতপ্রায় জাতিত্বের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে মৃত সঞ্জীবন মন্ত্র পূত করিয়া সোমযাগের অবতারণা কর! আমরা সেই যজ্ঞীয় দধিসংযুক্ত সোমরস পানে অমরত্ব লাভ করিয়া দ্বিজ হইব। হায় ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ! তোমার মুক্ত আত্মা কোন মহাপুরুষে আবির্ভূত হোক, আমরা একটী মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিয়া যেন শান্তি লাভ করি।

কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

জন্ম ও মৃত্যু।

বিস্মিত বিমুগ্ধ প্রাণ বিহ্বল নয়ন—
সেই সে প্রথম দৃষ্টি
হেরিলাম মহা সৃষ্টি—
হেরিলাম অপরূপ রূপ বিমোহন।
আসিলাম অঙ্কে যার
মুখপদ্ম হেরি তার—
ভরিল শিশুর প্রাণ রূপ সুধা পানে;
বিহ্বল শিশুর আঁখি,
অনিমিখে চেয়ে থাকি,
পলে পলে আত্ম ভুলে—মাতৃমুখধ্যানে।
যত স্নেহ, যত প্রীতি
অমরার প্রেম-গীতি
অনিমেষ আঁখিপাতে উছলে যাহার,
তারি স্নিগ্ধ দৃষ্টিমাঝে
হেরি শুভ্র জ্যোস্না রাজে,
সে জ্যোস্না মাখিয়া শিশু হাসে বার বার;
প্রথম ধরায় আসি—পুলক সঞ্চার!
রূপে যবে মুগ্ধ হিয়া—
সুধা মাতৃ-স্তন দিয়া
ঝরিছে তৃষিত কণ্ঠে হেরি অবিরল—
স্তনে তৃপ্ত জীব-ক্ষুধা!
স্নেহ-রস তারি সুধা—
জুড়াইল তীব্র তৃষা সে কুচ যুগল।
ক্ষুদ্র শিশু বাহু দিয়া
মাতৃ-বক্ষ জড়াইয়া
রূপ-রসে তৃপ্ত হয়ে লভিল আঘ্রাণ,—
সে দেহ সুরভিময়,
স্পর্শে সুখ উপচয়
মাতার সোহাগ-স্বরে পূর্ণ তার প্রাণ।

*   *   *   *

দিন-পরে দিন যায়
পদভরে শিশু ধায়,—
যৌবন উছলে পরে সারা দেহময়;
মাতৃ-অঙ্ক হ'তে আজ
আসিলাম ধরামাঝ
সারা বিশ্ব হেরি তবু অতৃপ্ত-হৃদয়।

শিরোপরে নীলাম্বর
মাঝে হেরি দিবাকর,
নিশীথে সুধাংশু, তারা ব্যাপিত গগন—
হেথায় ধরার বুকে
কত রূপ কত মুখে—
বিশ্বরূপে তবু হৃদি না হয় মগন!
তাই এ তৃষিত হিয়া
এ ক্ষুদ্র কল্পনা দিয়া
ধরার ধুলির দ্বারা গঠিল প্রতিমা—
অমূর্ত্তে মুরতি দান,
তারি রূপ-সুধা-পান—
গাহিল তাহার কত অপার মহিমা।
শৈশবে সে মাতৃরূপ—
আজি এ কল্পনাস্তূপ—
কল্পনা-জগতে হিয়া ঘুরে নিরন্তর;
রূপ, রস, গন্ধ যত
যেন এ কল্পনাগত,
বিহঙ্গের মত ঘুরে গগন উপর!

*   *   *   *

আগে ধীরে রবি যায়,
আলো পিছে পিছে ধায়—
দিবস নিশায় হলো সন্ধ্যায় মিলন।
যৌবন চলিয়া যায়,
তারি সাথে শক্তি ধায়—
জীবন সন্ধ্যায় মৃত্যু চাহে অনুক্ষণ!
সহসা বহিল বায়ু
নিঃশেষিল পরমায়ু,
ক্ষীণ দীপ দেখি ফিরে গিয়েছে নিভিয়া;
সেই দেহ জ্যোতিহীন,
পঞ্চভূতে হলো লীন—
ধরণীর রূপ রস রহিল পড়িয়া।
ধীরে নেত্র-জ্যোতি যায়
রসনায় স্বাদ যায়—
কল্পনা-বিহঙ্গ হেরি লোটে ধরাতলে;
ধরণীর যাহা কিছু
ধরায় রহিল পিছু,
বিস্মিত বিহ্বল প্রাণ মহাশূন্যে চলে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

মানসী—মাঘ ১৩১৭। প্রথমেই "ফটোচিত্র" অন্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র। বাঙ্গালীর নিকট এ চিত্রখানি পবিত্র। মানসী পরিচালকবৃন্দ, এ চিত্র প্রকাশিত করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবুর "হেমচন্দ্র-সদনে" নামক সুখপাঠ্য নিবন্ধটি এই সংখ্যার বড় সমীচান হইয়াছে। বাক্যচিত্রের প্রথমেই "মনোহারিকা" কবিতা। ইহাতে "সাঁঝের আলোর ঝলমলে" 'দুর্ব্বাদলের মখমলে' ও 'কাঁটাহারা তরুণ গোলাপ-শাখার মতন-চলচলে' ইত্যাদি প্রকার স মিল বাক্যসুধা আছে। ইহা ব্যতীত 'কঙ্কা পেড়ে শারীর কোণা' এবং 'গণের মধু'ও আছে, নাই কেবল কবিতা ও পরিস্ফুট অর্থ। চলচলে ঝলমলে, রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিলেই কবিতা হয় না, একথাটা বুঝিতে কষ্ট হয় কেন, বলিতে পারি না। "লজ্জার-উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি" লেখক প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছেন—"কোন অসভ্যজাতির মধ্যে বস্ত্র ব্যবহার একবার প্রচলিত হইলে তাহার আবশ্যকতার আর একটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায় সেটি পুরুষের আপনার পক্ষে সুবিধার জ্ঞান।" এই বাঙ্গালার পরেই মাতা সীগল বা বিচামস্ পিলসের কিন্তু বিজ্ঞাপন নাই। লেখক বলেন—"পুরুষদিগের এই যে ঈর্ষ্যা ভয়, ইহা হইতেই মুখ্যভাবে বস্ত্র ব্যবহার এবং গৌণভাবে লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে।" 'ঈর্ষাভয়টা যে পদার্থই হউক ইহা হইতে বস্ত্র ব্যবহার লজ্জা উৎপন্ন। 'ঈর্ষাভয়' বোধ হয় তন্তুবায়দিগের লাভস্পৃহা। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় লেখক বোধগম্য ভাষায় লিখিয়াছেন—'লজ্জা মানবের একটি সাধারণ ধর্ম্ম বলিতে হইবে। নগ্নকায় আদিম অসভ্য জাতিই হউক, অরে বেশভূষায় সুসজ্জিত সভ্যজাতিই হউক, লজ্জা সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। "অরে" বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ। কিন্তু লজ্জার উৎপত্তিটা বাস্তবিক কোথায় তাহা বুঝা গেল না। যাহা হউক এরূপ গবেষণা পাঠে একটা কথা মনে হয়। বোধ হয় লেখকের হৃদয়ে বস্ত্র ব্যবহারের সহজাত "সাধারণ ধর্ম্ম লজ্জা" উৎপন্ন হয় নাই। তাহা হইলে তিনি এরূপ রচনা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন না। লজ্জা কেবল নারীর ভূষণ নহে। ইহা লেখকদেরও ভূষণ। "অর্থনীতি" শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। "কালকা-পথে" বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। 'অলঙ্কার নির্ম্মাণে অপব্যয় ও অপচয়' প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই নাই। "স্বামী" শীর্ষক রচনায় লেখিকার লিখন ভঙ্গী ও সৎসাহস প্রশংসাযোগ্য। তাঁহার সহিত আমরাও বলি—"শুধু ফুলের মালা দিয়া কিনিয়া আনিয়া বর ও স্বামী হইয়া বসিলে হয় না। ইহার ভিতর রাশি রাশি কর্ত্তব্য ক্ষমা করুণা ও সহিষ্ণুতা চাই; * * এই গুলি মনে রাখিয়া কর্ত্তব্যের কঠিনতা ভাবিয়া স্বামী হইও।" তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবী হইতে "সধবার একাদশী" উঠিয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত্র বড় উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইতেছে। 'জাপানের স্ত্রীজাতির ইতিহাস' বেশ মনোরম প্রবন্ধ।

অর্ঘ্য—প্রথম কল্প, চতুর্থ খণ্ড। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত ' এই নব প্রকাশিত পত্রের কয়েক সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। সাধারণ মাসিকপত্রের ন্যায় ক্রমশঃ প্রকাশ্যরূপ সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে 'অর্ঘ্য'ও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই; ইহা দোষের কথা, তবুও সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য নিবন্ধগুলি প্রথম শ্রেণীর। আমাদের মনে হয়, শীঘ্রই এই পত্রিকা সাহিত্য-ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। "জুরী"—(গল্প) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম-এ বি-এল লিখিত। ক্ষুদ্র হইলেও ছোট গল্পের যাহা উপাদান তাহা ইহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকট। পাঠ করিতে করিতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। স্নেহের নিকট কঠিনতার নিগড় কিরূপ শ্লথ হইয়া পড়ে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বহুদিন এমন গল্প পড়ি নাই। 'নর্ম্মদানন্দিনীর চাহনী'—(কবিতা) কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিযুক্ত থাকিলেও ইহার মধুরতা ততটা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। '৺চন্দ্রনাথ ও হিন্দুসমাজ'—ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। "বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত"—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত, মন্দ নহে। "খুলনাৎ-উৎ-তওয়ারিখ"—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

৫১।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।